উদ্যতখড়্গ

নিবেদিতা নিবেদিতার
পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে
এ গ্রন্থ উৎসর্গীকৃত

গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থ

পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ (১, ২, ৩ ৪ খণ্ড)
পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রীসারদামণি
বীরেশ্বর বিবেকানন্দ (১, ২ খণ্ড)
অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ (১, ২, ৩ খণ্ড)
জগদগুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ
গরীয়সী গৌরী
রত্নাকর গিরিশচন্দ্র
কবি শ্রীরামকৃষ্ণ
ভক্ত বিবেকানন্দ
শতগল্প
মৃগ নেই মৃগয়া
প্রথম কদম ফুল
অনন্যা
অনিমিত্তা
আসমুদ্র
প্রাচীর ও প্রান্তর
ইন্দ্রাণী
সঙ্গিনী রঙ্গিণী
ঢলঢল কাঁচা
মৃগমদ ইত্যাদি ইত্যাদি

'তোমার মধ্যে অক্লান্ত তারুণ্য, আসন্ন সংকটের প্রতিমুখে আশাকে অবিচলিত রাখার দুর্নিবার শক্তি আছে তোমার প্রকৃতিতে। সেই দ্বিধাদ্বন্দ্বমুক্ত মৃত্যুঞ্জয় আশার পতাকা বাঙলার জীবনক্ষেত্রে তুমি বহন করে আনবে, সেই কামনায় আজ তোমাকে অভ্যর্থনা করি দেশনায়কের পদে—অসন্দিগ্ধ দৃঢ়কণ্ঠে বাঙালি আজ একবাক্যে বলুক, তোমার প্রতিষ্ঠার জন্যে তার আসন প্রস্তুত।...আমি আজ তোমাকে বাঙলাদেশের রাষ্ট্রনেতার পদে বরণ করি, সঙ্গে সঙ্গে আহ্বান করি তোমার পার্শ্বে সমস্ত দেশকে।'

—রবীন্দ্রনাথ

এক

এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেব। উনিশ শো কুড়ি সালে বলেছিলেন মহাত্মা। উনিশ শো একুশের নভেম্বর এসে গেল, কিন্তু, কই স্বরাজ কই ?

বরং বিজয়দর্পে আসছে রাজপুরুষ। ইংলণ্ডের যুবরাজ।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাহোলির পর অনেক জল বয়ে গিয়েছে গঙ্গা দিয়ে। কিংবা অনেক রক্তস্রোত। ন্যায়ধ্বজী ব্রিটিশ সরকার করুণাকম্পিত হয়ে তদন্ত কমিশন বসিয়েছে, নাম হাণ্টার কমিশন। কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার আগেই পাশ হয়েছে ইনডেমনিটি য়্যাক্ট, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আইন ও শৃঙ্খলারক্ষার নামে যে সব সরকারী কর্মচারী অমিতাচার করবে তার বিরুদ্ধে আদালতে কেউ নালিশ করতে পারবে না। তুমি যদি একটা ঢিল ছোঁড়ো প্রত্যুত্তরে গুলি খাবে বুকের উপর। যদি জলের ছিটেও দাও তোমার ঘর-বাড়ি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। সাত খুন মাপ শুনেছ, এ সাতশো খুন মাপ।

তা কী করা যাবে! অ্যানি বেশান্ত, যে কিনা এতকাল ভারতবর্ষের পক্ষে ছিল, সেও উলটো সুর ধরল। জনতা যদি সৈন্যদের লক্ষ্য করে ঢিল ছোঁড়ে সৈন্যরা তো বিনিময়ে গুলি ছুঁড়বেই। তারা যে শুধু গুলিই ছুঁড়ছে এ তো তাদের অপার অনুগ্রহ।

বুলেট ফর ব্রিকব্যাট। ঢিলের বদলে গুলি। বেশান্তের সঙ্গে যুক্ত হল এই ধ্বনি। বেশান্ত আর ভারতবাসীর চোখে মাননীয় রইল না।

অত্যাচারের উদ্দণ্ড নৃত্য শুধু অমৃতসরেই আবদ্ধ ছিল না, ছড়িয়ে পড়ল লাহোরে, গুজরানওয়ালায়, কাসুরে, সেখুপুরায়।

লাহোরে কর্নেল জনসন, গুজরানওয়ালায় কর্নেল ওব্রায়েন, কাসুরে ক্যাপটেন ডোভটন, সেখুপুরায় মিস্টার বসওয়ার্থ স্মিথ। চারে চতুষ্পদ।

লাহোরে রাত আটটার পর থেকে কার্ফু। রাত আটটার পর বাইরে বেরুলেই হয় গুলি খাবে, নয়তো ভাগ্য প্রসন্ন হলে বেত খাবে। এক বৃদ্ধ তার দোকানের পাশের ফালি জমিতে তার গরুকে ঘাস খাওয়াচ্ছিল, দেখতে পেল মিলিটারি। মিলিটারির ঘড়িতে আটটা বেজে পাঁচ মিনিট, ধরল সেই বুড়োকে। আদেশ অমান্য করেছে এই অভিযোগে তার শাস্তি হল। শাস্তি আর কী, চাবকে অজ্ঞান করে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া শুধু। সন্দেহ কী, শাস্তি মৃদুতম।

কিন্তু গ্রামের মণ্ডলকে রাস্তার পাশে গাছে বেঁধে চাবকাবার কী দরকার ছিল? জনসন হাসল, বললে, শুধু ওকে শাস্তি দিলেই তো হবে না, আর সকলকে শিক্ষা দিতে হবে।

বাছা-বাছা বাড়ির দেয়ালে সামরিক আইনের নোটিশ টাঙানো হল, আর বাড়ির যারা মালিক তাদের উপর হুকুম জারি হল, খবরদার, দেখো, নোটিশ যেন আস্ত থাকে অক্ষত থাকে, যদি ছেঁড়া যায় বা খোয়া যায়, ফল গুলি নয় কশা। রাত আটটার পর কার্ফুতে রাস্তা-ঘাট যখন ফাঁকা তখন চুপি-চুপি পুলিশের লোক এসে নোটিশ ছিড়ে দেয়, তারপর সকাল হলেই শাস্তির আয়োজন, চলো গাছে চলো, দশ ঘা বেত খাবে চলো। আমরা ছিঁড়িনি, কে ছিঁড়েছে জানিনা, এই সব সাফাই গাইবার সুযোগ পর্যন্ত নেই, কেননা বিচার বলে তো কিছু নেই, একেবারেই শাস্তি। সরাসরি বিচার শুনেছ, এ হচ্ছে সরাসরি দণ্ড।

তখন নোটিশ-টাঙানো বাড়ির মালিকেরা তাদের চাকরদের জন্যে পারমিটের দরখাস্ত করল, চাকরেরা রাত জেগে নোটিশের পাহারা দেবে, যাতে কেউ না নোটিশ ছিঁড়ে নেয়। কার্ফুর মধ্যে

বাড়ির বাইরে বসে পাহারা দিতে হবে বলেই পারমিটের আবেদন। মিলিটারি সরকার মজা পেল। বললে, পারমিট দিতে পারি কিন্তু চাকরকে নয়, স্বয়ং গৃহকর্তাকে। তার মানে খোদ মালিককে ঘরের বাইরে বসে পাহারা দিতে হবে, হ্যাঁ, নোটিশ-পাহারা, যাতে কেউ না তাদের বাড়ির দেয়ালের নোটিশে হাত দেয়। যদি ঝড়ে বৃষ্টিতে নষ্ট হয়? তা হলেও গৃহস্বামীর শাস্তি হবে। গৃহস্বামীকে দেখতে হবে যাতে ঝড় না ওঠে বৃষ্টি না পড়ে! আর ঝড়বৃষ্টি হলেও সে ছাতা আড়াল করে নিজেকে না বাঁচাক, তার নোটিশকে বাঁচাতে হবে।

শুধু উচ্চতর অস্ত্রের জোরের উপর দাঁড়িয়ে একটা অসহায় ও অসমর্থ জনতাকে হীনাতিহীন লাঞ্ছনা করার মধ্যে একটা বিকৃতমনস্ক উন্মাদ আনন্দ আছে বোধ হয়। নইলে একজন যখন চাবুকে জর্জর হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় তখন অত্যাচারীর দল সমস্বরে উত্তাল হেসে ওঠে কী করে?

একটা কলেজের দেয়ালে সাঁটা সামরিক আইনের নোটিশ কে বা কারা ছিঁড়ে ফেলেছে। এর জন্যে শাস্তি কার প্রাপ্য? নিশ্চয়ই অধ্যক্ষের, যেহেতু সে-ই কলেজের প্রধান। একজন অধ্যক্ষকে শুধু দায়ী করলে ব্যাপারটায় সমারোহ আসে কী করে? না, অধ্যক্ষের সঙ্গে অধ্যাপকেরাও দায়ী। জনসন ঝেঁটিয়ে সকলকেই গ্রেপ্তার করল। তিন দিন, দুর্গের এক কোণে, মিলিটারি হাজতে রেখে দিল তাদের। এটা কি নিছক বর্বরতা নয়? রাখো! তিন দিন পোড়া-ঝোড়া যাহোক ওদের খেতে দিয়েছি, রাতে ছাতে দিয়েছি ঘুমুতে। চাবকে যে খাল ছিঁড়ে নিইনি ওদের চৌদ্দপুরুষের ভাগ্যি।

বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ইলেকট্রিক ফ্যান খুলে নিয়ে গেল, তোমরা মস্তিষ্কহীন, তোমরা এ নিয়ে করবে কী, বরং ব্রিটিশ সৈন্যরা কত মাথা ঘামিয়ে কাজ করে যাচ্ছে, ফ্যান তো তাদের দরকার। শুধু পাখা নয়, যেখানে যত বাইসিকেল ছিল সব বাজেয়াপ্ত করল।

তোমরা ভগ্নপদ, তোমরা হামাগুড়ি দাও, সৈন্যরাই তো দ্রুত ছুটোছুটি করবে, সুতরাং বাইসিকেল তো তাদের ব্যবহার্য। যোগ্যকে যোগ্যবস্তু ব্যবহার করতে দেখে তৃপ্ত হও সকলে।

টাঙাওয়ালারা হরতাল করেছিল, সুতরাং তাদের সর্বসমেত প্রায় তিনশো টাঙা ধরে নিয়ে গেল। পরে যারা বা ভাড়া খাটবার ছাড় পেল তাদের উপর হুকুম হল প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে তাদের হাজিরা দিতে হবে। স্থানগুলি এমন যা শহরের ব্যস্ততম এলেকা থেকে বহু দূরে, আর সময়গুলি এমন যখন টাঙাওয়ালাদের বেশি কেরায়া পাবার সম্ভাবনা। তার মানে টাঙাওয়ালারা ফতুর হয়ে যাক।

যাব কোথায়, খাব কী! প্রত্যেক মুখে বুকে এই স্তব্ধ হাহাকার। কোনো কোনো বদান্য ধনী লঙরখানা খুলেছিল, জনসন তা বন্ধ করে দিল। লঙরখানা মানেই জনসমাবেশ আর জনসমাবেশ মানেই রাজদ্রোহ।

তবু লাহোরে ইউরোপিয়ানরা জনসনকে ভোজে-পানে আপ্যায়িত করল, 'প্রটেক্টার অফ দি পুয়োর' বলে, দরিদ্র-রক্ষক, গরিবের মা-বাপ বলে।

কাসুরে রেলস্টেশনের কাছে ডোভটন বিরাট একটা খাঁচা তৈরি করল। আন্দাজ দেড়শো লোক সেই খাঁচার মধ্যে বন্দী। যাদের শাস্তি হয়েছে শুধু তারা নয়, যাদের দোষী বলে সন্দেহ করা হয়েছে তারাও। কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে এমনি খাঁচা করে রাখার অর্থ কী? অর্থ পরিষ্কার। বাইরের লোক সব দেখুক অপরাধীরা কেমন অধোমুখে বসে আছে। যারা ভিতরে আছে তারা যাতে লজ্জা পেতে পারে আর যারা বাইরে আছে তারা পেতে পারে শিক্ষা, তারই জন্যে এই আয়োজন। চিড়িয়াখানায় খাঁচায়-পোরা জানোয়ার দেখনি? এ আরেক চিড়িয়াখানা দেখে যাও, খাঁচায়-পোরা আজব জানোয়ার।

শুধু তাই নয়, পাশেই একটা ফাঁসিকাঠ খাড়া করা হয়েছে। জেলের মধ্যেই ফাঁসি হবে এমন কী কথা আছে? নন্দকুমারের ফাঁসি মাঠে হয়নি, হাজার লোকের চোখের সামনে? হাজার লোক কী করতে পেরেছিল? নন্দকুমারকে পেরেছিল ছিনিয়ে নিতে? তোমরাও তেমনি দেখবে বিমূঢ় চোখে। দেখতে আসবে না বলতে চাও? লাঠির ঠেলায় খেদিয়ে নিয়ে আসব। সহস্র চোখের সামনে ফাঁসি দিতে না পারলে ফাঁসি দিয়ে সুখ কী!

ডোভটনের এ বর্বর মনোভাবকে প্রশ্রয় দিল না উপরওয়ালা। প্রকাশ্য স্থান থেকে ফাঁসিমঞ্চ তুলে নাও। ফাঁসি জেলের মধ্যে হওয়াই সমীচীন। জনসাধারণ দেখবে না বটে কিন্তু কটা ফাঁসি হল গণনার মধ্যেও রাখতে পারবে না।

তবে চাবুক মারাটা প্রকাশ্যে হওয়াই সঙ্গত। হাঁটু পর্যন্ত উলঙ্গ করে টেলিগ্রাফ-পোস্টের সঙ্গে বেঁধে তারপরে কশাঘাত। ভদ্রলোক দর্শক না পাও, পুলিশের খাতায় যত বদমাস গুণ্ডার নাম আছে তাদের এনে জড়ো করো। তারা দেখুক, শিখুক। সায়েস্তা হোক।

'একটা শুধু দুঃখজনক ব্যাপার ঘটেছিল আমার আমলে।' কর্নেল জনসন বললে কমিশনকে।

'মোটে একটা?'

'হ্যাঁ, একটাই।'

'সেটা কী?'

'একটা বিয়ের বরযাত্রীর দলকে অবৈধ জনতা মনে করে চাবকানো হয়েছিল।'

জনসন আর কোনো দুঃখজনক ঘটনা মনে করতে পারল না।

'আমার আমলেও একটা লজ্জাজনক ঘটনা ঘটেছিল।' বললে ডোভটন।

দুঃখজনক নয়, লজ্জাজনক! কমিশন তাকাল কৌতূহলী হয়ে।

'চাবকানো দেখবার জন্যে পুলিশ-ইনস্পেক্টরকে বললাম গুণ্ডা-

বদমাস ধরে নিয়ে এস, পুলিশ একপাল বেশ্যা এনে হাজির করল। ওদের দেখে তো আমার চক্ষুস্থির।'

'ওদের তবে ফিরিয়ে দিলে না কেন?' জিজ্ঞেস করল কমিশন।

'ওদের নিয়ে যাবার জন্যে একটা এস্কর্ট পেলাম না।'

'তা হলে—'

'তা হলে, আর উপায় ছিল না, ওরা দেখল সেই চাবকানো।'

এ সব তো তবু লঘু, গুজরানওয়ালায় এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলা হল। দেখা গেল গোটা কুড়ি চাষী মাঠে কাজ করছে, অমনি তাদের লক্ষ্য করে মেশিনগান চালানো হল যতক্ষণ না তারা নিশ্চিহ্ন হয়, হয় মরে নয় পালিয়ে। জনতা দেখলেই গুলি, এই হল কর্নেল ওব্রায়েনের বুলি। যদি মনে হল এটা বরযাত্রীর দল বা শবযাত্রীর দল নয়, তখন আর কথা নেই, সুরু করো গুলিবৃষ্টি।

কে দোষী কে নির্দোষ অত সূক্ষ্ম বাছবিচারের মেজাজ নেই তখন। বরং এই অবিচ্ছিন্ন গুলিবর্ষণে দেশবাসীদের উপকারই হচ্ছে, সাক্ষ্যে বলেছে ওব্রায়েন, যেহেতু তাদের বোধগম্য হচ্ছে দেশদ্রোহের পরিণাম কী।

আরো বোঝানো হচ্ছে, এখন তাদের নতুন প্রভু, নতুন গুরু। তাই ওব্রায়েন হুকুম দিয়েছে, সাহেব দেখলেই ভারতবাসীকে সেলাম করতে হবে, গাড়িতে থাকলে নেমে দাঁড়াতে হবে, ছাতা খোলা থাকলে বন্ধ করতে হবে। অন্যথায় বেত, জরিমানা, জেল। তারপর আছে ছাত্রদের মার্চ করানো। বয়েস যাই হোক, ছাত্র হলেই তাকে দিনে দুবার থেকে চারবার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে নাম লিখিয়ে আসতে হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সে জায়গাটা স্কুল বা কলেজ থেকে চার মাইল দূরে, সে আর বেশি কথা কী। হোক না কাঠফাটা রোদ, আদেশও পাথরফাটা।

'ইনফ্যান্ট ক্লাশের ছেলেদের সম্পর্কেও এ আদেশ?' কমিশনের ভারতীয় সদস্য চিমনলাল শীতলবাদ জিজ্ঞেস করলেন।

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।' উত্তর দিল ওব্রায়েন। 'ওয়াজিরবাদে দেখেছিলাম একটা ছেলে মার্চ করে যেতে-যেতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করলাম।'

'ছেলেটাকে বাদ দেবার জন্যে?'

ওব্রায়েন হাসল।

'তোমার রিপোর্ট করার ফলে ছেলেটার হাঁটার কিস্তি দুগুণ তিনগুণ বেড়ে গেল, কী বলো?'

'হতে পারে। মনে নেই।'

'ধরো যদি হয়ে থাকে তবে ঐ দুর্বল শ্রান্ত অসুস্থ ছেলের পক্ষে সেটা অসহ্য হবে না?'

ওব্রায়েন উত্তর দিল : 'না।'

সেখুপুরায় বসওয়ার্থ স্মিথ আবার ছেলেদের শিখিয়ে দিল, মার্চ করে যাবার সময় ছেলেদের সমস্বরে বলতে হবে, আমি কোনো অপরাধ করিনি, আমি কোনো অপরাধ করিনি, আমি অনুতপ্ত, আমি অনুতপ্ত।

অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ, কোনো অপরাধের সঙ্গেই সংশ্লেষ নেই, তবু অকলঙ্ক শিশুগুলো অনুতাপের বিলাপধ্বনি করতে করতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে এ পরিকল্পনায় বাহাদুরি আছে নিশ্চয়ই।

'আমার একটা হাউস অফ রিপেন্টেন্স বা অনুতাপ-ভবন গড়ে তোলবার ইচ্ছে ছিল,' বললে বসওয়ার্থ স্মিথ, 'কিন্তু তা আর হল না।'

'সেই ভবনের জন্যে দশ হাজার টাকা তুলতে চেয়েছিলে, সে টাকাটা জোগাড় হল না বলে, কী, তাই না?' জিজ্ঞেস করল কমিটি।

'কেন, তা কেন?' প্রশ্ন এড়িয়ে গেল বসওয়ার্থ স্মিথ।

সন্দেহ কী, সে টাকাটা জোগাড় হল না বলেই তার অনুতাপ। সে টাকাটা পকেটস্থ করতে পারল না বলেই তার নিজের বাড়িটাই নীরব অনুতাপ-ভবন।

টাকা? লাহোরের সেই বৃদ্ধ দানবীর, রাজার নামে কলেজের প্রতিষ্ঠায় লক্ষ টাকা দান করেনি? ওয়ার ফণ্ডে তার দানও তো অতিকায়। কিন্তু হল কী? দেখ না কেমন তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে কোমরে দড়ি জড়িয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে। তার অপরাধ? তার যে টাকা আছে, সে যে পরদুঃখকাতর, সে যে মহানুভব। সে মুক্ত থাকলে সে যে মুক্তহস্তে দরিদ্র-আতুরদের জন্যে নির্যাতিতদের জন্যে দান করে বসবে। না, তাকে দান করতে দেওয়া নয়, সেবা করতে দেওয়া নয়। তাকে ধরে নিয়ে চলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেই লোকে বুঝবে তলে-তলে না জানি কত কী সে কেলেঙ্কারি করেছে!

ঐ বুড়ো কী, লালা হরিকিষনলালের চল্লিশ লাখ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। কেন, কী করেছে সে? কী আবার করবে! সে যে কংগ্রেসী। সামরিক আদালতে তাই সে দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। শাস্তি শুধু ঐ বাজেয়াপ্তি? না, সেই সঙ্গে যাবজ্জীবন কারাবাস।

হিন্দু-মুসলমান-একতার ধুয়ো তুলেছে কংগ্রেস। তারা এক মায়ের দুই সন্তান, দুয়ে মিলে এক পক্ষ। এই একতার ডাকে ইংরেজ ভারি বিচলিত। তাদের নীতিই হচ্ছে ভিন্ন করে ছিন্ন করা। ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল। আগে পৃথক করো। তারপর একে পালন করে ওকে দমন করো, ওকে পালন করে একে পীড়ন করো। শেষে তেমন ঢেউ যদি দেখ, নাও ডুবিয়ে দিয়ে সরে পোড়ো।

অপরাধী বলে যাদের বেঁধে নিয়ে চলেছে, জোড়ায় জোড়ায় বেঁধে নিয়ে চলেছে। বেছে-বেছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান, মুসলমানের সঙ্গে হিন্দু। কিছু বলবার নেই, তোমরা যে সব একত্ববাদী, তোমরা যে বলো, এক মন হলে সমুদ্র শুকোয়। কেমন লাগছে এখন এই এক হওয়া? একদেহ না হলে একাত্ম হবে কী করে?

কর্নেল ওব্রায়েন এক বুড়ো চাষীকে ধরেছে। অপরাধ তার নয়, অপরাধ তার দুই ছেলের। তবে ছেলেদের না ধরে বাবাকে

ধরেছে কেন? বাপকে ধরেছে যেহেতু ছেলেদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছেলেদের খুঁজে-পেতে বার করে দিক, ছেড়ে দিচ্ছি বাপকে। এমনও তো হতে পারে, বাপকে না জানিয়েই ছেলেরা পালিয়েছে, কিংবা সত্যি-সত্যিই বাপ তাদের ঠিকানা জানেনা, সেক্ষেত্রে বাপের কী দোষ? বাপের দোষ সে অমন ছেলের বাপ হয়েছে কেন? তাই সে শুধু আটকাই পড়ে থাকবেনা, তার বিষয়-সম্পত্তি সরকারের খাস হবে আর কেউ যদি তার চাষবাসে সাহায্য করো, সাবধান করে দিচ্ছি, তার ভবলীলা একটিমাত্র গুলির খরচেই ফুরিয়ে যাবে।

হঠাৎ একদিন রব উঠল আগামী কাল সামরিক আইনের মেয়াদ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুর্লীলার জন্যে হাতে আর মোটে চল্লিশ ঘণ্টা, ওব্রায়েন মরীয়া হয়ে উঠল। এর মধ্যে যত বিচার বাকি আছে সমাধা করে ফেল, যেন একজনও না সামরিক আইন রহিত হওয়ার সুযোগে ছাড়া পায়।

সেই সামরিক আইন রদ হতে-হতে জুন মাসের মাঝামাঝি। তাও ষোল আনা নয়, রেলের লাইন ও জমি ছাড় পেলনা। এ পৈশাচিক আইন এত দীর্ঘ দিন ধরে চালু রাখার কোনো যুক্তিবিচার নেই এই ঘোষণায় বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য স্যার শঙ্করন নায়ার পদত্যাগ করল।

রেভারেণ্ড এণ্ড্রুজকে পাঞ্জাবে ঢুকতে দেওয়া হল না, অমৃতসরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। আদালতে অভিযুক্তদের পক্ষে ব্যারিস্টার নর্টনকে নিযুক্ত করা হল, কিন্তু সামরিক সরকার তাকে এগোতে দিলনা। বম্বে ক্রনিকল-এর সম্পাদক হর্নিম্যানকে সরকার-নিন্দার জন্যে ভারতের বাইরে নির্বাসিত করা হল।

চলল সর্বন্যায়নাশন দুঃশাসন। শুধু ক্রোধস্তব্ধ নেত্রে তাকিয়ে রইল মহাকাল। ইঙ্গিত লিখে রাখল আকাশে। তোমাকে মারিবে যে বঙ্গেতে বাড়িছে সে।

হাণ্টার কমিটির পাশাপাশি বসল এক স্বদেশী কমিশন। কিন্তু দেশী কথা সত্য ও সঙ্গত হলেও পরশাসনগর্বিত ইংরেজ তাতে কর্ণপাত করতে প্রস্তুত নয়। প্রার্থনা করা হল তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আদালতের দেওয়া শাস্তি স্থগিত রাখা হোক। তখন সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ রায়পুরের লর্ড সিনহা নাম নিয়ে ব্রিটিশহাউস অফ লর্ডস-এর সদস্য এবং সহকারী ভারত-সচিব। তা হলেও কোনো আবেদনই গ্রাহ্য হলনা। শুধু ১৯১৯-এর গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট পাশ হল।

সত্যপথাশ্রিত মহাত্মা পিছু হটতে চাইলেন। তিনিই তো রাওলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে দেশকে ডেকেছিলেন সত্যাগ্রহ করতে। সত্যাগ্রহেরই বাস্তবরূপ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, অহিংসা যার প্রাণবীজ। নিজে হিংসিত হয়েও অহিংসক থাকা—সে কত উচ্চ তপস্যার কথা। সবাই সেই আদর্শে অটুট থাকতে পারেনি, উত্তেজনার মুখোমুখি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছে আর তারই ফলে শাসকেরা পর্বতকায় লাঞ্ছনার সুযোগ পেয়েছে। মহাত্মা স্বীকার করলেন, আমার ভুলও পর্বতকায় —'হিমালয়্যান ব্লাণ্ডার'—দেশবাসীকে আত্মশুদ্ধিতে দীক্ষিত না করেই সত্যাগ্রহে ডাক দিয়েছি। যারা অস্থির,অসংযত, প্রতিহিংসুক, তাদের সত্যাগ্রহী বলি কী করে?

'হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ, শক্তির উদ্বোধন।'

মহাত্মা তাই সত্যাগ্রহ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। কাল বুঝি এখনো পরিপক্ক হয়নি। দিগদেশ হয়নি অনুকূল। যুদ্ধে সাময়িক পিছু হটতে বা স্তব্ধ থাকতে বাধা নেই। সত্যে ঋজু না থাকাটাই বাধা।

কিন্তু গান্ধি ক্ষান্ত হলেও চেমসফোর্ডের ক্ষান্তি নেই। ব্রিটিশ শাসনের স্টিমরোলার জনমঙ্গলের বুকের উপর দিয়ে যেমন-কে-তেমন চেপে-চেপে পিষে-পিষেই চলেছে।

'তুমিই তো একটা জ্বলন্ত দেশলাই ছুঁড়ে দিয়েছ।' ইংরেজ-

সরকার গান্ধির উপর মুখিয়ে উঠল: 'কী দরকার ছিল তোমার রাওলাট য়্যাক্টের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে?'

মহাত্মা হাসলেন। বললেন, 'তোমরা যে সেই কালা-কানুনটাকে বাঁচিয়ে রাখছ তার মানেই তো সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে দিয়েছ, একটা দুটো নয়, হাজার-হাজার জ্বলন্ত দেশলাই। একটাতেই এই দেখছ, হাজার কাঠি যখন একসঙ্গে জ্বলে উঠবে তখন বুঝবে।'

কিন্তু এখনো লগ্ন প্রশস্ত হয়নি। মহাত্মা তাই সংবৃত হলেন। বললেন, 'যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী সে সরকারকে বিব্রত করতে চায় না। তাই আমি মনে করছি আপাতত আন্দোলন গুটিয়ে নিলেই আমি স্বদেশ ও সরকারকে সার্থকতর সেবা করতে পারব। এখন আমাদের কাজ হবে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ ও হিন্দু-মুসলমানের একতা-সাধন।'

যখন যেমন তখন তেমন। যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা।

উনিশশো উনিশের ডিসেম্বরে কংগ্রেস বসল—আর কোথায়—বসল খোদ অমৃতসরে। আর সেখানে প্রদীপ্ত মহিমায় দেখা দিলেন চিত্তরঞ্জন।

তার আগে মে মাসে ময়মনসিংহের প্রাদেশিক সম্মিলনে যোগ দিতে গিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন। হয়তো যেতেন না, কিন্তু যেই শুনলেন জালিয়ানওয়ালার কথা, উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'অসম্ভব। ব্রিটিশ শাসনের স্পর্ধা ক্রমশই সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এর একটা কিছু প্রতিকার না করলেই নয়।'

কিন্তু প্রতিকারের পথ কোথায়, যদি সেদিন কেউ জিজ্ঞেস করত চিত্তরঞ্জনকে, তিনি বলতেন, 'সত্যাগ্রহে। সত্যাগ্রহ করে জেলে যাওয়ায়।'

ছয়ুই এপ্রিল কলকাতায় গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের নিচে প্রতিবাদ-সভায় চিত্তরঞ্জন সত্যাগ্রহ-শপথ গ্রহণ করেছিলেন এবং সমবেত সহস্র কণ্ঠে তার প্রতিধ্বনি উঠেছিল। সত্যের ডাক ধর্মের ডাক মহাত্মার

ডাক, নির্দ্বিধায় ঘর-বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল বাংলা দেশ। ভারত-মাতাই একমাত্র আরাধ্যা, তার শৃঙ্খলমোচনই একমাত্র ব্রত, একমাত্র কাম্যকর্ম।

'সত্যাগ্রহ-শপথ নিয়ে এলাম।' প্রাণভরা আনন্দে ঘোষণা করলেন চিত্তরঞ্জন।

'সে আবার কী শপথ?' কে একজন জিজ্ঞেস করল।

'জীবনে যা সত্য বলে বুঝব প্রাণপণে তাকে আঁকড়ে থাকব এই সঙ্কল্পের নামই সত্যাগ্রহ।'

সেই প্রাদেশিক সম্মিলনেই চিত্তরঞ্জন প্রথম অসহযোগের কথা তুললেন। যদি আমরা ওদের সংসর্গে না যাই, আমাদের সহ-যোগিতার হাত সরিয়ে নিই, তা হলে কী করে ওরা পরের রাজ্যে বসে মোড়লি করে দেখি। যদি ওদের ট্রেন না চলে, আদালত না বসে, ডাক-তার বিলি না হয়, তা হলে কোথায় যাবে বাছাধনরা? বাবুর্চি-খানসামা নেই, মোটরগাড়ির ড্রাইভার নেই, মাল বইবার মুটে-মজুর নেই। খাবে কী, শোবে কোথায়? যাবে কোন পথে?

অসহযোগ এক দুর্বার শক্তি। কিন্তু সুসম্পূর্ণ নয়। তবু নিরস্ত্র নিঃসহায় দেশের পক্ষে সেই একমাত্র ন্যায়ানুগত পথ। আগে পঙ্গু করো, পরে উৎখাত করার কথা ভাবা যাবে। মূলে-শাখায় বহু জট মেলে মূর্তিমান অভিশাপের মত দাঁড়িয়ে আছে, গাছ মরে গেলেও তাকে উচ্ছিন্ন করতে কুঠারের প্রয়োজন হবে। পরে দেখা যাবে কুঠার কী করে জোটে, আগে এই বিষবৃক্ষের গর্ব তো খর্ব করি।

হাণ্টার কমিশনে চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল নেহরু আসামীদের হয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন যেমন ওডায়ার ডায়ার জনসন ডোভটনের জবানবন্দি নেওয়া হচ্ছে তেমনি ডাক্তার কিচলু ও হর-কিষনলালেরও বক্তব্য শোনা যাক আর সেই উপলক্ষ্যে তাদের জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হোক। গভর্নমেণ্ট তাদের ছাড়তে রাজি হল না। বেশ, তবে জেলেই ওদের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হোক।

ন্যায়তৎপর সরকার তাতেও অস্বীকৃত। চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল বর্জন করলেন কমিশন।

কংগ্রেস থেকে যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে তারও সদস্য চিত্তরঞ্জন আর মতিলাল। তা ছাড়া আরো তিন জন, মহাত্মা গান্ধি, আব্বাস তায়েবজি আর জয়াকর।

ময়মনসিং থেকে ফিরেই চিত্তরঞ্জন চলে গেলেন অমৃতসর।

অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধি একেবারে পূর্ণ সহযোগিতার সুর ধরলেন আর চিত্তরঞ্জন ধরলেন পূর্ণ প্রতিরোধের। পূর্ণ প্রতিরোধের কমে কিছুতেই যেন তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না চিত্তরঞ্জন। সর্বস্ব দিয়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়তে না পারলে যেন সুখ নেই।

অমৃতসর কংগ্রেসে জাতীয় সম্মানের জয়ঘোষণা হল। আর সে অভ্যুদয়ের নান্দীকর চিত্তরঞ্জন।

ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনভার গ্রহণ করতে উপযুক্ত এবং এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সমস্ত অনুমান ও উক্তি অসার হতেও অসার—চিত্তরঞ্জন এই প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিলেন। দ্বিতীয় প্রস্তাব নিয়েই গোলমাল বাধল। দ্বিতীয় প্রস্তাবে চিত্তরঞ্জন বললেন, যে রিফর্মস বা শাসনসংস্কার ভারতবর্ষকে পাঠিয়েছে পার্লামেণ্ট, তা অপর্যাপ্ত, অসন্তোষকর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক। গান্ধি চাইলেন 'নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক' কথাটা তুলে দিতে। শুধু তাই নয়, তিনি চাইলেন যা এসেছে যতটুকু এসেছে তাই নিয়ে কাজ করতে, বাজারে বেরিয়ে তাই বাজিয়ে দেখতে। উপযুক্ত হয়েছি শুধু মুখে বললেই তো আর হল না।

পাঞ্জাবে এত দৌরাত্ম্যের পরও ইংরেজের প্রতি মহাত্মার এই পূর্ণ সহযোগিতার ভাব দেখে অনেকেই বিমূঢ় হয়ে গেল। শুধু হাতে-কলমে সহযোগিতাই নয়, গান্ধি আরো প্রস্তাব করলেন, নতুন শাসনসংস্কারসাধনে মণ্টেগু যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে তার জন্যে তাকে প্রগাঢ় ধন্যবাদ জানানো হোক।

মহাত্মার এই সংশোধন মানতে পারলেন না চিত্তরঞ্জন। টোট্যাল কো-অপারেশানের বদলে টোট্যাল অবস্ট্রাকশান, অর্থাৎ পূর্ণ সহযোগিতা নয়, পূর্ণ প্রতিরোধ, পূর্ণ প্রাতিকূল্য। যখন এ নিয়ে দু দলে লড়াই চলছে তখন এসে পৌঁছুল লোকমান্য তিলকের টেলিগ্রাম, তাতে একটি মীমাংসার সূক্ত লেখা—রেসপনসিভ কো-অপারেশান, সমানুপাতিক সহযোগিতা, অর্থাৎ তুমি যদি বন্ধুতায় হাত বাড়াও আমিও বন্ধুতায় প্রসারিত হব, আর তুমি যদি মুষ্টি বদ্ধ করো জানবে আমিও প্রত্যাঘাতে প্রস্তুত। বাস্তবতর করে বলা যাক, যে সব ব্যবস্থা আমাদের স্বরাজলাভের অনুকূল বলে মনে হবে তার সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করব আর যা তা হবেনা তার সঙ্গে আমাদের নিষ্কুণ্ঠ অসহযোগ।

'সোজাসুজি', বললেন চিত্তরঞ্জন, 'স্বরাজের স্বার্থে যখনই দরকার বুঝব সরকারের সঙ্গে মিতালি করব আর স্বরাজের স্বার্থেই যখন দরকার বুঝব করব বিরুদ্ধতা।'

সন্দেহ কী, অমৃতসরে চিত্তরঞ্জনেরই জয় হল। তিনি রুখে না দাঁড়ালে তিলকের সূক্তও হয়তো গৃহীত হত না।

তবে রিফর্মস নৈরাশ্যব্যঞ্জক এ কথাটা শুধু বাদ গেল। আর মণ্টেগুর জন্যে ধন্যবাদ থাক, কিন্তু তা প্রগাঢ় নয়, তা এমনি ধন্যবাদ।

মহাত্মা কেন নরম হলেন তার আভাস দিলেন। তাঁর কাছে প্রাপ্তি যেমন মহৎ তেমনি পদ্ধতিও মহৎ। অস্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র কি মহৎ নয়? নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু তোমার উপযুক্ত অস্ত্র কই? বিপ্লব মহৎ নয়? নিশ্চয়ই মহৎ। কিন্তু তোমার জনগণের সেই জাগৃতি কই, প্রস্তুতি কই? এক্ষেত্রে তুমি ছিলে সত্যাগ্রহী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধী, অহিংসায় ব্রতবদ্ধ। তুমি কেন ন্যায়ানুগত থাকবে না? তুমি কেন পথভ্রষ্ট হবে?

'সংশয় নেই আমরাও ধ্বংস ও হিংসার দৃষ্টান্ত রেখেছি, এখানে-

সেখানে, বোম্বাইয়ে, আহমেদাবাদে।' বললেন মহাত্মা, 'জানি কিচলু আর সত্যপালের গ্রেপ্তার, আমার গ্রেপ্তার যথেষ্ট উত্তেজনা জুগিয়েছিল। এ সব গ্রেপ্তার না হলে হয়তো কোনো অশান্তি হত না। কিন্তু গভর্নমেন্ট উন্মাদ হয়ে গেল, দেখাদেখি আমরাও উন্মাদ হলাম। কিন্তু আমি বলি উন্মত্ততার বিনিময়ে উন্মত্ততা ফিরিয়ে দিও না, উন্মত্ততার বিনিময়ে প্রকৃতিস্থতা ফিরিয়ে দাও। সত্যই সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ।'

প্রশ্ন এই, সাধারণ মানুষ, নির্যাতিত উত্তেজিত মানুষ এ সব কথা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠিক বুঝতে পারবে কি না।

কিন্তু সর্বস্বপণ প্রতিরোধ বুঝতে পারবে। বললেন চিত্তরঞ্জন। প্রতিরোধ প্রতি পদে, প্রতি পথে, এমন কি আইনসভায়। পরাধীন জনতার ভাষাই প্রতিরোধের ভাষা।

'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে
হয়তো দুয়ার টলবে না
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।'

রাজনৈতিক বন্দীরা ছাড়া পেল। ছাড়া পেল আলি-ভাইয়েরা, সওকত আলি আর মহম্মদ আলি। প্রচণ্ড উল্লাসধ্বনির মধ্যে কংগ্রেস-মঞ্চে হাজির হল দু ভাই। মহম্মদ আলি বললে, 'ছিন্দওয়ারা জেল থেকে আমি এসেছি কিন্তু এসেছি রিটার্ন টিকিট করে।'

তার মানে আবার শিগগিরই আমাকে জেলে ফিরে যেতে হবে। 'রিটার্ন টিকিট'—এ যেন এক নতুন সম্পদ, নতুন অধিকার।

দু মাস পরে বেসরকারী পাঞ্জাব-তদন্তের রায় বেরুল। বিচারকেরা জাতির পক্ষে এই দাবী করলেন চেমসফোর্ডের ও ওডায়ারের পদচ্যুতি হোক, জেনারেল ডায়ারের শাস্তি হোক ও যত জরিমানা আদায় হয়েছে, ফিরিয়ে দেওয়া হোক। প্রত্যাহৃত হোক ঐ কালা-কানুন রাউলাট য়্যাক্ট।

কা কস্য পরিবেদনা! জাতীয় দাবি অগ্রাহ্য হল, গৃহীত হল

হাণ্টার কমিটির মেজরিটি রিপোর্ট। তাতে বলা হল জেনারেল ডায়ার কিছুমাত্র অন্যায় করেনি, তবে কোথাও-কোথাও উচ্চতর কর্তব্যবোধের খাতিরে বিচারে ভ্রম করেছে, সেটা এমন কিছু মারাত্মক নয়। বিচারভ্রম মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তার জন্যে ডায়ারকে মন্দ না বলে তার উদ্দেশ্যের সততা ও কর্তব্যবোধের দৃঢ়তার জন্যে তাকে প্রশংসা করা উচিত। অনেক কষ্টে এটুকু শুধু বিরুদ্ধ কথা লেখা হল যে ডায়ারকে ভারতবর্ষের চাকরিতে আর না রাখাই সঙ্গত। এটুকু বিরুদ্ধ কথাও হাউস অফ লর্ডস অনুমোদন করল না। ডায়ার কলঙ্কলেশশূন্য হয়ে গেল।

মেজরিটি রিপোর্ট ওডায়ারের কেশাগ্রও স্পর্শ করল না। আর চেমসফোর্ড তো চূড়ারও চূড়ার উপরে।

শুধু নিষ্কলঙ্ক বলা নয় দুই ডায়ারের গলায় টাকার মালা পরিয়ে দিল ইংরেজ। ইংলণ্ড জুড়ে সে কী আন্দোলন, দুই ডায়ারের জন্যে অকুণ্ঠ হাতে চাঁদা দাও। যে মহৎ কীর্তি তারা ভারতবর্ষে স্থাপন করেছে, নির্বিচল কর্তব্যসাধনের কীর্তি, তা প্রচুর হাতে পুরস্কৃত হবার উপযুক্ত। ইংরেজ ছাড়া এই কর্তব্যের মর্যাদা কে বুঝবে? সুতরাং দরাজ হাতে টাকা দাও।

বিশ্বাস হয় না এমনি একটা বিপুল অঙ্ক তুলে ফেলল ইংরেজ। দুই 'ডায়ার', না, দুই 'কিলারের' ব্যাঙ্ক বোঝাই করে দিল।

আর মণ্টেগু, যাকে কিনা রিফর্মসের গুঁড়োগাঁড়ার জন্যে ধন্যবাদ দেওয়া হয়েছিল সে জেনারেল ডায়ারের পিঠ চাপড়ে দিল।

এই বুঝি উটের পিঠে শেষ খড়।

প্রতিবাদে উনিশ শো কুড়ি সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতার স্পেশাল কংগ্রেস গর্জে উঠল। এবং সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হল, মহাত্মা গান্ধি, যিনি একবছর আগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিলেন তিনি এবছর হয়ে দাঁড়ালেন অসহযোগী। তিনি তিন বর্জনের পথ বাতলালেন। আইনসভা বর্জন, আদালত বর্জন,

স্কুল-কলেজ বর্জন। শুধু বর্জনে চিত্তরঞ্জন তৃপ্ত নন, কিছু একটা গ্রহণ প্রয়োজন। শুধু বর্জনে যেন চরিত্রকে নির্জীব করে ফেলবে, বরং গ্রহণেই আছে সক্রিয় রণোন্মুখতা। শুধু নেতি নয়, প্রেতি। শুধু ছাড়া নয়, কিছু একটা ধরা, কাড়া আর তার জন্যে লড়া। শুধু না করে মরা নয়, কিছু একটা করে মরা।

চিত্তরঞ্জন বললেন, অন্তত আইন-সভাটা খোলা থাক। ওখানে গিয়ে আমরা বিস্তৃততর প্রতিরোধের ক্ষেত্র রচনা করতে পারব।

এ প্রস্তাব গান্ধিজির মনঃপূত হল না।

সভাপতি লাজপত রায়ও গান্ধির বিরুদ্ধে। ইংরেজ তাঁকে যুদ্ধের চার বছর ভারতের বাইরে নির্বাসিত রেখেছিল, তা সত্ত্বেও তিনি বুঝেছিলেন সর্বাংশে সরকার-বর্জন কোনো কাজের কথা নয়। আর চিত্তরঞ্জন বললেন, 'রিফর্মস ইংরেজের ভিক্ষার দান নয়, আমাদের কষ্টার্জিত সম্পত্তি। এ আমরা ছেড়ে দেব না। আমার তো মনে হয় বাইরে থেকে যত নয় কাউন্সিলের ভিতরে থেকেই আমরা গভর্নমেণ্টকে তারও চেয়ে বেশি ঘায়েল করতে পারব।'

কে জানে বর্জনের মধ্য দিয়েই হয়তো বৃহত্তর অর্জন করা যাবে, উৎখাত করা যাবে এই শয়তান গভর্নমেণ্টকে, মহাত্মার মূল অসহ-যোগ প্রস্তাব বেশি ভোটে পাশ হয়ে গেল। গভর্নমেণ্টকে গান্ধি 'স্যাটানিক' বললেন। ভূতরাজ গভর্নমেণ্ট।

খিলাফত আন্দোলন মহাত্মার সহায়তা করল। আসলে খিলাফত ব্যাপারটা কী? গত যুদ্ধে তুরস্ক মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে জার্মানির হয়ে লড়েছে। ভারতীয় মুসলমান তুরস্কের বিপক্ষে আনুকূল্য করেছে এই আশ্বাসে যে যুদ্ধান্তে তুরস্কের প্রতি কোনো অবিচার করা হবেনা। ইংরেজ বললে, না, কথা দিচ্ছি, যুদ্ধজয়েও তুরস্ককে অব্যাহত রাখব। ইংরেজ কবে তার কথার সম্মান রেখেছে? বিপদ দেখলে মানুষ সাজে, আবার বিপদ কাটলেই বনমানুষ হয়ে যায়। যুদ্ধে তুরস্কের সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং

মুসলমানদের অনেক পুণ্যস্থান খৃস্টানি আধিপত্যে চলে আসে। মুসলমান সমাজ আন্দোলিত হয়ে ওঠে আর সেই আন্দোলনের পুরোভাগে এসে দাঁড়ায় দুই আলি ভাই, সওকত আলি আর মহম্মদ অলি, দুজনেই অক্সফোর্ডের গ্র্যাজুয়েট, আর তাদের পাশে জায়গা নেয় আবুল কালাম আজাদ আর হাকিম আজমল খাঁ। তারা ঘোষণা করল অসহযোগ।

গান্ধিজি ভাবলেন এই সুযোগ ছাড়া নয়, এই সম্মিলিত জনমত। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করলেন। সবাই একবাক্যে মেনে নিল স্বরাজই দেশের সমস্ত দাহ-জ্বর তাপ-জ্বালার একমাত্র ধন্বন্তরি।

কলকাতা কংগ্রেসে পাকাপাকি সিদ্ধান্ত কিছু হলনা, শুধু কংগ্রেসের মূল সূক্তটা উচ্চারিত হল। পরিপূর্ণ ঘোষণা হবে নাগপুর কংগ্রেসে, ডিসেম্বরে, বিজয়রাঘবাচারিয়ারের সভাপতিত্বে।

এদিকে লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। তিলক বোধহয় এক-মাত্র নেতা যিনি প্রভাববিস্তারে গান্ধির সমকক্ষতা করতে পারতেন। গান্ধির একচ্ছত্রতার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী অপসৃত হল।

কিন্তু গান্ধিজি বুঝলেন চিত্তরঞ্জনকে তাঁর চাই। এত দীপ্তি এত আবেগ এত প্রাণময়তা আর কোথায় মিলবে? তা ছাড়া চিত্তরঞ্জন বাংলা দেশ থেকে প্রায় আড়াই শো ডেলিগেট নিয়ে এসেছেন, তাদের যাওয়া-আসা-থাকার সমস্ত খরচ, ছত্রিশ হাজার টাকা, নিজে একলা বহন করেছেন। তাঁর সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে চাইলেন গান্ধিজি। চিত্তরঞ্জনকে কাছে ডেকে নিলেন। 'এখন আর কাউন্সিলে ঢোকা নিয়ে প্রতিবাদ করে কী হবে? এবারের ইলেকশান তো হয়ে গিয়েছে।'

'তাইতো দেখতে পাচ্ছি।' গম্ভীর হলেন চিত্তরঞ্জন।

উনিশ শো কুড়ির অক্টোবরেই প্রথম ইলেকশান হয়ে গিয়েছে। জাতীয়তাবাদীরা দাঁড়ায়নি বলে মডারেটরা মনের সুখে গদিতে গিয়ে বসল। 'এইখানেই তো বিষম ভুল হল। এই সব খয়ের খাঁ

মডারেটরা জনগণের প্রতিনিধি সাজল। ইংলণ্ড বলে বেড়াবে, দেখ, ভারতবর্ষ তার নিজের নির্বাচনে প্রদেশে-প্রদেশে কেমন সব দেশী সরকার স্থাপন করেছে। আর কত চাই, তাদের আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের দিকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছি। বলতে পারবেনা আমরা ভারতহিতৈষী নই। তার মানে,' বললেন চিত্তরঞ্জন, 'চারদিকেই শুধু ধোঁকার টাটি ফেলা হল, শুধু ছদ্মবেশে রণসজ্জা।'

কিন্তু কী করা যাবে, ডিসেম্বরে অক্টোবর নেই। নির্বাচন যখন হয়ে গিয়েছে তখন আর সে প্রসঙ্গ ওঠে না। সে প্রসঙ্গ মৃত, নিরর্থক।

আবার উলটো ঘরে গিয়ে বসলেন দুজনে, গান্ধি আর চিত্তরঞ্জন। চিত্তরঞ্জন গান্ধির আগের বছরের কথা ধরলেন, দেশ এখনো অহিংস অসহযোগের জন্যে প্রস্তুত হয়নি, অন্তত পাঁচটি বছর সে প্রস্তুতি-সাধনে ব্যয় করা হোক। আর গান্ধি ধরলেন চিত্তরঞ্জনের আগের বছরের সুর, এখুনি, এই স্বর্ণমুহূর্তেই আমাদের ঝাঁপিয়ে পড়া দরকার।

দুই নেতায় আবার বিভেদ দেখা দিল। আর তাঁদের দুয়ের মধ্যে সওকত আলি শাটলককের মত ছুটোছুটি করতে লাগল।

অবশেষে মিল হল দুজনে। কংগ্রেসের কনস্টিটিউশন সংশোধিত হল। আগে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বরাজলাভ, এখন হল যে কোন ন্যায্য ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে স্বরাজ-লাভ। 'যদি সম্ভব হয়,' গান্ধি বললেন, 'সাম্রাজ্যের মধ্যে, আর যদি প্রয়োজনীয় হয়, সাম্রাজ্যের বাইরে।'

তিন-বর্জন অসহযোগ গৃহীত হল সোল্লাসে। শনৈঃ শনৈঃ কিছু নয়, একেবারে একসঙ্গে, সব কিছু নিয়ে, অতল জলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

মঞ্চে দাঁড়িয়ে শঙ্খনির্ঘোষে বলে উঠলেন চিত্তরঞ্জন: 'আমি আমার প্র্যাকটিস ছেড়ে দেব।'

সে কী প্রচণ্ড উল্লাস, বিপুল করধ্বনি! ভোগের রাজা ত্যাগের ফকির হয়ে যাবেন। ত্যাগের ফকির নয়, ত্যাগের বাদশা হয়ে যাবেন। এমনটি হবেন যেমনটি আর কেউ দেখেনি দুনিয়ায়।

অসহযোগের যে প্রস্তাব গৃহীত হল তাতে বলা হল অহিংসা শুধু কর্মে নয় বাক্যেও পালন করতে হবে। যদি মনেও অহিংসা লালন করা না হয় তা হলে সত্যিকারের গণতন্ত্রের বনেদ তৈরি হবেনা, এক পদের অহিংসা অন্য পদের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে।

কংগ্রেসের মধ্যে যারা চরমপন্থী, যারা লেফট-উইঙ্গার বা বামপক্ষীয়, তারা এই ধার্মিক অসহযোগে খুশি হতে পারল না। তারা বললে প্রাপ্তিই প্রশ্ন, পথ প্রশ্ন নয়। যে কোনো উপায়ে, তা অহিংস হোক কি সহিংস হোক, মৃদু হোক কি রুদ্র হোক, পূর্ণ স্বাধীনতা কেড়ে নিতে হবে, আর স্বাধীনতায় কোনো রফা নেই আপোস নেই বিকল্প নেই।

অহিংসা ছাড়া এই অসহযোগ নতুন আর কী দিতে পারল? উনিশ শো পাঁচ সালের বাংলা আগে থেকেই সব গেয়ে রেখেছে। বিদেশী-বর্জন? তারও অগ্রদূত বাংলা। জাতীয় শিল্প জাতীয় শিক্ষা জাতীয় সাহিত্য—তারও প্রথম প্রবর্তন বাংলায়। ইংরেজের আদালতের বিচার বর্জন করারও প্রথম নেতা বাংলা—বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল। আর ট্যাক্স না দেওয়ার নীতিও এই বাংলাতেই প্রথম সুরু, যখন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে যশোর ও নদীয়ার চাষীরা একজোট হয়ে চাষ বন্ধ করে দিয়েছিল, অস্বীকার করেছিল খাজনা দিতে। দেখিয়েছিল কী করে মার খেয়ে-খেয়ে মরীয়া হয়ে অত্যাচারীর টুঁটি টিপে ধরতে হয়। অস্পৃশ্যতা-বর্জন? তারও প্রথম নেতৃত্ব বাংলায়, স্বামী বিবেকানন্দ। স্বদেশী-বিদেশী এমন কোনো আন্দোলন নেই যা প্রথম বাংলার মাটি থেকে না সার সংগ্রহ করেছে।

বাংলা আজ যাই ভাবছে কাল তাই ভারতবর্ষের ভাবনা। বলতে গেলে, বাংলা দেশই ভারতবর্ষের মর্মের কামনা।

গান্ধিজি নতুন এক আঙ্গিক যোজনা করলেন। অহিংসা। অহিংসাই গণমানসের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সেখানেই তার সমস্ত রণসম্ভার। তার দৃঢ়তা তার বলবীর্য তার অপ্রকম্প পৌরুষ। নিরস্ত্র দেশের

অহিংসা ছাড়া বৃহত্তর কৌশল নেই। হয় তো বা মহত্তর কৌশল। সমস্ত দেশ অহিংসায় বদ্ধপরিকর হল।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের লেবার-মেম্বর বেন স্পুর ও কর্ণেল ওয়েজউড নাগপুর কংগ্রেসে উপস্থিত ছিল। তারা ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন থাকলেও অসহযোগকে অভ্যর্থনা করতে পারল না। ওয়েজ-উড স্পষ্ট বললে, 'এতে তোমরা তোমাদের ইংলণ্ডের বন্ধুদের হারাবে। তোমাদের আসল কাজে বারে বারে বাধা পাবে। পুলিশ সব সময়ে তোমাদের পিছনে লেগে থাকবে। উকিলেরা তাদের সনদে সর্ত করে এসেছে যে তারা ব্রিটিশ ক্রাউনের অনুগত থাকবে, কথার খেলাপ করে উকিলেরা কী করে অসহযোগ করবে? এ তোমরা মরুভূমির দিকে চলেছ। এ পথ ছাড়ো, গঠনমূলক কার্যসূচী স্থির করো।'

'ভারতবর্ষের বাইরে আমাদের কেউ বন্ধু নেই।' জনতার মধ্য থেকে কে একজন গর্জে উঠল: 'এ সম্বন্ধে কোথাও যেন বিন্দুমাত্র মোহ না থাকে, পৃথিবীতে আমরা বন্ধুহীন। আমরাই আমাদের একমাত্র বন্ধু, আমরাই আমাদের একমাত্র উদ্ধারকর্তা। আমাদের ভবিষ্যৎ রচনা আমাদেরই হাতে। করলে আমরাই সৌধনির্মাণ করব, নইলে আমরাই করে তুলব ভগ্নস্তূপ। বিদেশীদের ছেঁদো কথায় আমরা আর ভুলছিনা। পুলিশ? ও তো আমাদের নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, মৃত্যুর ছায়ার মত প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গী। গত পনেরো বছরে আমরা যদি একটা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে থাকি, জানবে এর জন্যে প্রতিটি টাকা আমরা লাল পাগড়ির আতঙ্ককে আড়াল করে তিল-তিল করে সংগ্রহ করেছি। ওকালতি করতে হলে ব্রিটিশ শাসনের আনুগত্য করতে হবে সনদে এই চুক্তি আছে জানি, তাই তো উকিলদের আজ বলা হচ্ছে সে অবমাননাকর সনদ ছিঁড়ে ফেলুন। মরুভূমির দিকে না এগিয়ে উপায় নেই, যেহেতু আমাদের সেই প্রাচুর্যের দেশ সেই দুধ-মধুর দেশ ঐ মরুভূমিরই

ওপারে। এই বন্ধনবেদনার রাজ্য থেকে বেরিয়ে আলো-হাওয়ার অবাধ দেশে, স্বাধীনতার দেশে, যেতে হলে ঐ মরুভূমির মধ্য দিয়েই তো যেতে হবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ঐ ক্লেশ-কণ্টকের পথ দিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের একজন নেতা চাই, সে শুধু বন্ধন থেকে মুক্তিতেই নিয়ে যাবেনা, অসত্য থেকে সত্যে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতেও আমাদের নিয়ে যাবে। নিয়ে যাবে আদর্শহীনতা থেকে এক চরম চারিত্রিক উৎকর্ষে। তোমরা বোসো, চুপ করো। আমরা পেয়েছি আমাদের সেই নেতা, সেই মহান পথপ্রণেতা। শুনেছি তাঁর পাঞ্চজন্যের ডাক।'

আয়র্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতার জন্যে ম্যাকসুইনি পঁয়ষট্টি দিন উপোস করে থেকে প্রাণত্যাগ করেছে সেই আত্মোৎসর্গকে অভ্যর্থনা জানাল কংগ্রেস।

ছাড়ো, বেরিয়ে এস, বন্ধ করো, হাত তুলে নাও, গুটিয়ে নাও, ওদের দিকে ফিরেও চেয়ো না—দিকে-দিকে বেজে উঠল অসহ-যোগের ডাক। ওদের পঙ্গু করে দাও, নিশ্চল পাথর করে ছাড়ো।

চিত্তরঞ্জন তাঁর রাজকীয় প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই হয়ে দাঁড়ালেন দেশবন্ধু।

বাংলার স্কুল-কলেজ থেকে দলে-দলে ছাত্র-ছাত্রী বেরিয়ে আসতে লাগল। সমস্ত ভারতবর্ষে অসহযোগী ছাত্র-ছাত্রী বাংলাতেই বেশি, সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। মহাত্মার ডাকে যা সম্ভব হয়নি তা সম্ভব হয়েছে একমাত্র চিত্তরঞ্জনের ত্যাগে। শুধু ত্যাগ নয়, অপরিমেয় ত্যাগ। এক তন্তু নিজের জন্যে না রেখে সর্বস্ব দেশমাতৃকাকে উৎসর্গ করে দেওয়া। এমন ত্যাগ যাতে আপোস নেই হিসেব নেই দোকানদারি নেই।

এতেই তো মানুষ অভিভূত হয়ে যাবে। যে দেখবে সেই জয়ধ্বনি দিয়ে উঠবে। সমস্ত প্রাণ-মনকে বাঁধবে এক নতুন চেতনার সুরে।

ছাত্রদের বললেন, তোমাদের লেখাপড়া দু এক বছর বন্ধ থাকতে পারে কিন্তু স্বাধীনতার সংগ্রাম বন্ধ থাকতে পারে না।

কিন্তু এই সংগ্রামে আমার সেনাপতি কই? কই আমার দক্ষিণ হস্ত? উদ্যতায়ুধ দক্ষিণ হস্ত? সে কবে আসবে?

হাতের সমস্ত ব্রিফ ফিরিয়ে দিলেন মক্কেলদের, অন্য ব্যারিস্টার দেখ, আইনের চোখে আমি এখন অস্তিত্বহীন। আষাঢ়ে গল্পের মত শোনাবে এমন প্রকাণ্ড ফি দিয়েও কেউ তাঁকে আটকাতে পারল না। আপনাকে কোর্টে যেতে হবে না, আপনি আপনার বাড়িতে বসেই দুটো আইনের পরামর্শ দিন, যেমন চান তেমনি ফি দেব, আকাশছোঁয়া টাকা। না, আইনের পরামর্শ নয়, দেশ স্বাধীন করার পরামর্শ দিতে পারি, আর তা কোনো ফি নিয়ে নয়, প্রাণের বিনিময়ে। এখন স্বরাজই একমাত্র ধ্যান, একমাত্র উপাসনা। নিয়ত সংগ্রামই সেই আরাধনার রূপ। দু দণ্ড স্থির হয়ে বসবার সময় নেই, বাড়িতে সন্ধ্যায় যে কীর্তন বসাতাম তা পর্যন্ত বন্ধ।

কত লোক মাথায় হাত দিয়ে কাঁদতে বসল। তোমরা কাঁদছ কেন? আমরা যে দুঃস্থ দুর্গত দুরদৃষ্টের দল। আর উনি তো শুধু দেশবন্ধু নন, উনি দীনবন্ধু। আমাদের যে উনি মাস-মাস টাকা দিতেন, আঁজলা ভরা টাকা, বাঁচিয়ে রাখতেন অভাব ও অনাহারের গ্রাস থেকে। উনি তো শুধু দেশবীর নন, দানবীর। উনি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিলেন, রোজগার বন্ধ, আমরা তবে কার কাছে যাব? কে আমাদের দেবে? কে দেখবে?

দেশবন্ধু বললেন, ভগবান দেখছেন ভগবানই দেখবেন। আর দেনেওয়ালাও ভগবান। অমি কে? আমি কিছু না।

শুধু প্র্যাকটিসই ছাড়লেন না, সমস্ত বিলাসিতা ছাড়লেন। একটু-একটু করে রয়ে-সয়ে ছাড়া নয়, একেবারে একসঙ্গে একটানে সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়া। পায়ের সমস্ত দড়াদড়ি রশারশি ছিঁড়ে দিয়ে, কান্না-কোলাহলে কান না দিয়ে, কোন মহাজীবনের ডাকে

সমুদ্রে পাল তুলে দেওয়া। যে বস্ত্রখণ্ড দিয়ে সযত্নে পুঁটলি বাঁধা হয়েছিল, সেই বস্ত্রখণ্ডকেই মুক্ত করে নিয়ে পাল খাটানো। নিজের মাঝে উন্মোচন না ঘটিয়ে বন্ধনমোচনব্রতে লাগি কী করে?

ষাট ইঞ্চি বহরের মিহি ঢাকাই ধুতি পরতেন, তাতে কত রকমের কুঞ্চনের কারুকার্য, কিন্তু এখন? এখন পরছেন কর্কশ খদ্দর, যেমন মোটা তেমনি খাটো। গায়ে দিতেন গিলে-করা ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবি, কিন্তু এখন? এখন গায়ে খদ্দরের ফতুয়া। তাঁর এসব পরতে কোনো কষ্ট নেই কিন্তু যারা তাঁকে দেখছে এ পোশাকে, তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে। এ যেন কাষায় পরে রাজ্য ছেড়ে চলেছে সিদ্ধার্থ।

আর দেবী বাসন্তী? তিনি শিবের পাশে শিবানী হয়ে দাঁড়ালেন। অগ্নির ধর্ম উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য, স্ত্রীর ধর্ম সমতা, সহগামিতা। বাসন্তী দেবীও মিহি শান্তিপুরি শাড়ি ছেড়ে বিছানার চাদরের মত মোটা খদ্দর ধরলেন, তাও মাঝখানে জোড়া দেওয়া আর যেমন ভারি তেমনি স্থূল। পাড় হয় ঢালা লাল নয় ঢালা কালো, কালো যদি বা পরাধীনতার বেদনা হয়, লাল স্বাধীন হবার স্বপ্ন। মূর্তিমান ত্যাগের পাশে মূর্তিমতী প্রশান্তি।

যার কিছু নেই সে ত্যাগ করবে কী? ত্যাগ করবে গৌতমবুদ্ধ। ত্যাগ করবে চিত্তরঞ্জন।

উনিশশো একুশের ফেব্রুয়ারিতে মহাত্মা কলকাতা এলেন আর খুললেন জাতীয় কলেজ। নাম হল গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন।

ছেলেরা গোলামখানা ছেড়ে দিয়ে শুধু ফুটপাতে বসে থাকবে না, তারা তাদের জাতীয় কলেজে ঢুকবে, তাদের বিদ্যার মন্দিরে, আয়তনের আরেক অর্থ মন্দির। সে মন্দিরেই তারা ঠিক-ঠিক জানবে তাদের ইতিহাস, তাদের সংস্কৃতি, তাদের সূচনার মধ্যে কী মহৎ ভবিষ্যৎ, কী সুদূর সম্ভাবনা। তারা ইংরেজের গোলাম হতে জন্মায়নি, তারা জন্মেছে দেশের সেবক হতে। নিজে যদি বলী না হও তবে দেশমাতার কাছে বলি হবে কী করে?

গান্ধিজি চিত্তরঞ্জনের বাড়িতে আছেন। তাঁর প্রাত্যহিক সুতো কাটায় ডাকলেন চিত্তরঞ্জনকে। অনেক তোড়জোড় করে চিত্তরঞ্জন বসলেন চরকা নিয়ে। কিন্তু চাকাই শুধ ঘোরে, ছুঁচের মুখে পাঁজের তুলো শুধু জট পাকায়, এক গাছি সুতোও বের হয় না।

মহাত্মাজি হাসলেন। বললেন, 'তুমি এ কাজের যোগ্য নও।'

উঠে পড়লেন চিত্তরঞ্জন। না, এ আমার যোগ্য নয়। আমি বোধহয় আর কোনো চক্রের পক্ষপাতী।

চিত্তরঞ্জন পূর্ববঙ্গ সফরে বেরুলেন। আগে নারায়ণগঞ্জে, পরে ঢাকা থেকে ময়মনসিং।

ময়মনসিং রেলস্টেশনে দেশবন্ধুকে অভ্যর্থনা করতে বিরাট জনতার সমাবেশ হল। সেই জনসংঘট্ট দেখে ঘাবড়ে গেল ম্যাজিস্ট্রেট। চিত্তরঞ্জনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে বসল। যেহেতু তোমার পদার্পণে ময়মনসিং শহরের শান্তিভঙ্গ হবার সম্ভাবনা এতদ্বারা তোমাকে আদেশ করা যাচ্ছে যে তুমি এই শহরে না ঢোকো।

চিত্তরঞ্জন বললেন, 'আমি আইন অমান্য করব।'

তাঁর সহচর সহকর্মীরা বললে, আপনি এখন আইন অমান্য করে জেলে গেলে সমস্ত আন্দোলন ব্যাহত হবে, সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। এ নিষেধটা আন্দোলনেরই সহায়ক। তা ছাড়া কংগ্রেস এখনো আইন অমান্য করার নির্দেশ দেয়নি।

দেশবন্ধু নিরস্ত হলেন। জনতাকে সম্বোধন করে বললেন, 'তবেই দেখুন রিফর্মস আমাদের কী দিয়েছে? না দিয়েছে চলবার স্বাধীনতা, না বা বলবার, যদিও আমরা অহিংসায় প্রতিশ্রুত। আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি আজ এ বেআইনি আদেশ মেনে নিচ্ছি কিন্তু আমি চাই বেআইনি আইন অমান্য করবার জন্যে দেশবাসীকে আহ্বান করুক কংগ্রেস। স্বরাজ ছাড়া জীবন অসহ্য।'

ময়মনসিঙে বিনা-নোটিশে সর্বব্যাপক হরতাল হয়ে গেল। কেউ-কেউ বললে, সাত দিন চালাব, যত দিন না দেশবন্ধু আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ান।

শোনা গেল রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ঢুকতে দেয়া হয়নি আরাতে, লাজপত রায়কে পেশোয়ারে। কোথাও আইন অমান্য হয়নি।

চিত্তরঞ্জনকে গান্ধিজি তার পাঠালেন, আইন অমান্যের শক্তি বৃদ্ধি করবার জন্যেই আমাদের সজ্ঞানে ও স্বেচ্ছায় বাধ্য থাকতে হবে।

এই অমান্য আন্দোলনের ভূমিকাও বাংলাদেশে, নিমাইয়ের নদীয়ায়। নগরকীর্তন বন্ধ করার আদেশ দিয়েছে কাজি। সবাই ভাবছে, এবার তবে নবদ্বীপ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাই, কীর্তনই যদি বন্ধ হল তবে বিরস জীবনে সুখ কী!

নিমাই রুদ্র মূর্তি ধরল। বললে, আমি নিজে কীর্তন নিয়ে বেরুব নগরে, দেখি কে আমাকে বন্ধ করে! তোমরা তিলার্ধও ভয় কোরো না। মৃদঙ্গ মন্দিরা নিয়ে দলে-দলে চলো আমার সঙ্গে।

লোকসমুদ্র দেখে কাজি পালাল অন্তঃপুরে। দণ্ড নিল বুক পেতে। আদেশ প্রত্যাহার করল। কাজি-দমন হল। নদীয়ার পথে পথে চলল আবার নগরকীর্তন।

ময়মনসিং থেকে চিত্তরঞ্জন গেলেন টাঙ্গাইল, টাঙ্গাইল থেকে চাঁদপুর, চাঁদপুর থেকে চলেছেন মৌলবিবাজার।

চাঁদপুরে জেলেরা এসেছিল দেখা করতে। জেলে-নৌকোয় সমস্ত নদী ভরে গেল। নৌকোর ভিড়ে চলতি স্টিমারগুলো দাঁড়িয়ে রইল। জেলেরা দেশবন্ধুর জন্যে দর্শনী নিয়ে এসেছে। দর্শনী আর কী, সদ্যধরা মাছ, ডোল-ভরতি মাছ, মাছের পাহাড় হয়ে উঠল।

মৌলবিবাজারের পথে প্রতি রেলস্টেশনে মানুষের স্তূপ। দেশবন্ধুকে দেখবে। একবার তিনি দাঁড়ান দরজার সামনে। একবার তাঁকে দেখি। শুনি তাঁর সৌম্যস্বর।

রাত প্রায় চারটে, দেশবন্ধু তাঁর কামরায় আপার বার্থে ঘুমুচ্ছেন,

সঙ্গে আছেন বাসন্তী দেবী আর হেমন্ত সরকার। হঠাৎ দরজা ঠেলে এক উন্নতকায় বলিষ্ঠ শিখ ভদ্রলোক কামরাতে ঢুকে পড়ল।

'কী চাই?' হেমন্ত বাধা দিল।

'দেশবন্ধু কোথায়?'

'কেন, তাঁকে কেন? তিনি ঘুমুচ্ছেন।' আপার বার্থের দিকে ইঙ্গিত করল হেমন্ত।

'হ্যাঁ, এই তো।' শিখ ভদ্রলোক আনন্দে বিভোর হয়ে গেল: 'তাঁকে দেখবার জন্যে এই দূরাঞ্চলে আসতে আমি সাত দিন ধরে হেঁটেছি আর দু দিন ধরে ঠায় বসে আছি প্ল্যাটফর্মে। পেটে দু দিন কিছু পড়েনি। না পড়ুক, তবু দেখা যে পেয়েছি এই আমার ভাগ্য।' বলে বিরাট বাহু মেলে দেশবন্ধুকে সে জড়িয়ে ধরল, প্রায় বুকে করেই নামিয়ে আনল নিচে।

দেশবন্ধু ভীষণ হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, ভেবেছিলেন ট্রেনদুর্ঘটনা বোধহয়। পরে বুঝলেন এ হচ্ছে তাঁর মাধ্যমে ভক্তের দেশবন্দনা। বহু-দিনের নিরুদ্ধ আবেগ যেন আজ মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে চোখের সামনে।

এলেন বরিশাল। সভাপতি বিপিনচন্দ্র পাল।

বিপিন পাল বললেন, ম্যাজিকে বিশ্বাস করিনা, লজিকে বিশ্বাস করি। স্বরাজকে নির্বিশেষ রাখলে চলবে না, স্বরাজকে হতে হবে গণতান্ত্রিক স্বরাজ।

চিত্তরঞ্জন মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, কোনো বিশেষণ দিয়ে স্বরাজকে চিহ্নিত বা খণ্ডিত করা নয়। স্বরাজ একটি পরিপূর্ণ সংজ্ঞা। জীবনের সার্বিক ও সামগ্রিক অভ্যুদয়। আর, লজিক ভালো বটে কিন্তু মাঝেমাঝে লজিকের বাইরেও কিছু ঘটে যাকে নিছক ম্যাজিক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

বিপিনচন্দ্র ভিন্ন হয়ে গেলেন। তিনি গান্ধিবাদ মেনে নিতে পারলেন না।

চিত্তরঞ্জন দুঃখিত হলেন কিন্তু হতাশ হলেন না। একজন যাবে

আরেকজন আসবে, একজন পড়বে আরেক জন উঠবে, স্বাধীনতার জয়যাত্রা পথভ্রষ্ট হবে না। সব পথই স্বাধীনতার পথ।

যে বিমুখ হয়ে চলে যাচ্ছে তার দিকে না তাকিয়ে যে আসছে তার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকাই ভালো।

খবর এল চাঁদপুরে-চট্টগ্রামে রেল-স্টিমারের শ্রমিকেরা ধর্মঘট করেছে। মেদিনীপুরে স্থুরু হয়েছে ইউনিয়ন বোর্ডের বিরুদ্ধে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট বুঝতে পারছে সঙ্ঘশক্তির সঙ্ঘর্ষ। শ্রমিক আন্দোলনের নায়ক যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, না-ট্যাক্স আন্দোলনের নায়ক বীরেন্দ্রনাথ শাসমল। একজন দেশপ্রিয় আরেকজন দেশপ্রাণ।

শ্রমিক ধর্মঘট দীর্ঘদিনব্যাপী হল বলে শেষ পর্যন্ত ভেঙে গেল, কিন্তু মেদিনীপুর অবাঞ্ছিত আইন উঠিয়ে দিয়ে তবে ছাড়লে। কোনো পীড়ন-নির্যাতনেও সে কাতর হল না, মিলিটারি পুলিশের বুটের ঠোক্করেও বাঁকা করল না মেরুদণ্ড। ক্ষুদিরামের মেদিনীপুর, সংগ্রামে সব সময়েই অনন্য ও অগ্রগণ্য। দেয়ালে লেখা কালো অক্ষরের মলিন আইন মুছে দিল দেয়াল থেকে।

উনিশ শো একুশের মে-তে স্থভাষ আই-সি-এস এ ইস্তফা দিয়ে ষোলই জুলাই বোম্বাই পৌঁছুল। বোম্বাইয়ে প্রথম ও একমাত্র কাজই হচ্ছে মহাত্মার সঙ্গে দেখা করা। পরিষ্কার করে বুঝে নেওয়া তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের তাৎপর্য কী। কোথা থেকে স্থুরু করে কী ভাবে কোথায় গিয়ে পৌঁছুতে হবে।

মণিভবনে স্থভাষের ডাক পড়ল। সেখানেই আছেন গান্ধিজি। স্থভাষ ঢুকেই অপ্রতিভ হয়ে গেল, মহাত্মা ও তাঁর আশেপাশের সহকর্মীরা সবাই শুভ্র খদ্দর পরে বসে আছেন আর তার গায়ে কিনা বিলিতি পোশাক। গান্ধিজি তাঁর মনোহর হাসিতে স্থভাষের এই বিড়ম্বিত ভাবটা কাটিয়ে দিলেন, সদ্য সদ্য এসেই তার নব বেশ পরিধানের অবকাশ কোথায়?

হয়তো বা দেখতে পেলেন শাদা খদ্দরে সুভাষকে একদিন কত সুন্দর ও শুচিভাস্বর দেখাবে।

হৃদ্যতার পরিবেশে প্রশ্নোত্তর চলতে লাগল। সুভাষ যদিও বা কখনো উত্তেজিত হয়, গান্ধির ধৈর্যে আঁচড় পড়ে না।

শুধু ট্যাক্স বন্ধ করে ও আইনঅমান্য করেই কি ব্রিটিশকে হটানো যাবে? আপনি যে নাগপুর কংগ্রেসে একবছরের মধ্যে স্বরাজ আসবে বলেছেন, সেই এক বছরে?

শান্ত স্বরে গান্ধি বললেন, এক কোটি লোক কংগ্রেসের সভ্য হয়েছে, আদায় হয়েছে এক কোটি টাকা। এখন প্রধান আন্দোলন হবে বিদেশী বস্ত্রবর্জন আর খদ্দরের প্রসার।

তাতে কি আপনি আশা করেন যে ল্যাঙ্কাশায়ার বিপন্ন হবে আর তাতেই কি ব্রিটিশ ক্যাবিনেট নত হবে অনুগ্রহে?

তা হয়তো নয়। গান্ধি চিন্তিত মুখে বললেন।

তবে?

কথার সুরে তপ্ত আন্তরিকতা, গান্ধি উত্তর না দিয়ে পারলেন না। বললেন, দেশব্যাপী খদ্দরের আন্দোলন সফল হতে সুরু হলেই গভর্নমেণ্টের টনক নড়বে। যখন দেখবে কংগ্রেসের শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক আন্দোলন কার্যকর হচ্ছে তখনই অস্থির হয়ে গভর্নমেণ্ট আঘাত হানবে। আমরা তখন আইন-অমান্য সুরু করব। জেলখানা ভরে ফেলব। সরকারকে তখন জেলখানার পর জেলখানাই শুধু স্থাপন করতে হবে। আর ঐ শেষ পর্যায়েই দেখা দেবে ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন—গণ-উত্থান।

তারপর?

গান্ধি স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

সুভাষের মনে হল, হয় পরের কথাটা গান্ধির জানা নেই নয়তো তার কাছে তা পুরোপুরি ভাঙছেন না।

ভাঙছেনই বা না কেন? গণ-উত্থানের পরিণামে ব্রিটিশকে কী

শক্তিতে বিতাড়িত করতে হবে এ সম্বন্ধে ধারণায় তীক্ষ্ণতা ও স্পষ্টতা থাকা তো বেশি দরকার, প্রথম থেকেই দরকার।

কে জানে মানুষের অন্তর্নিহিত মহত্ত্বে পরমবিশ্বাসী মহাত্মা আশা করছেন ইংরেজের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে। শ্বেত হৃদয় অনুরাগে রক্তিম হবে। স্বদেশে স্বরাজ পাবার দাবি যে অত্যন্ত ন্যায্য এ বুঝে হৃত ধন ফিরিয়ে দিয়ে ইংরেজ সরে পড়বে গুটিগুটি। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহা সোনা হতে পারে কিন্তু শত ধর্মকথায়ও সাম্রাজ্যবাদীর মনের চেহারার বদল হয় না।

বাংলাদেশের পাঁচালি গানের কথা স্মরণ করো। 'জোর বিনে সই চোর কখনো ধর্মশাস্ত্র মানে ?'

সুভাষের মন ভরল না। স্বর্গের সিঁড়ির শেষ ধাপগুলি যেন ধোঁয়াটে হয়ে রইল।

এখন কী করি, কোথায় যাই ? সব ছেড়ে দিয়ে ভারতবর্ষে ফিরলাম সে কি শুধু এই ধোঁয়ায় পথ হাতড়ে বেড়াবার জন্যে ?

গান্ধিজিই বলে দিলেন, চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে গিয়ে দেখা করো। তিনিই বলে দেবেন, দেখিয়ে দেবেন।

মুহূর্তের জন্যে ঐ মনোমোহন নাম কি সুভাষ ভুলে গিয়েছিল ? নইলে আই-সি-এস ছাড়বার সঙ্কল্প করে সে তো চিত্তরঞ্জনকেই চিঠি লিখেছিল, জানতে চেয়েছিল দেশের কোন কাজে তিনি তাকে লাগাতে পারেন। তার তো নেতা নির্বাচনে ভুল হয়নি। তবে আর দ্বিধা কেন, কেন অকারণ নৈরাশ্য ?

কত বড় ভার সুভাষ দিয়েছিল চিত্তরঞ্জনকে। যদি কোনো ইংরিজি পত্রিকা চালাতে চান আমি তার সম্পাদনা বিভাগে থাকতে পারি। আর যদি মনে করেন সেই কারণে শিক্ষানবিশি করতে আমার ইংলণ্ডে থাকা দরকার, আমি থেকে যাব। নতুবা আমার ইচ্ছে সিভিল সার্ভিসে ইস্তফা দিয়ে জুন মাসেই আমি দেশে ফিরি।

তখন আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আপনার ইচ্ছার কাছে আমার ইচ্ছা সব সময়েই নত থাকবে।

আর কথা নেই। সুভাষ ছুটল কলকাতা। হাওড়া স্টেশন থেকেই সোজা চিত্তরঞ্জনের বাড়ি।

সেখানে আবার হতাশার সঙ্গে দেখা। চিত্তরঞ্জন কলকাতায় নেই। পূর্ববঙ্গ সফর করতে বেরিয়েছেন।

ফিরবেন কবে?

কে জানে। দিন তারিখ ঠিক নেই।

উপায় নেই, প্রতীক্ষা করতে হবে। এক বছরের মধ্যেই স্বরাজ আসবে এই অবাস্তব অতিব্যস্ততায় সুভাষ বিশ্বাসী নয়। মহার্ঘতমের জন্যে কঠিনতম তপস্যায় সে প্রস্তুত। এবং সুদীর্ঘতম তপস্যায়। কোনো দামি বস্তু দ্রুত নিতে গেলেই বোধহয় তার স্থির মূল্যের অপলাপ ঘটে।

দেশবন্ধু যেদিন ফিরলেন সেদিনই ফের দেখা করতে গেল সুভাষ। গিয়ে শুনল তিনি বাড়ি নেই। কিন্তু সুভাষকে এবার ফিরে যেতে দেওয়া হল না। বাসন্তী দেবী তাকে ডেকে নিলেন। সগৌরবে, বিপুল সন্তানস্নেহে। সুভাষ বাসন্তী দেবীকে প্রণাম করল। ডাকল মা বলে।

'কই আমার সোনার চাঁদ ছেলে।' দেশবন্ধু কাছে এসে দাঁড়ালেন।

এই সেই চিত্তরঞ্জন? ওটেনের ব্যাপারে যাঁকে প্রথম দেখেছিল, যাঁর কাছ থেকে এসেছিল পরামর্শ নিতে, সেই সহস্ররশ্মি ব্যারিস্টার? এক মাসের রোজগার যিনি এক দিনে এক বেলায় এক মুষ্টিতে দিয়ে ফেলতে পারেন এ সেই দাতার রাজরাজেশ্বর? এ তিনি কেমন হয়ে গিয়েছেন! শরীর সেই রকমই আছে বটে, সেই বিস্তৃতবক্ষ বিশালবাহু দীর্ঘায়ত, কিন্তু এ তাঁর কী বেশ, দীনবেশ না রাজবেশ! সর্বাঙ্গে শুদ্ধশুভ্র খদ্দর, স্বল্প ও স্থূল, কিন্তু তাঁকে দেখাচ্ছে মহাযোগী মহেশ্বরের মত। সন্দেহ কী, এই তো লোকগুরু লোকেশ, নিজের

দৃষ্টান্তের ঔজ্জ্বল্যেই উন্মুখর। কিছুই বলতে হয় না মুখ ফুটে, শুধু আমায় দেখ, আমায় দেখে এক পলকে বুঝে নাও আমি কী চাই, কী আমার বক্তব্য! যিনি সর্বস্ব দিয়ে দিতে পারেন তিনিই বুঝি চেয়ে নিতে পারেন সর্বস্ব! 'আপনি না কৈলে কিছু বুঝান না যায়!' নিজে সব খুইয়ে পথে ভেসে পড়তে পারলেই বুঝি ভাসিয়ে নেওয়া যায় অন্যকে। 'আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়। আমি তারি লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যে জন ভাসায়।' শেষে সর্বনাশকই সর্বভাসকের পদ নেয়।

সুভাষ দেখল এ শুধু নেতৃত্বের সাজসজ্জা নয়, এ এক আধ্যাত্মিক শক্তির বিভূতি!

দেশবন্ধুও দেখলেন সুভাষকে। যৌবনের শিখরে প্রথমোদিত পবিত্রদীপ্ত বিবস্বানকে। বাঙালি ছাত্রের যা বৃহত্তম স্বপ্ন আই-সি-এস তাই পেয়ে যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়ে এসেছে, দেশের সেবায় দুঃখে দারিদ্র্যে ক্লেশে কৃচ্ছ্রে কাঠিন্যে উৎসর্গীকৃত হবে বলে। বৃহৎব্রতধর বিদ্যুদবিদ্বান বিশ্বজেতা। দেশবন্ধু বুঝলেন এ শুধু ক্ষণিক উত্তেজনার রাগরঙ্গ নয়, এ এক গহনচর আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা।

সুভাষ চিনল তার নেতাকে। দেশবন্ধুও বুঝলেন এতদিনে এল তাঁর সেনাপতি, তাঁর সমানানুরাগ বন্ধু।

দুজনে নিভৃতে আলাপ করতে বসলেন।

আলাপান্তে লোকালোকনমস্কৃত নেতাকে আবার প্রণাম করল সুভাষ। বললে, আমাকে আদেশ করুন।

শুভ্রশোভন খদ্দরে কী অপরূপ দেখাচ্ছে সুভাষকে। চতুর্দিকে যেন দীপ্তি ও নির্মলতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। কী হবে রূপে কী হবে বিদ্যায় যশে অর্থে প্রতিপত্তিতে যদি না অম্লান চরিত্র থাকে, যদি না থাকে প্রত্যয়ের পবিত্রতা! দুই দিকেই সুভাষ জ্যোতির্ময়, গুরুগুণগরিষ্ঠ। দেশবন্ধু বললেন, 'জাতীয় বিদ্যায়তনে তুমি অধ্যক্ষ হও।'

তথাস্তু। তারপর?

কংগ্রেসের প্রচারবিভাগের ভার নাও।

তারপর?

বস্ত্রদহনযজ্ঞ সুরু করো।

পার্কে পার্কে বিদেশী বস্ত্র ভস্মীভূত হতে লাগল। মহাত্মা গান্ধি এসে গেছেন কলকাতায়, সঙ্গে মহম্মদ আলি। হরিশ পার্কের সভায় গান্ধি জনতার কাছে বস্ত্র ভিক্ষা করলেন, তখন অখদ্দর বস্ত্র অর্থই বিদেশী বস্ত্র। প্রথমে কেউ সাড়া দিল না কিন্তু যেই দেশবন্ধু দাঁড়িয়ে উঠে আবেদন জানালেন, দেখতে দেখতে কাপড়-জামা-চাদরের এক বিরাট পাহাড় গড়ে উঠল। মহাত্মা স্বহস্তে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। শত শিখায় লেলিহান ধ্বনি উঠল—বন্দেমাতরম।

পরদিনই নিজের বাড়িতে বস্ত্রযজ্ঞের আয়োজন করলেন দেশবন্ধু। তাঁর বাইরের উঠোনে, যেখানে আগে টেনিসকোর্ট ছিল, বিদেশী কাপড় স্তূপীকৃত হল। দাশ-সাহেবের যত স্যুট কোট ছিল, মেয়েদের যত আচ্ছাদন, সমস্ত অগ্নয়ে স্বাহা হয়ে গেল। চিতাশয্যায় মুখাগ্নি করল স্বয়ং সুভাষ, যে বিদেশী ডিগ্রির সনদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। হে বিভাবসু অগ্নি, হে অমল করালাক্ষ, আমাদের পরাধীনতার দুঃখ উন্মূলন করো, তোমার শুচিশুভ্র আলোকে আমাদের স্বাধীনতা-লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিত হোক।

বন্দেমাতরম। উঠল আবার সেই বৃহৎ জয়ধ্বনি। স্বর্গ হতেও গরীয়সী আমাদের মাতা জন্মভূমিকে বন্দনা করি। অনেকশস্ত্রহস্তা সর্বদানবঘাতিনী শ্রীধরী মা আমাদের।

প্রত্যক্ষ আইন অমান্য নয় তবু গভর্নমেণ্ট খেপে গেল। গ্রেপ্তার করল যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে, ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে, পীর বাদশা মিঞাকে, যুক্ত প্রদেশের প্রভুদয়ালকে, ডাক্তার আবদুল করিমকে। ওয়ালটারে গ্রেপ্তার হল মহম্মদ আলি আর সওকত আলি গ্রেপ্তার হল বোম্বাইয়ে।

এদিকে চেমসফোর্ড সরেছে, তার জায়গায় লাটগিরি করতে এসেছে লর্ড রেডিং। এসেই মহাত্মার সঙ্গে মিলেছে সাক্ষাৎকারে। আশ্বাস দিয়েছে যতক্ষণ অসহযোগ আন্দোলন অহিংস থাকবে ততক্ষণ বড়লাট কংগ্রেসের গায়ে হাত তুলবে না। বেশ, তাই, স্বীকৃত হলেন মহাত্মা। কিন্তু, এ কী? বড়লাট দেখাল মহম্মদ আলি কোথায় বক্তৃতা দিয়েছে যার প্রচ্ছন্ন সার কথাই হচ্ছে হিংসাত্মক বিদ্রোহ। মহাত্মা নীরবে পড়লেন বক্তৃতাটা। হ্যাঁ, এমনি ধারা অর্থ একটা করা যায় বটে। মহাত্মা অপ্রসন্ন হলেন।

এ সম্বন্ধে কী করতে চাও? জিজ্ঞেস করল লর্ড রেডিং।

মহাত্মা বললেন, আমি মহম্মদ আলিকে দিয়ে উলটো কথাটা বলিয়ে নিচ্ছি। সে জনতাকে হিংসার পথ পরিহার করতে বলছে, সে হিংসায় স্বীকৃত নয়, এমনি ধরনের কথা।

মহাত্মার এই ভঙ্গিটা অনেকেরই মনঃপূত হল না। এ তো প্রায় ক্ষমা চাওয়া, দুঃখ প্রকাশ করা, বক্তৃতা প্রত্যাহার করে নেওয়া। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু আপত্তি জানিয়ে চিঠি লিখলেন। কিন্তু গান্ধি টললেন না। অসহযোগ তো অহিংসই, সুতরাং যে অসহযোগী সে যদি বলে, হিংসার পথ আমার পথ নয়, হিংসায় আমি বিশ্বাসী নই, তা হলে সেটা তার পক্ষে অবমাননাকর হয় না।

মহম্মদ আলি মহাত্মার কথা রাখল। তুলে নিল বক্তৃতা। বিবৃতি দিল, জনতাকে হিংসায় প্ররোচনা দেবার মত তার কোনো অভিসন্ধি ছিল না।

লর্ড রেডিং খুশি হল। মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত অভিযোগ খারিজ করে দিল।

কিন্তু এখন হল কী? সেবার ছাড়লেও এবার ছাড়ল না।

জুলাই মাসে করাচিতে খিলাফত কনফারেন্সে সভাপতির আসন থেকে মহম্মদ আলি খুব একটা ক্রুদ্ধ-তপ্ত বক্তৃতা দিল। সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করাল, সরকারি চাকরিতে যে কেউ মুসলমান নিযুক্ত

আছ, সৈন্যবাহিনীতেই হোক বা পুলিশবাহিনীতেই হোক, চাকরি ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে এস। শুধু কেরানি উকিল নয়, পুলিশ ও সৈন্য —এতটা যেন গভর্নমেণ্ট হজম করতে পারল না। জুলাইয়ের অপরাধে সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হল দু ভাই। বিচারে দু বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।

গান্ধিজির কাছে সরকারি ধূর্ততা অসহ্য মনে হল। করাচি প্রস্তাবে এমন কী আছে যা অসহযোগের সারসন্দর্ভ নয়? অসহযোগের কথাটাই তো সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কথা। তার মধ্যে পুলিশ আর সৈন্য শব্দদুটো আলাদা উচ্চারণ করে বললে মহাভারত কী এমন অশুদ্ধ হয়ে যায়!

করাচিতে পাশ-করা প্রস্তাবটা, যেটার উপর আলি-ভাইদের দণ্ড, চল্লিশজনেরও বেশি কংগ্রেসনেতা দস্তখৎ করলেন, সেটা দিকে-দিকে প্রকাশিত হল, মুখরিত হল, হাজার সভামঞ্চ থেকে সেটা ঘোষিত ও গৃহীত হল, কিন্তু গভর্নমেণ্ট এসব নির্বিষ পুনরুক্তিকে কোনো মূল্য দিল না, উপেক্ষায় নির্বিকার হয়ে রইল। অনেকে ভেবেছিল স্বাক্ষরদাতা সব কয় নেতাকেই গ্রেপ্তার করা হবে, এক অপরাধে এক শাস্তিই বিধেয়, কিন্তু লর্ড রেডিং ফিরেও তাকাল না, যেন ঐ প্রস্তাবটা, যে কাগজের উপর লেখা তার চেয়েও কম দামি।

ইচ্ছে হলেই বিধি, আবার ইচ্ছে হলেই সুবিধে।

দেশবাসীর বিক্ষত অন্তরে সান্ত্বনার একটু প্রলেপ বুলুতে চাইল গভর্নমেণ্ট। ইংলণ্ডের যুবরাজকে নিয়ে আসা যাক। সে উপলক্ষে অনেক আলো জ্বলবে, বাজি পুড়বে, অনেক ভোজ-পান গীত-নৃত্যের আয়োজন হবে, কিছু না হয় নীতিগর্ভ মোলায়েম কথা বলানো যাবে যুবরাজকে দিয়ে, তাতেই বিক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হবে আশা করি। ঘোষণা করা হল সতেরোই নভেম্বর যুবরাজ বোম্বাইয়ে পদার্পণ করবে।

তখনো যুবরাজ। পরে অবশ্যি কিছুকাল রাজত্ব করেছিল অষ্টম

এডওয়ার্ড হয়ে। শেষকালে মিসেস সিম্পসনের জন্যে সিংহাসন ছেড়ে দেয়। পরিচিত হয় সামান্য ডিউক বলে। ডিউক অফ উইণ্ডসর রূপে। তারই ছোট ভাই ষষ্ঠ জর্জ নাম নিয়ে বসে রাজা হয়ে।

কিন্তু এখন শুধু যুবরাজ, প্রিন্স অফ ওয়েলস। বিস্তারী ব্রিটিশ শাসনের স্পর্ধিত প্রতীক।

ভারতবর্ষ একে মনোহত, তায় তার কাটা ঘায়ে আবার এই নুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ফতোয়া দিল, যুবরাজের আসার দিন, সতেরোই নভেম্বর, সারা দেশময় হরতাল পালন করো।

দেশবন্ধু ডাকলেন সুভাষকে। সুভাষ শুধু প্রচারেই নেই, আছে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনে। তাকেই তো দেশবন্ধুর সবচেয়ে বেশি দরকার।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বুঝছ?'

'কী বলব!' বিনীত প্রশান্ত মুখে সুভাষ বললে, 'কালকেই দেখতে পাবেন।'

'যারা স্টেশনে হঠাৎ এসে পড়বে তাদের কী হবে?'

'কিছু ভাববেন না। শিশু নারী ও রুগ্নের জন্যে গাড়ি থাকবে। যারা দুর্বল ও অসহায় তাদেরকে অযথা বিপন্ন হতে দেব না।'

উনিশ শো একুশের সতেরোই নভেম্বর কলকাতা দেখাল কাকে বলে হরতাল। সেই প্রথম হরতাল। একটিও দোকানপাট খোলেনি, বাজার বসেনি, যানবাহনের চিহ্নও কোথাও নেই। আদালতে উকিল-মক্কেল আসেনি, শুধু আমলা-ফয়লা দিয়ে কী হবে? স্কুল-কলেজ তালা দেওয়া। সরকারি অফিসে জোহুকুমরা এসেছে বটে কিন্তু তাদের কলম চলছেনা। বাবুর্চি-খানসামারাও একদিনের ছুটি নিয়েছে। কসাইয়ের দোকানে মাংস নেই।

এমন দৃশ্য আর দেখেনি কলকাতা। এমন ইটপাথর লোহা-লক্কড়ের মরুভূমি। শোনেনি এমন শ্মশানস্তব্ধতার অট্টহাসি।

কোথাও এতটুকু জোরজুলুম নেই। সবাই প্রাণের টানে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিবাদ। বিরতি আর নীরবতার প্রতিবাদ।

শুধু সুভাষ শেয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে ছুটোছুটি করছে। শিশু নারী আর রুগ্নদের পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ির তদারক করছে। সে সব গাড়িতে প্ল্যাকার্ড লাগানো: 'অন ন্যাশন্যাল সার্ভিস' বা জাতির সেবায় নিয়োজিত।

এ চিত্রের পরিকল্পক দেশবন্ধু, শিল্পী সুভাষ। এ এক বিশ্ব-বিমোহন চিত্র। যে দেখল সেই ধন্য-ধন্য করল। শুধু ইংরেজের সইল না, তার চক্ষুর শূল মর্মের শেল হয়ে রইল।

সরকারি চাতুরি বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে তুলেছিল কিন্তু কলকাতায় নিটুট শান্তি, নিখুঁত মৌন। বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ জন মারা পড়ল, আহতের সংখ্যা প্রায় আটগুণ। দাঙ্গায় লিপ্ত জনতার মধ্যে বুক দিয়ে পড়লেন গান্ধি, শোনালেন কত শান্তির ললিত বাণী, কত ধর্মকাব্য, কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হল। সরোজিনী নাইডুর মর্মস্পর্শী আবেদনেও কেউ সাড়া দিল না। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গান্ধি পাঁচ দিন অনশন করলেন, বললেন, নাকে স্বরাজের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি।

কিন্তু কলকাতার খবরে খুশি হলেন। কলকাতা শান্তির ছবি। এর জন্যে কৃতিত্ব দাবি করবে সুভাষের নেতৃত্বে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী আর তার সঙ্গে খিলাফত কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা। তা দাঙ্গাই হোক আর নিশ্ছিদ্র শান্তিই হোক এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যুবরাজকে কেউ চায়না। ভারতবর্ষে তার আবির্ভাব শোকাবহ।

যুবরাজ, ফিরে যাও। সংগ্রাম, তুমি এস। সঙ্গে করে নিয়ে এস স্বাধীনতাকে।

এডওয়ার্ড হয়ে। শেষকালে মিসেস সিম্পসনের জন্যে সিংহাসন ছেড়ে দেয়। পরিচিত হয় সামান্য ডিউক বলে। ডিউক অফ উইণ্ডসর রূপে। তারই ছোট ভাই ষষ্ঠ জর্জ নাম নিয়ে বসে রাজা হয়ে।

কিন্তু এখন শুধু যুবরাজ, প্রিন্স অফ ওয়েলস। বিস্তারী ব্রিটিশ শাসনের স্পর্ধিত প্রতীক।

ভারতবর্ষ একে মনোহত, তায় তার কাটা ঘায়ে আবার এই নুনের ছিটে, পোড়ার উপর পোড়া। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ফতোয়া দিল, যুবরাজের আসার দিন, সতেরোই নভেম্বর, সারা দেশময় হরতাল পালন করো।

দেশবন্ধু ডাকলেন সুভাষকে। সুভাষ শুধু প্রচারেই নেই, আছে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনে। তাকেই তো দেশবন্ধুর সবচেয়ে বেশি দরকার।

জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন বুঝছ ?'

'কী বলব!' বিনীত প্রশান্ত মুখে সুভাষ বললে, 'কালকেই দেখতে পাবেন।'

'যারা স্টেশনে হঠাৎ এসে পড়বে তাদের কী হবে ?'

'কিছু ভাববেন না। শিশু নারী ও রুগ্নের জন্যে গাড়ি থাকবে। যারা দুর্বল ও অসহায় তাদেরকে অযথা বিপন্ন হতে দেব না।'

উনিশ শো একুশের সতেরোই নভেম্বর কলকাতা দেখাল কাকে বলে হরতাল। সেই প্রথম হরতাল। একটিও দোকানপাট খোলেনি, বাজার বসেনি, যানবাহনের চিহ্নও কোথাও নেই। আদালতে উকিল-মক্কেল আসেনি, শুধু আমলা-ফয়লা দিয়ে কী হবে ? স্কুল-কলেজ তালা দেওয়া। সরকারি অফিসে জোহুকুমরা এসেছে বটে কিন্তু তাদের কলম চলছেনা। বাবুর্চি-খানসামারাও একদিনের ছুটি নিয়েছে। কসাইয়ের দোকানে মাংস নেই।

এমন দৃশ্য আর দেখেনি কলকাতা। এমন ইটপাথর লোহা-লক্কড়ের মরুভূমি। শোনেনি এমন শ্মশানস্তব্ধতার অট্টহাসি।

কোথাও এতটুকু জোরজুলুম নেই। সবাই প্রাণের টানে পাঠিয়ে দিয়েছে প্রতিবাদ। বিরতি আর নীরবতার প্রতিবাদ।

শুধু সুভাষ শেয়ালদা ও হাওড়া স্টেশনে ছুটোছুটি করছে। শিশু নারী আর রুগ্নদের পৌঁছে দেবার জন্যে গাড়ির তদারক করছে। সে সব গাড়িতে প্ল্যাকার্ড লাগানো: 'অন ন্যাশন্যাল সার্ভিস' বা জাতির সেবায় নিয়োজিত।

এ চিত্রের পরিকল্পক দেশবন্ধু, শিল্পী সুভাষ। এ এক বিশ্ব-বিমোহন চিত্র। যে দেখল সেই ধন্য-ধন্য করল। শুধু ইংরেজের সইল না, তার চক্ষুর শূল মর্মের শেল হয়ে রইল।

সরকারি চাতুরি বোম্বাইয়ে দাঙ্গা বাধিয়ে তুলেছিল কিন্তু কলকাতায় নিটুট শান্তি, নিখুঁত মৌন। বোম্বাইয়ের দাঙ্গায় প্রায় পঞ্চাশ জন মারা পড়ল, আহতের সংখ্যা প্রায় আটগুণ। দাঙ্গায় লিপ্ত জনতার মধ্যে বুক দিয়ে পড়লেন গান্ধি, শোনালেন কত শান্তির ললিত বাণী, কত ধর্মকাব্য, কিন্তু সমস্ত নিষ্ফল হল। সরোজিনী নাইডুর মর্মস্পর্শী আবেদনেও কেউ সাড়া দিল না। জনতার উচ্ছৃঙ্খলতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ গান্ধি পাঁচ দিন অনশন করলেন, বললেন, নাকে স্বরাজের দুর্গন্ধ টের পাচ্ছি।

কিন্তু কলকাতার খবরে খুশি হলেন। কলকাতা শান্তির ছবি। এর জন্যে কৃতিত্ব দাবি করবে সুভাষের নেতৃত্বে গঠিত স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী আর তার সঙ্গে খিলাফত কর্মীদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা। তা দাঙ্গাই হোক আর নিশ্ছিদ্র শান্তিই হোক এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হল যুবরাজকে কেউ চায়না। ভারতবর্ষে তার আবির্ভাব শোকাবহ।

যুবরাজ, ফিরে যাও। সংগ্রাম, তুমি এস। সঙ্গে করে নিয়ে এস স্বাধীনতাকে।

দুই

এই অসম্মান ইংরেজরাজ সহ্য করল না। তারা তাদের তলোয়ারে নতুন শান চড়াল। বুটের ফিতে বাঁধল আরো আঁট করে।

ফিরিঙ্গিদের কাগজ স্টেটসম্যান আর ইংলিশম্যান কান্নার রোল তুলল। এ কী দৃশ্য দেখতে হল আমাদের! গোটা কলকাতা শহর কতগুলো কংগ্রেসী ভলানটিয়ার দখল করে নিয়েছে আর সরকার ভয়ে রাজ্য ছেড়ে চলে গিয়েছে বনবাসে। সরকারের এমন পঙ্গুতা এমন অকর্মণ্যতা আর কখনো দেখিনি। কতগুলো ভলানটিয়ার, তারাই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য পাবে?

সঙ্গে-সঙ্গেই গভর্নমেণ্ট কাজে লেগে গেল। কংগ্রেস আর খিলাফত আফিসে পুলিশ হানা দিল, নিয়ে গেল কাগজপত্র, আর পর দিনই কংগ্রেস আর খিলাফতের অধীন যত স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী ছিল সব বেআইনি বলে ঘোষণা বেরুল। আর সমস্ত সভাসমাবেশ ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

সুভাষের আনন্দ দেখে কে। সে ঘ্রাণে সংগ্রামের সুগন্ধ টের পাচ্ছে।

দেশবন্ধু তখন সুরাট যাচ্ছেন ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যোগ দিতে। বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত দিনকতক চুপচাপ থাকো। দেখি মহাত্মা কী বলেন। আমার ভয় হচ্ছে শিগগিরই তোমাদের তিনজনকে ধরে নিয়ে যাবে, শাসমলকে সুভাষকে আর মজিবরকে।

বীরেন শাসমল আর মজিবর রহমান যথাক্রমে কংগ্রেস ও খিলাফতের সেক্রেটারি বা সম্পাদক আর সুভাষ পাবলিসিটি অফিসর বা প্রচারকর্তা।

'ধরলে তো বাঁচি।' সুভাষ বললে হাসিমুখে।

ওয়ার্কিং কমিটির সভা সুরাটে না বসে বোম্বাইয়ে বসল। সেখান থেকে দেশবন্ধু নির্দেশ নিয়ে এলেন প্রত্যেক প্রদেশ নির্দিষ্ট পরিধির মধ্যে আইন অমান্য আন্দোলন চালাতে পারবে, কিন্তু এক সর্তে, একমাত্র সর্তে যে, বাক্যে ও আচরণে থাকতে হবে অহিংস। নির্বিষ ও নির্বিদ্বেষ।

এদিকে ঘোষণা হল যুবরাজ চব্বিশে ডিসেম্বর কলকাতা আসছে। আবার অন্য দিকে প্রতিঘোষণা বেরুল সেদিন কলকাতায় হরতাল, আবার হরতাল।

দেশবন্ধু ফিরে এলেন। তাঁকে বাংলা দেশের আইন অমান্য আন্দোলনের ডিকটেটর বা একনায়ক করা হল। ঠিক হল পাঁচজন করে ভলানটিয়ার একসঙ্গে শোভাযাত্রা করে খদ্দর বেচতে বেরুবে ও তাদের থেকে একটু দূরে বিচ্ছিন্ন ভাবে যাবে একজন কংগ্রেসী গুপ্তচর, যে কংগ্রেস অফিসে এসে খবর দেবে অগ্রগামীরা গ্রেপ্তার হল কিনা। যদি গ্রেপ্তার হয় তবে পরের দলকে তৈরি করবে।

ঠিক হল এই ছ জনের মধ্যে দু জন হবে বাঙালি হিন্দু, দু জন মাড়োয়ারি আর দু জন মুসলমান। হিন্দু দলের মাথা হবে হেমেন্দ্র-নাথ দাশগুপ্ত, মাড়োয়ারি দলের পদ্মরাজ জৈন আর মুসলমান দলের ওয়াহেদ হোসেন। আর সর্বদলের প্রধানকর্তা সুভাষচন্দ্র।

তেসরা ডিসেম্বর থেকে সুরু হয়েছে শোভাযাত্রা। যাত্রীদের কাজ শুধু খদ্দর বেচা নয়, দোকানদারদের মনে করিয়ে দেওয়া চব্বিশের হরতালের জন্যে তৈরি হোন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, কই কেউ গ্রেপ্তার হল না তো! সুভাষ তাই মনমরা। দেশবন্ধুর কাছে এসে নালিশ করল, 'একটা পুলিশও দেখা গেলনা রাস্তায়।'

'ব্যস্ত হয়োনা, দেখা দেবে।' দেশবন্ধু রসিক মানুষ, পরিহাস করলেন, 'এখন সবে লাঠিতে তেল মাখাচ্ছে।'

আবার পরদিন বেরুল শোভাযাত্রা। প্রথম দিন ছিল পাঁচ দল, আজ বেরুল দশ দল। দশ দলে ষাট জন।

'আজ কজন গ্রেপ্তার হল?' জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু।

'একজনও না।' সুভাষ বললে বিষণ্ণমুখে।

'ভেবোনা।' দেশবন্ধু আশ্বস্ত করলেন: 'সময় হয়ে এল বলে।'

পরদিনও একই হতাশা। আজও কাউকে গ্রেপ্তার করল না।

বাইরের ঘরে বসে আছেন দেশবন্ধু, ম্লানমুখে সুভাষ এসে ঢুকল। পরিহাসস্নিগ্ধ স্বরে দেশবন্ধু বললেন, 'এই যে আমাদের বিষণ্ণ ক্যাপটেন আসছেন। কী, খবর ভালো নয়?'

'একেবারেই না, স্যার। পুলিশ আজও কিছু করল না।'

খবর এসে পৌঁছুল লাহোরে লাজপত রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

দেশবন্ধু বাংলার তরুণদের আবার ডাক দিলেন। আমি এখন উন্মুক্ত আক্রমণ চাই। তোমরা কি এগিয়ে আসবে না? তোমাদের বন্দিনী মায়ের ডাকে সাড়া দেবে না? মায়ের বন্ধনের ভার লাঘব করবে না তোমরা? এত বিরাট শহর কলকাতা, তার মধ্যে মার মোটে পাঁচ হাজার সন্তান?

দেশবন্ধুর ছেলে চিররঞ্জন, ডাক নাম ভোম্বল, এগিয়ে এল। বললে, 'বাবা, আমি যাব।'

'তুমি, তুমি যাবে?' গৌরবে আনন্দে প্রদীপ্ত হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু।

'হ্যাঁ, আমি খদ্দর-ফিরির শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুব।' বললে চিররঞ্জন, 'দেখি আমাকে ধরে কিনা।'

'ঠিকই তো,' দেশবন্ধু বললেন তন্ময়ের মত, 'পরের ছেলেকে ডাকবার আগে নিজের ছেলেকেই পাঠানো উচিত। এবার পরের ছেলেকে ডাকতে আর আমার সঙ্কোচ থাকবে না। কণ্ঠস্বর অবাধ হতে পারবে।'

এ আপনি করছেন কী! চিরদিন সুখের কোলে লালিত প্রিয়তম পুত্রকে আপনি পাঠাচ্ছেন বিপদের মুখে? এতদিন পুলিশ কিছু

করেনি, আজ হয়তো করবে, ধরবে ভোম্বলকে। নিয়ে যাবে জেলে। কঠিন লাঞ্ছনার মধ্যে।

'নেবেই তো, নিক না, ঠেকাব কী করে?' অনুদ্বিগ্ন মুখে হাসলেন দেশবন্ধু: 'নিজের ছেলেকে বারণ করে পরের ছেলেকে ঠেলে দিতে পারব না। আপনি আচরি জীব পরেরে শিখায়।'

'তবু—'

'তা ভোম্বলকে বলে দেখ না।'

চিররঞ্জনকে কে রোখে! সে কাঁধে তুলে নিয়েছে খদ্দরের বোঝা। দক্ষিণ কলকাতা থেকে যোগ্য ভলানটিয়ার বেছে দিয়েছে সুভাষ।

দেশবন্ধু রাঁধুনে বামুনকে ডেকে বললেন, 'ভাতের সঙ্গে কাঁকর মেশাতে সুরু করে দাও।'

বামুন তো স্তম্ভিত।

'দুদিন বাদেই তো জেলের ভাত খেতে হবে,' দেশবন্ধু স্বভাব-সরস কণ্ঠে বললেন, 'এখন থেকেই অভ্যেস করে রাখা ভালো।'

চিররঞ্জনের দল, কলেজ স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের মোড়ে ফিরি করতে গিয়েছিল। বিকেলবেলা দেশবন্ধুর কাছে খবর এসে পৌঁছুল, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে, ভোম্বল ও আরো একুশজন স্বেচ্ছা-সেবক গ্রেপ্তার হয়েছে। 'বিষণ্ন ক্যাপটেনের' দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকালেন দেশবন্ধু।

সুভাষ প্রসন্ন মুখে বললে, 'এতক্ষণে ধড়ে প্রাণ এল।' বলেই কাগজ-কলম নিয়ে বসে গেল।

'কী করছ?'

'কালকের দিনের লিস্টি তৈরি করছি।'

'কাল? কাল তোমার মা যাবেন।'

'মা?'

'হ্যাঁ, বাসন্তী দেবী।'

সন্ধেয় সত্যেন মিত্র এল। হাইকোর্টের প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে

কংগ্রেসে ঢুকেছে। কংগ্রেসের একজিকিউটিভ কাউন্সিলে জাতীয় সেবা-বিভাগের ভার পেয়েছে। সঙ্গে হেমেন দাশগুপ্ত। কী ব্যাপার? লালবাজারে ভোম্বলের জন্যে খাবার নিয়ে যাব।

বাসন্তী দেবী এগিয়ে এলেন। বললেন, 'শুধু ভোম্বলের জন্যে নয়, আমার আরো একুশটি ছেলে তার সঙ্গে আছে, তাদের সবার জন্যে খাবার নিয়ে যান।'

রাত্রে পুলিশ সার্জেন্টরা চিররঞ্জনকে অবাধ্যতার ওজুহাতে প্রহার দিলে। কী করে কে জানে খবর বেরিয়ে এল বাইরে, আর রাষ্ট্র হয়ে গেল পুলিশি প্রহারের ফলে চিররঞ্জন মারা গেছে।

খবর পেয়ে নির্বিচল হয়ে রইলেন দেশবন্ধু। তাঁর পাশে নিষ্কম্প-শিখা বাসন্তী দেবী।

কিন্তু হেমপ্রভা মজুমদার চুপ করে থাকতে রাজি হলেন না। তিনি ছুটলেন আলিপুর জেলে।

হ্যাঁ, এক দিনেই বিচার সারা হয়ে গিয়েছে। অসহযোগী কংগ্রেসীদের বিচার করা তখন ভারি সোজা। তারা ব্রিটিশ-আদালত মানে না, বিচার-পদ্ধতির সঙ্গেও তাদের অসহযোগ, আত্মপক্ষ সমর্থনেও তাদের হাঁ-না কোনো বক্তব্য নেই। পুলিশেরও হায়রানি কমে গেল, শুধু ধরো আর একবার আদালতে দাঁড় করিয়েই জেলে ঠেলে দাও।

চিররঞ্জনও তেমনি আলিপুর জেলে এসে উঠেছে।

হেমপ্রভা দেবী জেলফটকে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, চির-রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।

জেলর তাঁকে পাত্তাই দিতে চাইল না। এমন কোনো আইন নেই আপনি দেখা করতে পারেন।

আইনের কথা ছাড়ুন। আমি দেখা করবই করব। শুনুন, জেলের বাইরে হাজার হাজার মানুষ তীব্র আগ্রহে অপেক্ষা করছে। যদি আমাকে দেখা করতে না দেন তারা ঠিক ধরে নেবে চিররঞ্জন

মারা গেছে, তা হলে সারা কলকাতায় আগুন জ্বলে উঠবে, সে আগুনে আপনারা সবাই পুড়ে মরবেন। বরং আমি দেখা করতে পারলেই সকলকে আশ্বস্ত করতে পারব, চিররঞ্জন ভালো আছে।

জেলকর্তৃপক্ষ কী ভেবে অনুমতি দিল। হেমপ্রভা দেবী দেখা করে এসে দেশবন্ধুকে জানালেন কী নির্মমভাবে চিররঞ্জনকে ওরা মেরেছে।

দেশবন্ধু স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু বাসন্তী দেবী স্তব্ধ থাকতে পারলেন না। বললেন, 'কাল আমি যাব।'

পর দিন, আটুই ডিসেম্বর, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী নিয়ে বেরুলেন বাসন্তী দেবী। সঙ্গে দেশবন্ধুর বোন উর্মিলা দেবী আর নারী-কর্মমন্দিরের সম্পাদিকা সুনীতি দেবী। বার্তাবহরূপে সুভাষের বন্ধু, হেমন্ত সরকার, কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢুকেছে কংগ্রেসে।

তাঁরা চলেছেন বড়বাজারের দিকে। উদ্দেশ্য খদ্দর বিক্রি করবেন আর ঘোষণা করবেন, চব্বিশে ডিসেম্বর হরতাল।

'আপনারা কী করছেন জিজ্ঞেস করতে পারি?' পুলিশ সার্জেণ্ট পথরোধ করে দাঁড়াল।

'খদ্দর বিক্রি করছি আর সবাইকে বলছি চব্বিশে ডিসেম্বর যেন হরতাল পালন করে।' বললেন বাসন্তী দেবী।

'আপনি দয়া করে একবার থানায় যাবেন?'

'কেন যাবনা? নিশ্চয়ই যাব।'

থানায় এলে সার্জেণ্ট বললে, 'আপনাদের গ্রেপ্তার করা হল।'

'খুব ভালো কথা।'

হেমন্ত বার্তাবহের ভূমিকায় দূরে দূরে থাকতে পারল না। সেও আসামী হয়ে গেল।

তাই বলে খবর ছড়িয়ে পড়তে দেরি হল না। রাগে দুঃখে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল কলকাতা। ছেলে-বুড়ো হিন্দু-মুসলমান দলে দলে ভিড় করতে লাগল থানায়। আমাকে ধরো, আমাকে জেলে নিয়ে যাও। আমিও কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক। আমিও উচ্চস্বরে ঘোষণা

করছি, হরতাল, হরতাল, সকলে চব্বিশে ডিসেম্বর হরতাল পালন করুন।

কোথা থেকে যেন এক ভাগবতী শক্তির স্পর্শ লাগল, চকিতে মরা প্রাণ বিদ্যুৎস্পন্দিত হয়ে উঠল। শুষ্ককাষ্ঠে জাগল নবমঞ্জরী।

সেদিন সন্ধ্যায় গভর্নরের বাড়ির ডিনারে সুরেন মল্লিক উপস্থিত ছিলেন, খবর এসে পৌঁছুল বাসন্তী দেবী গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাজনীতিতে উদারপন্থী, গভর্নমেণ্টের অনুরাগী হলেও এতটা যেন সহ্য হল না, প্রতিবাদে ভোজসভা ত্যাগ করে বেরিয়ে গেলেন সুরেন মল্লিক।

কয়েদির গাড়িতে করে বাসন্তী দেবীকে প্রেসিডেন্সি জেলে নিয়ে যাবে, পুলিশ কনস্টেবলরা বললে, আমরা আজই চাকরি ছেড়ে দেব।

গভর্নমেণ্ট তক্ষুনি কনস্টেবলদের মাইনে বাড়িয়ে দিলে।

সেই তো ব্রিটিশ চাতুরী। শাসিত দেশকে দারিদ্র্যে নিমজ্জিত করে রাখো। দেশকে দুঃসহ দুরবস্থায় না রাখলে অত অল্প মাইনেয় সৈন্য পাবে কী করে, পুলিশ পাবে কী করে? দেশ যদি সচ্ছল থাকে তবে সামান্য মাইনেয় ওরা ওসব কাজে রাজি হবে কেন? নিদারুণ দরিদ্র বলেই না হবে! তাই শাসন করবার জন্যে সুবিধেমত লোক পাবার উদ্দেশ্যেই দেশকে শোষণ করা, শুষে-শুষে নিঃসার করে দেওয়া, যাতে অনায়াসেই ইংরেজের স্বার্থে দাসত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব হয়।

ব্যারিস্টার বিজয় চাটুজ্জে, বি-সি চ্যাটার্জি, সম্পর্কে বাসন্তী দেবীর ভাই। কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে গেল লালবাজার। জামিনে বাসন্তী দেবীকে ছাড়িয়ে আনতে চাইল। তোমাকে কে এখানে আসতে বলেছে? বাসন্তী দেবী জামিনের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে দিলেন। জেলে নিয়ে চলেছে, জেলে যাব।

বিজয় সটান বাংলার লাট লর্ড রোনালডসের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলে। বাসন্তী দেবী ও তাঁর সঙ্গীদের মুক্তির জন্যে প্রার্থনা জানাল। রোনালডসে ভেবে-চিন্তে বললে, আচ্ছা, তাই হবে।

আনন্দ-উজ্জ্বল মুখে বিজয় চিত্তরঞ্জনকে বললে, 'যাক, ভাবনা নেই, সব ব্যবস্থা করে এসেছি।'

'কিসের ব্যবস্থা ?'

'গভর্নরের সঙ্গে দেখা করেছি। কথা দিয়েছে বাসন্তীকে ছেড়ে দেবে।'

চিত্তরঞ্জন একমুহূর্ত হতবাক হয়ে রইলেন। পরমুহূর্তেই গর্জে উঠলেন : 'কে তোমাকে গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতে বলেছে ?'

'কে আবার বলবে!' বিজয় পাংশু হয়ে গেল : 'আমি নিজের দায়িত্বে গিয়েছি।'

'বাসন্তীর জন্যে মুক্তি চাইতে ? ছি ছি ছি,' আহত স্বরে চিত্তরঞ্জন আবার গর্জন করলেন : 'তুমি আমার সমস্ত রণকৌশল মাটি করে দিলে : কী দরকার ছিল তোমার সর্দারি করবার!'

'বাসন্তী আমার বোন।' বিজয় বললে গম্ভীর মুখে, 'সে জেলে যাবে এ অপমান আমার কাছে অসহ্য।'

'অপমান ?' চিত্তরঞ্জন হুমকে উঠলেন : 'দেশের জন্যে তোমার বোন জেলে যাবে সেটা তোমার অপমান ?'

বিজয় চুপ করে রইল।

'কিন্তু বাসন্তী যদি তোমার বোন না হয়ে আর কারু বোন হত তা হলে সেটা অপমান মনে হত না, কী বলো, তাই না ?'

মাঝরাতে জেলর বাসন্তী দেবীকে বললেন, 'আপনারা খালাস। বাড়ি চলে যান।'

'সে কী, বাড়ি যাব কী!' বাসন্তী দেবী বিমর্ষ হয়ে গেলেন : 'বাড়ি যাবার জন্যে জেলে এসেছি নাকি ? না, না, আমরা কেউ বাড়ি যাব না, এখানেই থাকব।'

জেলর সসম্ভ্রমে বললে, 'খালাস হবার পর আসামীকে জেলে রাখবার নিয়ম নেই। সুতরাং জেলে আর আপনাদের স্থান হতে পারে না।'

অগত্যা বাড়ি ফিরে আসতে হল হতাশ হয়ে।

না, হতাশ হবার কিছু নেই। পর দিন বাসন্তী দেবী আবার খদ্দর ফিরি করতে বেরুলেন।

সেদিন আর তাঁকে ধরল না। তার মানে ধরতে সাহস পেল না।

কী করে সাহস পাবে? ত্রিপথগা গঙ্গা জনজলতরঙ্গে উত্তাল হয়ে উঠেছে। কলকাতার ছুই জাঁদরেল জেলখানা ভলানটিয়ারে ভরে উঠেছে। কত ধরবে, কত পুরবে? কয়েদি ক্যাম্প খুলেছে, তাও উপচে গেল। প্রমাদ গুনল গভর্নমেণ্ট।

কত ধরবে, কত পুরবে! শীতের হাওয়ায় লেগেছে বাসন্তী স্পর্শ।

মহারাজ প্রদ্যোত ঠাকুরের মারফত রোনালডসে চিত্তরঞ্জনকে সাক্ষাৎকারের জন্যে আমন্ত্রণ করে পাঠাল। চব্বিশে ডিসেম্বর যুবরাজ কলকাতায় পৌঁছুচ্ছে, সারা শহর শ্রীহীন বেশবাসে তার সামনে এসে দাঁড়াবে, সেটা তো মুখে কালি মাখার সমান। আলোয়-বাজিতে উজ্জ্বল-মুখর না হলে লাটসাহেবকে দেশের লোক কী বলবে!

চিত্তরঞ্জন গেলেন দেখা করতে কিন্তু আন্দোলন প্রত্যাহার করতে রাজি হলেন না।

ফল কী হল?

দশুই ডিসেম্বর চিত্তরঞ্জন গ্রেপ্তার হলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেনাপতি, তাঁর দক্ষিণহস্ত, সুভাষকেও পুলিশে ধরল। ধরল বীরেন শাসমলকে, আকরাম খাঁকে, আবুল কালাম আজাদকে, পদ্মরাজকে।

চিত্তরঞ্জন আগেই বুঝেছিলেন তাঁর বাইরে থাকার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাঁর অবর্তমানে কে এই আন্দোলনের নিয়ামক হবে, কে বা সম্পাদক? তিনি নির্দেশনামা জারি করলেন। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী নিয়ামক আর সাতকড়িপতি রায় সম্পাদক। এখন থেকে সংগ্রামের চালক-নায়ক তারা। তারা গেলে তাদের জায়গায় আবার ছুজন।

হাওয়ায়-হাওয়ায় খবর ছড়িয়ে পড়ল, দাশ-সাহেবকে ধরেছে। জনতা জমে গিয়েছে গেটের সামনে, রাস্তায়, এমন কি অঙ্গনের

মধ্যে। সবাই তাদের মনোরঞ্জনকে দেখবার জন্যে উৎসুক, সর্বত্যাগ-শুভ্র সন্ন্যাসীকে। পুলিশের গাড়িতে ওঠবার আগে চিত্তরঞ্জন জনতার দিকে তাকালেন, তাদের সম্বোধন করে বললেন, 'জীবনে স্বাধীনতার মত মহত্তম আর কী আছে? আমাদের উদ্দেশ্য যখন মহত্তম তখন সিদ্ধি হবেই, এ ধ্রুবতম সত্য। যে আগুন জ্বলেছে তার নির্বাপণ নেই। ফল শুধু ঈশ্বরের হাতে। তোমরা তোমাদের সমস্ত কর্মে অহিংস হও, সাফল্য অনিবার্য। যদি দুঃখে কষ্টে নির্যাতনভোগে স্বীকৃত থাকো, কে তোমাদের প্রাপ্য ধন থেকে বঞ্চিত করে?'

পুলিশের গাড়িতে উঠছেন, দিকে-দিকে শাঁখ বেজে উঠল, উঠল হুলুধ্বনি। আর জনসমুদ্র তুলল রণহুঙ্কার: বন্দেমাতরম।

তিন

দিনের কাজ সেরে সুভাষ বাড়ি ফিরে শুনল পুলিশ তার খোঁজ করে গেছে।

'আপনারা আমাকে খুঁজছেন?' লালবাজারে ফোন করল সুভাষ।

'হ্যাঁ, আপনি এখন কোথায়?' পুলিশ কমিশনার জিজ্ঞেস করল।

'বাড়িতে। কি, এরেস্ট করবেন? আসুন। আমি তৈরি।' স্থিতধী সুভাষ বললে নিষ্কম্প কণ্ঠে।

পুলিশ এসে সুভাষকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল।

'কোথায় নিয়ে যাবেন?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

'আপাতত প্রেসিডেন্সি জেলে।' পুলিশের কর্তা বললে গর্বিতের মত।

'সেখানে দেশবন্ধু আছেন?'

'আছে।'

'আর হেমন্তও আছে?'

'কে হেমন্ত?'

'হেমন্ত সরকার। প্রোফেসর ছিল, চাকরি ছেড়ে দিয়েছে।'

'আছে।' পুলিশের কর্তা বললে সংক্ষেপে।

'তবে আর কী!' আনন্দিত মুখ করল সুভাষ।

জেলে সুভাষ দেশবন্ধুর বাবুর্চি হল আর হেমন্ত হল খিদমতগার।

একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর স্যার আবদুর রহিম চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। এসে বললে, 'দাস, তুমি ভারি দামি কয়েদি। একজন আই-সি-এস তোমার বাবুর্চি, আর একজন প্রোফেসর তোমার চাকর।'

'যেহেতু আমি খুব দামি কয়েদি।' চিত্তরঞ্জন বললেন গম্ভীরস্বরে।

সেই কবে দশুই ডিসেম্বর সুভাষকে গ্রেপ্তার করেছে, কিন্তু তার বিচার হতে হতে সাতুই ফেব্রুয়ারি। যদিও পুলিশের এটা জানা যে আসামী মামলা লড়বে না—লড়বে না কী, হাঁ-না কিছুই বলবে না, বিচারে কোনোই অংশ নেবে না। তবু যত দূর পারো ঝুলিয়ে রাখো। দণ্ড দিলেই তো শেষ হয়ে যাবে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে আবার গোলমাল পাকাবে। তাই যত পারো দীর্ঘ করো হাজতবাস।

সুভাষ কাঠগড়ায় মৌনাবলম্বন করে রইল। দোষী না নির্দোষ, টুঁ শব্দও করল না। জেরা করল না, সাফাই দিল না। ব্রিটিশ আদালতকে মানি না। গায়ের জোরে পরের দেশের দলিত বুকের উপর সিংহাসন চাপিয়ে বসেছে শাসক হয়ে, তার নীতিই বা কী, ন্যায়ই বা কোথায়?

ম্যাজিস্ট্রেট সুইনহো সুভাষকে লক্ষ্য করে বললে, 'অন্যায়ভাবে স্বেচ্ছাসেবকদল গঠন করবার অপরাধে তোমার ছমাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হল।'

'মোটে ছমাস?' সুভাষ যেন হতাশের সুরে বললে।

বক্রোক্তির মতন লাগল সুইনহোর কানে। সে ক্রুদ্ধকণ্ঠে উপস্থিত সার্জেন্টকে বললে, 'ডক থেকে একে নামিয়ে নিয়ে যাও।'

সুভাষ এ কথাই বলতে চেয়েছিল, দেশের জন্য ঐটুকু ক্লেশ কী, আরো কত কঠোর দুঃখসহনে সে প্রস্তুত।

দেশবন্ধুরও ছমাস।

অথচ যেদিন তাঁকে কোর্টে, ব্যাঙ্কশাল কোর্টে আসামী করে আনা হল, সেদিন কী প্রচণ্ড ভিড়! ম্যাজিস্ট্রেটকে কে দেখে, সবাই দেখছে আসামীকে। এ এক অদ্ভুত আসামী! কত আসামীকে তিনি কাঠগড়ার কলঙ্ক থেকে খালাস করে এনেছেন, আজ তিনি নিজেই কাঠগড়ায়। আর কলঙ্ক কোথায়? দেশমাতার মুক্তির জন্যে তিনি আজ জেলে যাচ্ছেন, সেটা তো তাঁর পবিত্রতম গৌরব, প্রদীপ্ততম সম্মান।

জনতার আয়তন দেখে ম্যাজিস্ট্রেট ভড়কে গেল। মামলা বিশে জানুয়ারি পর্যন্ত মুলতুবি রাখল। সঙ্গে সঙ্গে অর্ডার দিল জেলে বিচার হবে যেহেতু খোলা আদালতে উচ্ছৃঙ্খল জনসমাবেশ বিপজ্জনক।

বিশে জানুয়ারি জেলের বিচারকক্ষে দেশবন্ধু এসে দেখলেন ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া আর কেউ নেই। বাইরের মানুষ তো কেউ নেইই, প্রেস-রিপোর্টার নেই, এমন কি উকিল পর্যন্ত নেই। আসামী বিচারে অংশ নেবে না বলে তার পক্ষে উকিল উপস্থিত থাকতে পারবে না এমন কী কথা। আসামী যদি নীরব থাকতে পারে, তার উকিলও নীরব থাকবে। বিচারপদ্ধতিটা তাদের পর্যবেক্ষণ করতে দোষ কী!

অনেক ধস্তাধস্তির পর ব্যারিস্টার নিশীথ সেনকে ঢুকতে দেওয়া হল।

সেদিন শুধু চার্জ রচিত হল, দিন পড়ল সাতুই ফেব্রুয়ারি।

মাঝখানে জ্বর হল চিত্তরঞ্জনের। একে তো জেলের খাওয়া, লোহার থালায় করে লাল মোটা চালের ভাত, আর কালো কলাইয়ের ডাল, তার উপরে ইনফ্লুয়েঞ্জা, চিত্তরঞ্জন দুর্বল ও শীর্ণ হয়ে গেলেন। সাতুই ফেব্রুয়ারি খোলা আদালতে তাঁরও বিচার হল।

প্রথম থেকেই চিত্তরঞ্জন চুপ। যেদিন চার্জ তৈরি হয় সেদিনও ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল: দোষী, না, নির্দোষ?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

আজও ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞেস করল: সাক্ষীকে জেরা করবেন?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

কোনো সাফাই সাক্ষ্য দেবেন?

চিত্তরঞ্জন চুপ।

এবার বলুন আপনার কী বক্তব্য? দেবেন কোনো বিবৃতি? ম্যাজিস্ট্রেট ভুরু কুঁচকোলো।

মুখ খুললেন না চিত্তরঞ্জন।

আর্গুমেণ্ট করবেন?

মুখ ফিরিয়ে রইলেন চিত্তরঞ্জন।

ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই সুইনহো, আবার রায় দিল। আপনি চার্জ অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। আপনার ছ মাস সশ্রম কারাভোগের আদেশ হল।

এবারও চিত্তরঞ্জন চুপ।

আদালত-ভর্তি লোকের চোখ আর্দ্র হয়ে এল। কিন্তু দেশবন্ধু এতটুকু স্খলিত হলেন না। স্বর্ণমেরুর মত বিশাল ছন্দে দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এখন কোথায় যাব?' শুধু জিজ্ঞেস করলেন সার্জেন্টকে।

'আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে।'

'সুভাষ কোথায়?'

'সেখানে।'

'চিররঞ্জন কোথায়?'

'সেও সেখানে।'

তৃপ্তির হাসি হাসলেন দেশবন্ধু। চলুন নিয়ে চলুন। কানাইলালের ফাঁসির জায়গাটা দেখে আসি।

জেলে প্রথম যখন দেখা করতে এলেন, বাসন্তী দেবীকে গরাদের বাইরে দাঁড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে দেওয়া হল। দেশবন্ধু বললেন, এরকম ভাবে দেখা করতে হলে সাক্ষাৎকারের অনুমতি চেয়ে দরকার নেই।

আর গেলেন না বাসন্তী দেবী।

পরে জেলকর্তাদের কী সুমতি হল, বাসন্তী দেবীকে জানালেন জেলের অফিস-ঘরে বসে সাক্ষাৎকার হতে পারে।

সেদিন তাই হচ্ছে। হঠাৎ মাতব্বর পুলিশ-অফিসর বাসন্তী দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কথা একটু জোরে-জোরে বলুন যাতে আমরা শুনতে পাই।'

'এ কী অন্যায় কথা!' বাসন্তী দেবী ঝলসে উঠলেন।

দেশবন্ধু বললেন, 'এর চেয়ে একেবারে দেখা করতে না আসাই ভালো। তুমি আর এসো না।'

এমনি করেই ওরা ওদের রাজ্য রাখবে! সূর্য আর নিজে কবে মেরেছে, বাতাস আর বালি তাতিয়েই মেরেছে। কে না জানে সূর্যের চেয়ে বালির তাত বেশি।

জ্বরের পর দেশবন্ধুর শরীর দুর্বল, অফিস-ঘরে এসে দেখা দিতে হলে সেল থেকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয়, সেটাও প্রাণে বাজে বাসন্তী দেবীর। বললেন, 'যদি সেলে গিয়ে দেখা করতে দেয় তবেই যাব, নইলে ওঁকে হাঁটিয়ে এনে কষ্ট দিতে পারব না।'

গভর্নরের কানে উঠল বোধহয় কথাটা। বাসন্তী দেবীকে সেলে গিয়ে দেখা করবার অনুমতি দিল। তার সঙ্গে আরো একটু বদান্যতা দেখিয়ে বললে, ইচ্ছে করলে মিস্টার দাসের খাবার বাড়ি থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে।

দেশবন্ধু রাজি হলেন না। নিজে একা বাড়ি থেকে খাবার আনিয়ে খাবেন এ অসম্ভব। 'তবে', হাসিমুখে বললেন বাসন্তী দেবীকে, 'তবে এদের সকলের জন্যে আনতে পারো, সকলে মিলে খেতে পারি একসঙ্গে।'

সকল বলতে সুভাষ, হেমন্ত, হেমেন্দ্র, কিরণশঙ্কর, সুকুমার, বীরেন্দ্র আর ভোম্বল।

বাসন্তী দেবী সানন্দে রাজি হলেন। তাই আনব।

মাতব্বর জেলর আপত্তি করল। সকলের জন্যে আনা চলবে না। শুধু মিস্টার দাসের জন্যেই বিশেষ অনুমতি আছে।

'তাহলে দরকার নেই। উনি একা একা খাবেন না কখনো।'

কদিন পরে এই ভেদনীতিটা শিথিল হল। বাসন্তী দেবী সবার জন্যেই খাবার আনতে লাগলেন।

আনন্দ করে খাচ্ছেন বটে সকলে কিন্তু এর আগে একটা বিরাট কাণ্ড ঘটে গেছে যেটা দেশবন্ধুর কাছে এক বিরাট আশাভঙ্গের

বেদনা ছাড়া কিছু নয়। শুধু দেশবন্ধুর কাছে নয়, সুভাষেরও কাছে।

চব্বিশে ডিসেম্বর যুবরাজ আসছে, তার সপ্তাহখানেক আগে বড়লাট লর্ড রেডিং কলকাতায় এসে পৌঁছুল। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মিটমাট করা যায় কিনা যাতে চব্বিশে ডিসেম্বরটা অ-হরতালে কাটে।

কার সঙ্গে কথা বলবে? যাঁর সঙ্গে কথা বলবে সে জননায়ক তো তাঁর সেনাপতি-সহ তোমাদের কারাগারে বন্দী।

আর ব্রিটিশের যে-বিচারে তিনি বন্দী তার বহরটাও একবার বিচার করো।

তিনটে কংগ্রেসী ইস্তাহারে স্বহস্তে দস্তখৎ করেছেন, চিত্তরঞ্জনের বিরুদ্ধে এই ছিল অভিযোগ। সরকার হস্তলিপি-বিশারদকে নিয়ে এসেছে, সে দস্তখৎ পরীক্ষা করে হলফ নিয়ে সাক্ষ্য দিল, হ্যাঁ, ইস্তাহারের সই চিত্তরঞ্জনের নিজের হাতের। অথচ চিত্তরঞ্জন নিজের হাতে কোনো ইস্তাহারই সই করেননি। ধন্য বিশারদ, ধন্য তার এক্সপার্ট ওপিনিয়ন, তার বিজ্ঞানভিত্তিক সিদ্ধান্ত। বিচারে কোনো অংশ নেবেন না বা আত্মপক্ষসমর্থনে কোনো সওয়াল করবেন না কংগ্রেসের এই নীতি বলে চিত্তরঞ্জন স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু বিচার সারা হয়ে যাবার পর, তিনি আদালতে দাঁড়িয়েই ঘোষণা করলেন, এ বিচার আদ্যন্ত এক প্রহসন। আমাকে যে গ্রেপ্তার করল তার ওয়ারেণ্ট ছিল না আর যে দস্তখতের ভিত্তিতে আমি অপরাধী প্রমাণিত হলাম সে দস্তখত আমার নয়। কাজে কাজেই বোঝা যাচ্ছে সরকার যদি ইচ্ছে করে তা হলে ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়ে যে কোনো ব্যক্তিকে সে জেলে পাঠাতে পারে, ঝোলাতে পারে ফাঁসি-কাঠে। আইন আর আদালত শুধু একটা ধোঁকা, ধোঁকার টাটি। সরকারই অন্ধ, অবিবেকী।

'ওখানটায় কানাইলালের ফাঁসি হয়েছিল না?' চিত্তরঞ্জনের

সেল থেকে দেখা যায় জায়গাটা। কখনো-কখনো উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকেন সেদিকে। দেখেন সুভাষ কখন কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। চিত্তরঞ্জনের চোখে জল কিন্তু সুভাষের চোখে জ্বালা।

পাথরে ঘুন ধরেনা। সুভাষের সঙ্কল্পেও এতটুকু চিড় নেই।

লর্ড রেডিং কী করল ?

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে দূত করে পাঠাল চিত্তরঞ্জনের কাছে।

মীমাংসার সর্ত কী ?

কংগ্রেস তার আইন-অমান্য আন্দোলন তুলে নেবে আর চব্বিশে ডিসেম্বর কলকাতায় হরতাল হবে না এবং তার বিনিময়ে কংগ্রেস ভলানটিয়র বেআইনি বলে যে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল তা প্রত্যাহৃত হবে আর তার ভিত্তিতে হাজার-হাজার যারা জেলে গেছে সব ছাড়া পাবে।

'শুধু এইটুকু ?' সুভাষ রুখে উঠল।

না, আরো আছে। আর সেইটেই দামি। শিগগিরই গভর্নমেণ্ট এক রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স বসাবে যাতে থাকবে সরকারের আর কংগ্রেসের বাছাই-করা প্রতিনিধি, তাঁরা একত্র বসে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান নির্ণয় করবেন।

'শুধু এইটুকু ?' সুভাষ আবার ফুঁসে উঠল : 'শুধু এইটুকুর বিনিময়ে আমরা আমাদের রণোদ্যম পণ্ড করে দেব ?'

'আমার তো মনে হয় এইটুকু অনেকখানি।' দেশবন্ধু প্রশান্ত-স্বরে বললেন, 'মহাত্মাজী দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবেন। আর কদিন পরেই সেই এক বছর শেষ হয়ে যাবে। মহাত্মার সেই কথার সম্মান কী করে রাখা যাবে ? যদি একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত ভলানটিয়ার আমরা জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতে পারি তা হলে দেশবাসীর কাছে কংগ্রেসের শক্তি ও মর্যাদা আরো বেশি করে প্রতিষ্ঠা পাবে।'

'কিন্তু ঐ রাউণ্ডটেবল কনফারেন্স ?'

'সেটায় কাজ হতেও পারে নাও হতে পারে। যদি কনফারেন্সে বেশ বেশি কিছু না পাওয়া যায় তাহলে আমাদের আন্দোলন তো আছেই।'

'হ্যাঁ, আমি আন্দোলন বুঝি, আপোস বুঝিনা। সভা করে স্বাধীনতায় আমি বিশ্বাসী নই।'

'কিন্তু এ সভায়ও যদি আমরা নিষ্ফল হই, তবে আমরা ব্রিটিশ ভণ্ডামি প্রমাণিত করে দেশবাসীকে আরো উদ্বুদ্ধ করতে পারব। সুতরাং', দেশবন্ধু বললেন, 'রেডিংএর প্রস্তাবে রাজি হওয়াই সমীচীন হবে।'

দেশবন্ধুর যুক্তির মধ্যে শক্তি আছে বুদ্ধি আছে। সুভাষ সম্মত হল। আবুল কালাম আজাদও সমর্থন করলে।

এখন তবে সবরমতিতে মহাত্মাকে জানানো হোক তার করে।

মহাত্মার কাছে দীর্ঘ তার গেল। দয়া করে সম্মতি দিন। এমন সুবর্ণসুযোগ আর আসবে না।

মহাত্মাজি পালটা তার করে জানালেন, ঐ সঙ্গে দুই আলি-ভাই আর তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদেরও ছেড়ে দেওয়া হোক। শুধু আইন-অমান্যকারী ভলানটিয়ারদের ছাড়িয়ে এনে কী হবে?

গান্ধির প্রস্তাবে লর্ড রেডিং সম্মত হল না। সে বললে, আলি-ভাইদের অপরাধ অন্য জাতের, তারা তাদের নির্দিষ্ট দিনেই ছাড়া পাবে, তবে এ পর্যন্ত বলতে পারি তাদেরকে অন্য আইনের আওতায় এনে আটক রাখা হবে না। তাদের চেলাচামুণ্ডাদের সম্পর্কেও সেই কথা।

গান্ধি আরো বললেন, কনফারেন্স কবে হবে ও কারা কারা বসবে গোল হয়ে তাও জেনে নাও।

সে সম্বন্ধে একটা আভাসও দেওয়া হল তাঁকে। তবু তিনি সম্পূর্ণ স্বচ্ছ হবার আশায় বেশি সময় নিয়ে ফেললেন। লোহা গরম থাকতে থাকতে হাতুড়ির ঘা মারতে পারলেন না।

তারপর তিনি সম্মত হলেন। কিন্তু তাঁর সম্মতি যখন এসে পৌঁছুল তখন লর্ড রেডিং কলকাতা ত্যাগ করে দিল্লি চলে গিয়েছে আর যুবরাজ এসে দাঁড়িয়েছে হরতালের মুখোমুখি।

রৌদ্রময়ী অমানিশা কী সুন্দর! কী সুন্দর শ্মশানায়িত শূন্যতা!

হরতালের সাফল্যে খুশি হলেন দেশবন্ধু। কিন্তু মহাত্মার গড়িমসির জন্যে একটা অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হল এই অনুভবে কাতর হয়ে রইলেন।

তার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভলনটিয়ররা তার গঠনশক্তির মান রেখেছে এই ভেবে সুভাষও কিঞ্চিৎ উৎফুল্ল কিন্তু দেশবন্ধুর বিমর্ষতা তাকেও স্পর্শ করল। মহাত্মাজি ভুল করেছেন, নিদারুণ ভুল করেছেন, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীরই সেই এক ধারণা। কখনো কখনো দেরি করাও ভুল করা।

কিন্তু, না, যা যাবার তা গিয়েছে। হারানো খেই আবার খুঁজে নিতে হবে। কিছুতেই অবসন্ন হওয়া নয়।

উনিশশো একুশের কংগ্রেস আমেদাবাদে, আর এবারের সভাপতি দেশবন্ধু। কিন্তু তিনি যখন জেলে তখন তাঁর স্থলে আর কাউকে অভিষিক্ত করতে হয়। হাকিম আজমল খান সেই পদে নির্বাচিত হলেন।

দেশবন্ধুর ভাষণ—অর্ধসমাপ্ত ভাষণ—সরোজিনী নাইডু পড়লে। সে ভাষণ ভাবে কী মহৎ, যুক্তিতে কী বাস্তবদৃঢ়, তা বোঝা গেল সরোজিনী নাইডুর মধুর কণ্ঠস্বরে, প্রদীপ্ত উচ্চারণে। ভাবে গভীর অর্থে স্পষ্ট আবেদনে তীক্ষ্ণ—এ হলেই তো ভাষণ হৃদয়কে জাগায়, বুদ্ধিকে জাগায়, দুই হাতকে কর্মে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

সরোজিনী নাইডুর কণ্ঠে সোনালি আলোর ঝরনা ছড়িয়ে পড়ল।

'আগেই অতিথি নয়, আগে গৃহ। গৃহই তৈরি নেই, অতিথিকে অভ্যর্থনা করব কোথায়? আগে ভারতীয় সংস্কৃতি আবিষ্কার করো, পরে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি পরিপাক করা যাবে।'

তারপরে :

'গভর্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া য়্যাক্টের সঙ্গে যে সহযোগিতা করব, তাতে কোথাও বলা আছে যে ভারতবর্ষকে ইংলণ্ড তার সাম্রাজ্যের সমান অংশীদার বলে স্বীকার করবে? দেবে আমাদের সমান সম্মানের অধিকার? আমি ইংলণ্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারি শুধু একটিমাত্র সর্তে। সেই সর্ত আর কিছু নয়, একটি মাত্র স্বীকৃতি, ইংলণ্ডের স্বীকৃতি। ইংলণ্ড স্বীকার করুক, ভারতবর্ষের আছে স্বাধীন হবার অধিকার, তার জন্মার্জিত স্বত্ব। আমরা আমাদের কাজকর্ম চালাব, আমাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করব, আমাদের ভাগ্য-বিধাতাও আমরা। শুধু এইটুকু স্বীকৃতিতেই আমি সহযোগী। নচেৎ নয়। যতদিন আন্তরিকতার সুরে এই স্বীকৃতি না উচ্চারিত হবে ততদিন আমার কাছে শান্তির কথা বোলো না, আপোসের কথা বোলো না। ততদিন আমার সংগ্রামে ক্ষান্তি নেই, নিবৃত্তি নেই।'

এ বুঝি সুভাষেরও মর্মকথা।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে সমস্ত দেশকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আইন-অমান্য আন্দোলনে আহ্বান করা হল। সশস্ত্র বিদ্রোহের সভ্যতম বিকল্পই আইন-অমান্য। তাছাড়া এই নিষ্ঠুর দায়িত্ববোধহীন অত্যাচারী শত্রু-সরকারকে উৎখাত করবার আর কোনো শোভনতর উপায় নেই। একমাত্র ত্যাগ ও দুঃখভোগের পথই প্রতিকারের পথ।

প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবককে নিম্নলিখিত শপথ গ্রহণ করতে হল :

'ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি সসম্ভ্রমে ঘোষণা করছি, আমি জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সৈন্য হব, আমি কথায় ও কর্মে অহিংস হব এবং অন্তরেও এই অহিংসা লালন করব। আমি বিশ্বাস করব, বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে অহিংসাই একমাত্র অস্ত্র আর এই অস্ত্র-বলেই স্বরাজ অর্জন করা যাবে। আমি স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আমার উপরিস্থ নেতার সর্ববিধ আদেশ পালন করব। আমি হাসিমুখে আমার ধর্মের জন্যে আমার দেশের জন্যে কারাবরণ প্রহার এমন কি

মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করব। যদি আমাকে জেলে যেতে হয় আমি আমার পরিবার-পরিজনদের খোরপোষের জন্যে কংগ্রেসের কাছে হাত পাতবো না।'

এই কংগ্রেসেই স্বরাজের নতুন সংজ্ঞা দিলেন হজরৎ মোহানি। সে সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা। এতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বয়ংকর্তৃত্বই কামনা করা হয়েছে, এবার একটা নতুন সুর এসে লাগল, ব্রিটিশের বা বিদেশের সম্পর্কের বাইরে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বাধীন দেশ। কিন্তু মহাত্মা এ ভাবটাকে তক্ষুনি প্রশ্রয় দিতে পারলেন না। বললেন, 'আমাদের জলের গভীরতার পরিমাপ আগে করা হোক, তারপর যেন দলবল নিয়ে সেই জলে নামি। অজানা জলে নেমে অতলে তলিয়ে যাবার মধ্যে মহত্ত্ব নেই।'

স্বাধীনতা তাই স্বপ্নের সামগ্রী হয়েই থাকল, কাগজে-কলমে লিপিবদ্ধ হল না।

'হ্যাঁ, সামগ্রিক ডমিনিয়ন স্টেটাসই আমি চাই।' স্পষ্ট হলেন গান্ধিজি : 'তা যদি পাই, আমি বলছি আমি আমার শবরমতি আশ্রমে ইউনিয়ন জ্যাক ওড়াব।'

উনিশশো একুশের একত্রিশ ডিসেম্বরের রাত্রিও প্রভাত হল। কিন্তু সেই প্রার্থিত, প্রতীক্ষিত স্বরাজের দেখা নেই।

চার

স্বরাজ কি ঠুনকো জিনিস, শিশুর খেলনা? চাইলেই, শুধু হৈ-চৈ করলেই কি পাওয়া যায়?

স্বরাজ না আসুক এই এক বছরে দেশ অনেক এগিয়েছে, অনেক জেগেছে, অনেক শক্ত হয়েছে। আর সন্দেহ কী, এই গঙ্গাবতরণের ভগীরথ মহাত্মা গান্ধি।

তিনিই ঘুম-ভাঙানিয়া বাঁশিওয়ালা। কিন্তু শুধু বাঁশিতেই কি হবে? অসি লাগবেনা?

উনিশশো বাইশের পয়লা ফেব্রুয়ারি তিনি বড়লাটকে চিঠি লিখলেন। তার নির্যাস হচ্ছে এই: 'গত নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লিতে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি ঠিক করেছিল বরদৌলিতে প্রথম গণ-অমান্য-আন্দোলন সুরু করা হবে। বরদৌলি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সুরাট জেলার ছোট একটা তহশিল, লোকসংখ্যা প্রায় সাতাশি হাজার। কিন্তু সতেরোই নভেম্বর বোম্বাই শহরে অবাঞ্ছনীয় দাঙ্গা হবার পর সেই আন্দোলন স্থগিত থাকে। বলা বাহুল্য সে আন্দোলন প্রত্যাহারের মূল দায়িত্ব আমার। তারপর কী হল, তার পর আপনার গভর্নমেণ্ট প্রদেশে-প্রদেশে প্রবল দমন-পীড়ন চালাতে লাগল। সুরু হল প্রজাদের সম্পত্তিলুট, নির্দোষ লোককে প্রহার, জেলে কয়েদিদের প্রতি বর্বর ব্যবহার, এমনকি নির্মম কশাঘাত—যা না সভ্য, না বা আইনসম্মত, না বা প্রয়োজনীয়। সরকারি আচরণ এক আইনবিরুদ্ধ নির্যাতনের নামান্তর।

দেশের তিন মৌল স্বাধীনতা এখন পক্ষাঘাতগ্রস্ত। কথা বলবার স্বাধীনতা, মেলামেশা করবার স্বাধীনতা, খবরের কাগজের স্বাধীনতা।

এই তিন স্বাধীনতাকে পক্ষাঘাত থেকে মুক্ত করাই আমাদের এখন প্রথম কাজ।

তাই আমরা স্থির করেছি সেই বরদৌলিতে আমরা সকর্মক আইন-অমান্য-আন্দোলন আরম্ভ করব। মাদ্রাজে গুন্টুরেও একশো গ্রাম নিয়ে এ আন্দোলন চালু হতে পারে যদি অবশ্য সর্বগত অহিংসা কঠোরভাবে পালিত হয়।

কিন্তু আমি আপনাকে সাত দিন সময় দিচ্ছি। আমি অনুরোধ করছি খবরের কাগজ থেকে সমস্ত নিষেধশাসন তুলে নিন আর সম্প্রতি যে সমস্ত জরিমানা আদায় করেছেন ও যে সমস্ত জামানত জব্দ করেছেন তা ফিরিয়ে দিন। আর যে সব লোক অহিংস থেকেও অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত হওয়ার দরুন কারাগারে আছে, তা স্বরাজের জন্যে হোক খিলাফতের জন্যে হোক বা পাঞ্জাবের বীভৎসতার জন্যেই হোক, তাদের মুক্তি দিয়ে দিন। যদি সাত দিনের মধ্যে আপনি উপরোক্ত ঘোষণা করেন, আমি বারদৌলির আন্দোলনে বিরত হব। ভাবব দেশের জনমতকে কার্যকর করার সদিচ্ছা সরকারের আছে। আর যদি সাত দিনের মধ্যে ঐ ঘোষণা প্রচারিত না হয়, তা হলে আমরা আমাদের আন্দোলনে অগ্রসর হব।'

সমগ্র দেশ প্রতীক্ষায় উদগ্র হয়ে উঠল। জেলখানায় দেশবন্ধু ও সুভাষ আকুল উৎকণ্ঠায় মুহূর্ত গুনতে লাগল। সাত দিন!

'সাত দিনে ক ঘণ্টা?' জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু।

'আমি ভাবছি ক মিনিট?' সুভাষ হিসেব করতে বসল সাত দিনের ক মিনিট আর বাকি।

সাত দিনের মধ্যে বড়লাট গান্ধির অনুরোধ না রাখলে কী হবে? রাস্তার লোক বলাবলি করে। গান্ধি তখন বারদৌলিতে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করবে।

যা দেশপ্রাণ শাসমল করেছিল মেদিনীপুরে, কাঁথিতে। এ আন্দোলনের অগ্রদূতও বাংলা।

সাত দিনের মেয়াদ ফুরোতে নয়ুই ফেব্রুয়ারি। কিন্তু পাঁচুই ফেব্রুয়ারি নিদারুণ এক কাণ্ড ঘটে গেল।

উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুরের কাছে চৌরিচৌরা নামে এক গ্রামের উপর দিয়ে একটা কংগ্রেসী শোভাযাত্রা যাচ্ছিল। সে শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রিত করতে এসেছিল পুলিশ, একজন সাব-ইনস্পেক্টর আর কতগুলি কনস্টেবল। জনতা অহিংসার ব্রত ভুলে পুলিশ-দলকে তাড়া করল। পুলিশ-দল থানায় গিয়ে আশ্রয় নিল, বন্ধ করে দিল দরজা। মত্ত উল্লাসে জনতা থানায় আগুন ধরিয়ে দিল। জীবন্তে দগ্ধ হল পুলিশ-দল, একুশ জন কনস্টেবল আর একজন সাব-ইনস্পেক্টর।

গান্ধিজির কাছে খবর পৌছুল। তিনি শুধু বিমূঢ় নন, অভিভূত হয়ে পড়লেন।

বারুই ফেব্রুয়ারি বারদৌলিতে আবার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসল। সে মিটিংএ সিদ্ধান্ত হল, সমস্ত আইন-অমান্য আন্দোলন, শুধু বারদৌলিতে নয়, সারা ভারতবর্ষে, এই দণ্ডে এই মুহূর্তে অনির্দেশ্য কালের মত তুলে নেওয়া হোক। তার বদলে দেশ এখন চরকা কাটুক খদ্দর পরুক জাতীয় স্কুল চালাক আর মদ খাওয়া বন্ধ করুক।

ধনুকে জ্যা আরোপ করার আগেই ধনুক ভেঙে গেল।

সমস্ত দেশ হতাশার সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে পড়ল। লর্ড রেডিংকে সাত দিনের মেয়াদ কাবার করবার দুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হলনা।

জেলে খবর পেয়ে দেশবন্ধু ক্ষোভে দুঃখে রোষে ভেঙে পড়লেন। বললেন, 'মহাত্মাজি আবার ভুল করলেন, আবার সব বানচাল করে দিলেন। ভুলের পরে ভুল। ডিসেম্বরে একবার ভুল করলেন, আবার ভুল ফেব্রুয়ারিতে।'

সুভাষও ক্ষুব্ধ। চৌরিচৌরার একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্যে সমস্ত দেশকে শাস্তি দেওয়া হবে কেন? চৌরিচৌরার কটা লোক অহিংস থাকতে পারেনি বলে বারদৌলির লোকও সহিংস হবে?

মতিলাল নেহরুও তখন জেলে। তিনিও জেল থেকে প্রতিবাদ

পাঠালেন : 'কন্যাকুমারিকার এক গ্রাম অহিংস থাকেনি বলে হিমালয়ের প্রান্তে আর এক শহরকে শাস্তি দিতে হবে ? বেশ তো, চৌরিচৌরা দোষ করে থাকে, চৌরিচৌরাকে বাদ দাও, গোটা গোরক্ষপুর জেলাকেই বাদ দাও, বাকি দেশে আন্দালন চালাতে বাধা কী ! বাকি দেশ তো আর আদর্শস্খলিত হয়নি ।'

জেল থেকে লাজপত রায়ও ঐ একই যুক্তিতে প্রতিবাদ জানালেন ।

চব্বিশে ফেব্রুয়ারি আবার ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং বসল । বাংলা আর মহারাষ্ট্র গান্ধিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করল । এই দৌর্বল্য এই ক্লৈব্য বলজীবী যোদ্ধার ধর্ম নয় । এই ভঙ্গিটাকে সার্থক রণকৌশলও বলা চলে না । সমস্ত দেশ যখন উদ্যত, বদ্ধপরিকর, তখন তাকে নিস্তেজ করে দেওয়া অর্থই তার জীবিকা হরণ করে নেওয়া ।

মুঞ্জে মহাত্মাজির সম্পর্কে ভর্ৎসনার প্রস্তাব আনল । যারা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তাদেরকে মহাত্মাজি তাঁর নিজের পক্ষে বক্তৃতা করতে অনুমতি দিলেন না । যদি হেরে যাই তো যাব, বক্তৃতা দিয়ে সে দোষের স্খালন চাই না ।

মুঞ্জের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয়ে গেল । দেখা গেল যারা মহাত্মাজির নিন্দায় মুখর ছিল তারাই গোপনে মহাত্মাজির পক্ষে ভোট দিয়ে বসেছে।

গান্ধির এমনই মাদকতা ।

তিনি ভুল করছেন করুন, তাঁর আদর্শের দিক থেকে দেখলে হয়তো ভুল নেই ।

কিন্তু গণ-আন্দোলন না হোক ব্যক্তিগত আইন অমান্য হবে না কেন ? বিশেষ ব্যক্তি স্বশক্তিতেই অহিংসায় নির্বিচল থাকতে পারে । তার বেলায় আন্দোলন কেন প্রত্যাহৃত হবে ?

'বাংলাদেশ চৌকিদারি ট্যাক্স দেবেনা ।' বাংলার হরদয়াল নাগ গর্জন করে উঠলেন : 'তোমরা যাই বলো আমরা মানবনা প্রত্যাহার।

আমরা একবার জাগলে ঘুমিয়ে পড়তে জানিনা, আমরা এগিয়ে যাব। খদ্দর পরে কেই বা চরকা কাটবে? আইন যে অমান্য করবে তার খদ্দর পরবার দরকার কী? যে কোনো পোশাকেই আইন অমান্য সম্ভব।'

আন্দোলন পণ্ড হয়ে গেলেও গভর্নমেণ্ট পঙ্গু হল না। তার ক্রূর কূটনীতি যেমন সজাগ তেমনি সজাগ রইল। তার মানে, এবার ঝোপ বুঝে কোপ মারল। দেখল আন্দোলনের জাল গুটিয়ে নেওয়া হয়েছে। লোকমতের খানিক অংশ গান্ধির বিপরীতে মুখ ফিরিয়েছে। এই তো শুভলগ্ন, চোরের অমাবস্যা।

তেরোই মার্চ, ১৯২২, গান্ধি গ্রেপ্তার হলেন।

দেশ থেকে আন্দোলন তুলে নিয়েছে, তার জন্যে কোথায় গান্ধিকে গভর্নমেণ্ট অভিনন্দন করবে, তা নয়, গান্ধির উপর আহত বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল।

যতক্ষণ শিকারি মাচার উপর ব'সে ততক্ষণ বাঘ দূরে থাকে। যেই মাচার থেকে নেমে আসার ভুল করে তখুনি বাঘ অতর্কিতে আক্রমণ করে বসে।

গান্ধির বিরুদ্ধে অভিভোগ কী?

সেই মান্ধাতার আমলের অভিযোগ। রাজদ্রোহ।

রাজদ্রোহ কোথায়?

কোথায় নয়? প্রতিটি বাক্যে কর্মে চিন্তায় নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে। বলদর্পিত পরশাসনের অবসান কামনাই তো রাজদ্রোহ। পক্ষাঘাত থেকে স্বাধীনতাকে যে নিরাময় করতে চায় সে রাজদ্রোহী নয় তো কী?

কিন্তু আদালতে যখন নিচ্ছে তখন অভিযোগের প্রত্যক্ষ ভিত্তি তো একটা দরকার।

ভিত্তি গান্ধির ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকার তিনটি প্রবন্ধ। সমস্ত প্রবন্ধ সমস্ত পৃষ্ঠা সমস্ত ছত্রই তো রাজদ্রোহে ঠাসা। তবু বিশেষ তিনটি

প্রবন্ধ বাছাই করা হল। তার মধ্যে একটির নাম সিংহের কেশর আস্ফালন।

সেই ঐতিহাসিক বিচার সুরু হল আঠারোই মার্চ, আমেদাবাদে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বললেন, যেন পন্টিয়াস পাইলেটের সম্মুখে যীশুখৃষ্টের বিচার হচ্ছে।

সরোজিনী নাইডু বলছে: 'আইনের চোখে অপরাধী আসামী, মহাত্মা গান্ধি যখন আদালতে এসে ঢুকলেন, কৃশ, শান্ত অথচ দুর্নমনীয় কঠিন শরীর, পরনে খাটো ও মোটা কটিবস্ত্র, সঙ্গে তাঁর বন্ধু ও সহচর শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, তখন তাঁকে সম্মান দেখাতে সমস্ত কোর্ট উঠে দাঁড়াল।'

জজ ব্রুমফিল্ড জিজ্ঞেস করল: আপনি দোষী না নির্দোষ?

আমি দোষী। বললেন মহাত্মা, কিন্তু আমার কিছু বলবার আছে। বলে এক দীর্ঘ বিবৃতি পেশ করলেন।

'ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রচার করছি এই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। কিন্তু এই প্রচার সুরু হয়েছে ১৮৯৩ সালে যখন আমি আফ্রিকায়। সেখানেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমার প্রথম সংঘর্ষ। সেখানে আমি আবিষ্কার করলাম যে ভারতীয় মানুষ হিসেবে আমার কোনো অধিকার নেই। আর আমার মানুষ হিসেবেও যে অধিকার নেই তার কারণ আমি ভারতীয়।

তবু আমি ভগ্নোৎসাহ হইনি। সুফল পাবার আশায় আমি ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। বুয়র যুদ্ধে এম্বুলেন্স বাহিনীর লোক সংগ্রহ করে দিয়েছি। জুলু বিদ্রোহের সময়ও স্ট্রেচার-বেয়ারার পার্টি গড়ে তুলেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার কাজের জন্যে লর্ড হার্ডিঞ্জ আমাকে কাইজার-ই-হিন্দ সোনার মেডেল পর্যন্ত দিয়েছেন। যখন ১৯১৪ সালে প্রথম জার্মান যুদ্ধ সুরু হল, তখন আমি লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্রদের নিয়ে স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন তৈরি করেছি। তিন বছর পর ১৯১৭ সালে দিল্লিতে ওয়ার-কনফারেন্সে

লর্ড চেমসফোর্ডের আহ্বানে আমি সৈন্য জোগাড় করে ফিরেছি। এই প্রচেষ্টায় আমার স্বাস্থ্য বিপন্ন হলেও আমি তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনিনি। এইসব প্রাণপাত সেবায় আমার কী আশা ছিল? কোন বিশ্বাস আমাকে এই নির্বিরাম প্রচেষ্টায় প্রণোদিত করেছে? তা শুধু এই যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে আমার দেশের জন্যে একটি সমান মর্যাদার আসন আমি অধিকার করে নিতে পারব।

কিন্তু প্রথম আঘাত এল রাউলাট য়্যাক্ট, দেশজোড়া মানুষের প্রাথমিক স্বাধীনতাটুকুও হরণ করার অভিসন্ধি নিয়ে। তার বিরুদ্ধে সুতীব্র আন্দোলন না করে আমার উপায়ান্তর ছিল না। তারপর এল পাঞ্জাব-বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের হননযজ্ঞ, যার পরিণতি হল হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটানো, প্রকাশ্য রাজপথে বেত মারা—এবং আরো সব অবর্ণনীয় অবমাননার কাহিনী। তারপর প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় মুসলমানদের যে আশ্বাস দিয়েছিল যুদ্ধের পর ধর্মস্থানগুলি তুরস্ককে ফিরিয়ে দেওয়া হবে সে প্রতিশ্রুতিও রাখা হল না।

তবু, এ সমস্ত সত্ত্বেও, আমি ১৯১৯এ অমৃতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার কথাই বলেছিলাম, আর মণ্টেগু-চেমসফোর্ড রিফর্মস যতই অল্প ও অসম্পূর্ণ হোক, বলেছিলাম এতেই হয়তো ভারতবর্ষের আশার অরুণোদয় ঘটবে।

আমার সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল। খিলাফত প্রতিজ্ঞার পরিপূরণ হল না। পাঞ্জাবের অপরাধের উপর সমর্থনের চুনকাম করা হল। আর অর্ধাশনী ভারতীয় জনতা জীবনহীনতার দিকে চলল ধীরে ধীরে। তাদের কে বলবে কে বোঝাবে যে বিদেশী শোষকের জন্যে তারা উদয়াস্ত খাটছে তাদের এ দশা সেই খাটনিরই মজুরি। তারা কি জানে আইনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বলে যে ব্রিটিশ শাসনের এত গর্ব তা আসলে তাদেরই শোষণের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত। কোনো তত্ত্ব বা সংখ্যার কারসাজি দিয়ে ভারতবর্ষের গ্রামীন মানুষের কঙ্কালায়িত শীর্ণতার ব্যাখ্যা করা যাবে না। মানবিকতার বিরুদ্ধে এত বড়

অপরাধের জুড়ি নেই পৃথিবীতে। যদি উপরে ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তার কাছে ইংলণ্ডের জবাবদিহি দিতে হবে। হ্যাঁ, ভারতবর্ষের শহরে বাস করে যারা গ্রামকে ভুলেছে তাদেরও ডাক পড়বে প্রায়শ্চিত্তে।

আর আইন? এদেশের আইন তৈরি হয়েছে শুধু বিদেশী শোষককে সেবা করবার জন্যে। পাঞ্জাব সামরিক আইনে দণ্ডিত মানুষের মামলা আমি নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি শতকরা পঁচানব্বুইটা দণ্ড অসিদ্ধ। দশ জনের মধ্যে ন জনই নির্দোষ। তাদের একমাত্র দোষ তারা দেশপ্রেমিক। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মামলা হলে আদালতে ভারতীয়রা শতকরা নিরানব্বুই ক্ষেত্রেই বিচারবঞ্চিত। বিচারের ফল একমাত্র ইংরেজের অনুকূলে। আমার এ চিত্র একটুও অতিরঞ্জিত নয়। সজ্ঞানেই হোক বা অজ্ঞানেই হোক এ দেশের আইনপ্রয়োগ শুধু শোষকের স্বার্থে এ চোখ-কান খোলা রাখলেই যে কেউই বুঝে নিতে পারে।

সব চেয়ে আশ্চর্য অনেক ইংরেজ ও তাদের অনেক ভারতীয় সহকর্মী জেনেও জানে না তাদের শাসন পরিচালনায় কী ঘোরতর অন্যায় তারা প্রশ্রয় দিচ্ছে। যে অপরাধে তারা অন্যকে দণ্ড দিচ্ছে সে অপরাধে তারা নিজেরাই লিপ্ত। তারা আন্তরিক ভাবেই বিশ্বাস করছে যে তারা পৃথিবীর এক উন্নততর বিচারপদ্ধতি পরিচালনা করছে আর তারই মধ্য দিয়ে ভারত ধীরে ধীরে সৌভাগ্যের পথে এগিয়ে চলেছে। তারা জানে না বাস্তবক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার এক দিকে রেখেছে ত্রাসের ভাব ও বলের নির্লজ্জ ব্যবহার, অন্য দিকে কেড়ে নিয়েছে প্রত্যাঘাতের বা আত্মরক্ষার ক্ষমতা। ফলে একটা গোটা জাতিকে পুরুষত্বহীন করে দিয়েছে আর তাদের এই নির্বীর্যতাই শাসকবর্গকে বুঝিয়েছে, আহা, কী সুখে-শান্তিতেই ওদের দিন যাচ্ছে। এই অজ্ঞান আর আত্মবঞ্চনা থেকে শাসকবর্গের মুক্তি নেই।

ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে ১২৪-ক ধারাটা কী? নাগরিকের ন্যূনতম স্বাধীনতাটুকুও কেড়ে নেওয়া। আইনের কারখানায় স্নেহের জন্ম হয় না, যেচে মান বা কেঁদে সোহাগ অসম্ভব। যদি কারু প্রতি কারুর স্নেহ না থাকে তাহলে তার অস্নেহ বা অসন্তোষ জানাবার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত, যতক্ষণ পর্যন্ত তা না বলপ্রয়োগে কলুষিত হয়। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার আর আমি এই অস্নেহের অপরাধেই অভিযুক্ত। ভারতের প্রিয়তম দেশপ্রেমিকদের অনেকেই এই অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। কেন আমার এই অস্নেহ তার কারণ সংক্ষেপে কিছু বলেছি। কোনো শাসক বা ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে আমার কোনো বিদ্বেষ নেই, রাজার বিরুদ্ধে তো আরো নয়। কিন্তু যে গভর্নমেণ্ট ভারতের বিস্তৃততম ক্ষতি করেছে তার প্রতি অস্নেহ পোষণ করা আমি পুণ্য বলে বিবেচনা করি। ইংরেজ-শাসনের আগে আর কোনো শাসনেই ভারতের মানুষ এত নির্বীর্য ছিল না। ইংরেজশাসনকে আমি যখন এই নির্বীর্যতার কারণ বলে মনে করি তখন তার প্রতি আমার স্নেহ থাকে কী করে? আমি যে বিভিন্ন প্রবন্ধে আমার এই মনোভাব বিশদ করে বলতে পেরেছি তাতেই আমি সম্মানিত।

বস্তুত আমি অসহযোগের মধ্য দিয়ে ভারত ও ইংলণ্ড উভয় দেশের সেবা করেছি, দেখাতে চেয়েছি কী অস্বাভাবিক অবস্থায় আমাদের বসবাস করতে হচ্ছে। অন্যায়ের সঙ্গে অসতের সঙ্গে অসহযোগ, ন্যায়ের সঙ্গে সতের সঙ্গে সহযোগের মতই অবশ্যকর্তব্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসহযোগ করতে গিয়ে অন্যায়কারীকে পীড়ন করা হয়েছে। আমি বলতে চাইছি সহিংস অসহযোগ শুধু অন্যায়ই সৃষ্টি করে চলে, আর অন্যায়কে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যেমন বলের প্রয়োজন হয়, তেমনি অন্যায়কে দূর করে দিতে হলে বলের থেকে বিরতির প্রয়োজন। অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগের জন্যে যে শাস্তি তাতে সজ্ঞান সম্মতির অর্থই অহিংসা। তাই আইনের বিচারে যা

গর্হিত অপরাধ আর আমার বিচারে যা মহত্তম কর্তব্য, তার জন্যে দীর্ঘতম শাস্তি আমি সানন্দে বরণ করে নেব।'

তারপর বিচারক ও এসেসরদের সম্বোধন করে মহাত্মা বললেন, 'আপনাদের কাছে দুটো পথ খোলা আছে, এক চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে এই অন্যায় থেকে সরে আসা, যদি অবশ্য মনে করেন যে আইন আপনারা প্রয়োগ করতে যাচ্ছেন সেটা অন্যায় ও সেই অর্থে আমি নির্দোষ—নচেৎ আমাকে কঠিনতম শাস্তি দেওয়া, যদি বিশ্বাস করেন যে আইন আপনারা প্রয়োগ করছেন তা এই দেশবাসীদের পক্ষে হিতকর ও সেই অর্থে আমার প্রবন্ধগুলি ক্ষতিসাধক।'

ব্রমফিল্ড গান্ধিকে দোষী সাব্যস্ত করে ছ বছরের জেলের আদেশ দিল।

'আমি যদি গ্রেপ্তার হই' এ নামে এক প্রবন্ধ লিখে গান্ধি আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যেন তাঁর গ্রেপ্তারের পর কোথাও কোনো হরতাল না হয়, না বা কোনো সভা বসে বা মিছিল বেরোয়। যেন সর্বত্র সম্পূর্ণ শান্তি বজায় থাকে।

মহাত্মার নির্দেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করা হল। সর্বত্র নেমে এল বিষাদ আর বিরতি। আর স্তব্ধতা, দৃঢ়ীভূত স্তব্ধতা।

পাঁচ

ততঃ কিম?

দেশবন্ধু বললেন, 'এখন একমাত্র পথ কাউন্সিলে ঢুকে গভর্নমেণ্টকে আঘাত করা।'

জেলের মধ্যে দু দল হয়ে গেল। একদল গান্ধির, আরেক দল দেশবন্ধুর। সুভাষ দেশবন্ধুর দলে।

'নির্বাচিত মেম্বাররা তো কোনো দিনই মেজরিটি হবে না।' বিরোধীদল তর্ক তুলল।

'না হোক। তবু কাউন্সিলে প্রতিনিয়ত গভর্নমেণ্টকে আক্রমণ করবার মনোভাবটা বাইরের প্রত্যক্ষ আন্দোলনকে জোরদার করবে।' বললেন দেশবন্ধু, 'তখন কাউন্সিলে শুধু দুটো যুধ্যমান দল থাকবে, গভর্নমেণ্ট আর পিপল। বাইরেও এই বিভেদটা উচ্চারিত হবে: সরকার আর জনগণ। এর মধ্যে আর কোনো দল নেই, আর কোনো গোষ্ঠী নেই, আর কোনো উপসর্গ নেই। তা ছাড়া কোনো বিষয়েই মেজরিটি হব না তা কী করে বলছ?' দেশবন্ধু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন: 'এমন বিষয়ও নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে যাতে তর্ক-কৌশলে হয়ে যাব মেজরিটি।'

'মেজরিটি হলেই বা লাভ কী?' বিরোধী দল আবার আপত্তি তুলল: 'আপনাদের পাশ-করা প্রস্তাব গভর্নর ভিটো করে দেবে।'

'ভিটো করে দেবে! তাই দিক না! বাইরের লোক তখন বুঝবে রিফর্মসের স্বরূপ কী।' বললেন দেশবন্ধু, 'জনগণের সামনে গভর্নমেণ্ট ভণ্ড বলে প্রতিপন্ন হবে। ঐ ভিটোই জনগণকে রুষ্ট করবে, উত্তেজিত করবে, তাদের আন্দোলনে ধার জোগাবে। আমার বক্তব্য তো

একমাত্র তাই। কাউন্সিলে ঢুকে সরাসরি কিছু না হোক পরোক্ষে লাভ হবে। আসল তো হচ্ছে আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা, তাকে ক্ষিপ্রতর করা। কাউন্সিলের লড়াইই আন্দোলনে আবেগ সঞ্চার করবে। আবেগ না থাকলে বেগ আসবে কী করে? বাক্য যে কত বড় অস্ত্র কাউন্সিলে ঢুকেই তা বোঝানো যাবে। আর সব সিদ্ধান্তই গভর্নর ভিটো করবে য়্যাক্টে এমন এক্তিয়ার নেই। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রস্তাব পাশ করানো যায় তা হলে তাতে গভর্নর হাত দেবেনা। ফলে মন্ত্রীরা গদি ছাড়তে বাধ্য হবে। পরিণামে এই প্রমাণিত হবে ডায়ার্কি অচল, রিফর্মস অসার আর ইংরেজ গভর্নমেণ্ট কাপট্যের অবতার।'

গান্ধির দলের নাম হল নো-চেঞ্জার আর দেশবন্ধুর দলের নাম হল স্বরাজিস্ট, যদিও স্বরাজ্য পার্টির জন্ম আরো কিছু পরে। সুভাষ নিঃসন্দেহে স্বরাজিস্ট।

অগ্রণী নেতারা সবাই প্রায় জেলে, আন্দোলন স্তিমিত থাকলেও উত্তেজনার অভাব ছিল না। ধরপাকড় সমানেই চলছে, চলছে নির্যাতনের অট্টহাস। আইন এসে দাঁড়িয়েছে পিনাল কোডের দুটি ধারায়, ১০৮ আর ১৪৪—জনতা হলেই অবৈধ জনতা আর স্বেচ্ছা-সেবক হলেই ঘৃণ্যজীবী ভবঘুরে। উচ্চ আদালতে আপিল তো করবে না কেউ, তাই নিম্ন আদালতগুলি মনের সুখে যথেচ্ছাচারের মুক্ত অঙ্গনে খাড়া হয়ে রইল।

খবর এল পাঞ্জাবে লরেন্সের মূর্তি আক্রান্ত হয়েছে। অন্ধ্রে গোদাবরীতে পোঁতা হয়েছে জাতীয় নিশান। গুরুকাবাগে আকালি-দের উপর পুলিশ লাঠি-চার্জ করেছে। বরিশাল ও ফরিদপুর জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের বেত মারা হয়েছে। এমনি নানা দিক থেকে আসছে উত্তেজনার উত্তাপ। কিন্তু সবচেয়ে বেশি উত্তেজনা জোগাল ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের বিষাক্ত উক্তি: 'ভারতবর্ষের শাসন-সৌধের ইস্পাতের কাঠামোই হচ্ছে আই-সি-এস।'

ইস্পাতের কাঠামো। এই একটি আলপিনের খোঁচায় সারাদেশ যন্ত্রণাবিদ্ধ হল। আশা ছিল ক্রমে-ক্রমে আই-সি-এসদের উত্তুঙ্গতাকে হ্রস্ব করে আনা হবে, ক্রমে বা সমতল করে আনা হবে দেশের সাধারণ মানুষের পর্যায়ে, আর তাদের টাকা ও ক্ষমতার অত ঝলমলানি থাকবে না। কিন্তু, না, সে আশায় বাজ হানল লয়েড জর্জ। সে আরো বললে, 'আমি তো এমন কোনো সময়ের কথা ভাবতেও পাচ্ছিনা যখন ভারতবর্ষ ব্রিটিশ আই-সি-এসদের পরামর্শ ও সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারবে। ভারতবর্ষে ব্রিটেনের যে গুরুভার দায়িত্ব আছে তা পরিপূর্ণরূপে পালন করবার জন্যেই আই-সি-এসদের প্রয়োজন। সে দায়িত্বকে বিসর্জন দেওয়া নয়, সে দায়িত্বপালনে আই-সি-এসরা যাতে দেশবাসীর সার্থক অংশীদার হতে পারে তারি জন্যে রিফর্মসের অবতারণা।'

সুভাষ ভাবল আমিও তো এমনি ইস্পাতের কড়ি-বরগা হতে পারতাম। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অন্য কাজে ডেকেছেন। ডেকেছেন ঐ ইস্পাতের স্পর্ধিত সৌধকে ভূমিসাৎ করে দিতে। ধুলো করে দিতে ঐ গর্বের পর্বতভার।

কিন্তু উপায় কী ? পথ কোথায় ?

লয়েড জর্জের উক্তিতে দেশ এত ক্ষুব্ধ হল যে লর্ড রেডিংকে একটা স্তোকবাক্য নিয়ে এগিয়ে আসতে হল। না, না, তোমরা গোসা কোরো না, প্রধান মন্ত্রী যাই বলুন, আগে-আগে তোমাদের যে সব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার নড়চড় হবেনা।

আর অপেক্ষা করা যায় না। দেশবন্ধু ছাড়া পাবেন কবে ?

'যদি তিনি গান্ধির বারদৌলি প্রস্তাব মেনে নেন তো এখুনি ছেড়ে দিতে পারি।' সে তো কবেই বলা হয়েছিল তাঁকে, তিনি স্বীকৃত হন নি। আবার একবার এখন বলে দেখব নাকি ? দেখুন না।

বলা বৃথা। ও সব কথা তিনি কানেও তুলতে চান না। আন্দোলন কখনো বন্ধ হবার নয়। লোক থেমে যেতে পারে কিন্তু

আন্দোলন থামবে না। মহাত্মাজি সরে যেতে পারেন কিন্তু দেশবন্ধু সরবেন না।

'আপনি যদি কাউন্সিলে যেতে চান, গেলে রাজার নামে শপথ নেবেন ?' নো-চেঞ্জারদের একজন জিজ্ঞেস করলে।

'কে রাজা ? ও তো একটা ফর্ম মাত্র।' বললেন দেশবন্ধু, 'আসল উদ্দেশ্যটা দেখ।'

'তা হলেও যে অসহযোগী তার পক্ষে কি রাজার নামে শপথ করা শোভা পায় ?'

'অসহযোগী হয়েও তো রাজার মাথাওয়ালা ডাকটিকিট ব্যবহার করছ। নিচ্ছ রাজার দেওয়া আরো অনেক সুবিধে। কথাটা তা নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই বুরোক্রেটিক গভর্নমেণ্টকে ধ্বংস করা, আমরা তো আর রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে যাচ্ছিনা। সুতরাং শপথে আপত্তি করবার কিছু নেই।'

পনেরো-ষোলো এপ্রিলে চট্টগ্রামে প্রাদেশিক সম্মিলন বসল। সভানেত্রী বাসন্তী দেবী। তিনি নতুন কথা বললেন। বললেন, 'কাউন্সিলে প্রবেশ করা তো মহাত্মা গান্ধির প্রস্তাবের বিরোধিতা নয়, কাউন্সিলে প্রবেশ করে প্রতি পদে বুরোক্রেসিকে বাধা দেওয়াও তো বিরাট অসহযোগিতা। বাইরে থেকে অসহযোগের চেয়ে ভিতরে থেকে অসহযোগ ঢের বেশি কার্যকর হবে। হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে রিফর্মস এসেছে তা ভাঁওতা ছাড়া কিছু নয়। আমরা তো কাউন্সিল চালাতে যাব না, আমরা কাউন্সিল অচল করতে যাব। সুতরাং কাউন্সিলে ঢোকা অসহযোগেরই এক অধ্যায়।'

কারু বুঝতে বাকি রইল না এ কার কথা ? দেবী বাসন্তী কার মূর্তিমতী মর্মবাণী ?

নো-চেঞ্জাররা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। মহাত্মা যে ছক কেটে দিয়ে গেছেন তার বাইরে যাওয়া যাবে না, তাঁর দেখানো পথই আঁকড়ে থাকতে হবে। বোঝা যাচ্ছে জেল থেকে বেরুবার পরেই

এ নিয়ে বাধবে একটা সঙ্ঘর্ষ। সঙ্ঘর্ষের আশায় সুভাষ উৎসাহিত হয়ে উঠল।

দেশবন্ধু বললেন, 'একটা ইংরিজি দৈনিক পত্রিকা বের করতে হবে। নাম হবে ফরোয়ার্ড।'

হ্যাঁ, এগিয়ে চলা, নির্বিশ্রাম এগিয়ে চলা। কোথাও থামা নয়, বসে পড়া নয়, ফিরে যাওয়া নয়, শুধু এগিয়ে চলা। আদর্শকে ধ্রুব-তারা রেখে উত্তরঙ্গ সমুদ্রে পাড়ি জমানো।

'তুমি তো আমার ক'দিন আগে ছাড়া পাবে, তাই না?' সুভাষকে জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধু।

'হ্যাঁ, পাঁচ দিন আগে।' সুভাষের চোখ ছলছল করে উঠল।

এই কদিন জেলের মধ্যে কী আনন্দে কেটেছে তাদের, গুরু-শিষ্যের, রাজা ও তার সেনাপতির। আন্দোলনের ফলে জেল-বন্দীদের মধ্যে কোনো হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ছিল না, সকলের এক জাতি, এক ভারতীয়তা। তাদের এক উৎসব, তা হিন্দুর সরস্বতী পুজো হোক কি মুসলমানের ঈদ হোক। সকলের একসঙ্গে এক পঙক্তিতে বসে খাওয়া-দাওয়া। আর এ সমস্ত আয়োজনের সম্পাদক সুভাষ। তার চোখে হিন্দু-মুসলমান দুটো মানুষ নয়, দুটো নাম মাত্র। এক মানুষের দুই নাম। সেই এক মানুষের এক সুখ —সম্মানে বাস করা, এক যন্ত্রণা—দাসত্ববন্ধনে ক্লিষ্ট হওয়া। নিশ্চয়ই কোথাও এদের মেলানো যাবে। নিশ্চয়ই এমন কোনো একটা অনুভূতির স্তর আছে যেখানে এরা অস্তিত্বের সহজ উদ্দীপনায় একত্র হতে পারবে। তারা একত্র হতে পারবে মানবিকতায়, ভারতীয়তায়, একই সমান-শত্রুর সম্মুখীনতায়! যে ছলে-বলে দু ভাইকে আলাদা করে রেখেছে, নিজের অন্ন উঠে যাবে বলে মিলতে দিচ্ছে না প্রাণে ধরে, তার মত আর শত্রু কে? শুধু একবার অন্তরের ইচ্ছাটাকে জাগ্রত করা। তা হলেই মুক্তি। আর কত সহজেই, ঘরের বাইরে আকাশের দিকে তাকালেই, এ ইচ্ছাকে জাগানো যায়।

'কেমন আছ ?' জেলে সাক্ষাৎকারের সময় বাসন্তী দেবী জিজ্ঞেস করলেন দেশবন্ধুকে।

'ভালো আছি।' প্রফুল্ল মুখে বললেন দেশবন্ধু, 'সুভাষ আমাকে খুব সেবা করছে। ও যে এত ভালো নার্স তা কে জানত।'

জেল থেকে বেরোবার পর সুভাষের ডাক পড়ল এই সেবাতেই। উত্তরবঙ্গে দেখা দিয়েছে ভয়াল বন্যা। পাঁচ-পাঁচটা জেলা ভেসে গিয়েছে। শুধু ভেসে গিয়েছে বললে কিছু বোঝানো যাবেনা, জল দাঁড়িয়ে গেছে প্রায় বারো ফুট উঁচু হয়ে। শস্যের সবুজ কণাটুকুও কোথাও নেই, ঘরবাড়িও অনেক নিশ্চিহ্ন, আর গরু-বাছুর তো গেছেই, মানুষও অনেক মগ্ন মৃত গৃহহীন। কংগ্রেসের কাছে টেলিগ্রাম এসে পৌঁছুলো। ত্রাণের ব্যবস্থা করো।

কংগ্রেস সুভাষকে পাঠিয়ে দিল। সঙ্গে একজন ডাক্তার গেলে ভালো হয়। গেল ডাক্তার জে এম দাশগুপ্ত।

সেবার হাত মমতার হাত, করুণার হাত। সেবা ছাড়া জনগণের মনে সন্নিবিষ্ট হবে কী করে? আর সন্নিবিষ্ট হয়েই বা থাকবে কতক্ষণ? যদি তোমার চরিত্র না উজ্জ্বল হয়, তোমার আদর্শ না মহৎ হয়, যদি তুমি বিদ্বান না হও। বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।

নেতা হতে চেও না, সেবক হও। সেবা করতে-করতেই পাওয়া যায় নেতৃত্ব।

কয়েকদিন আগেই 'নিখিলবঙ্গ যুবক সভা'র আয়োজন করেছিল সুভাষ। অধিবেশন বসেছিল আর্যসমাজ হলে, ডক্টর মেঘনাথ সাহা মূল সভাপতি আর সুভাষ অভ্যর্থনা সমিতির অধিকর্তা। প্রতিনিধি এসেছিল নানা স্কুল-কলেজ থেকে, পাঠাগার থেকে, সঙ্ঘ সমিতি থেকে, এমনকি মক্তব-মাদ্রাসা থেকে। সুভাষই প্রাণ-জাগানো বক্তৃতা দিলে। বিষয় শুধু দুটো—হৃদয়-ঢালা সেবা আর ধৈর্য্য-ধরা দুঃখসহন। সকল শক্তির শ্রেষ্ঠ শক্তি আত্মশক্তি। আমরা একত্রে যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করব, যে পরিমাণ কষ্ট সহ্য

করব, আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাও সেই পরিমাণে প্রবল হবে।

'সকল বলের শ্রেষ্ঠ বল, চরিত্রবল।' বলছে সুভাষ, 'চরিত্র দৃঢ় না হলে দুর্বলতাকে জয় করবে কী করে? কী বলছেন বিবেকানন্দ? বলছেন দুর্বলতাই একমাত্র পাপ। যে সব সময় নিজেকে দুর্বল ভাবে সে কোনোকালে বলবান হবে না। যে নিজেকে সিংহ বলে জানে সেই জগজ্জালের পিঞ্জর ভেদ করে বেরিয়ে যেতে পারে। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী।'

তারপরেই সেবা। মানবসেবাই মাধবসেবা। সেবার থেকেই চিত্তে নির্মলতা জাগবে, জাগবে নিঃস্বার্থপরতা। রুগ্ন আর্ত পীড়িত মানুষই তখন ঈশ্বরের মন্দির হয়ে যাবে, আর তুমি সেবক, তুমি হয়ে উঠবে উপাসক।

শান্তাহারকে কেন্দ্র করে সুভাষ সেবাত্রাণের ব্রত নিয়ে ঘুরতে লাগল উত্তরবঙ্গ—আদমদিঘি, মদনপুর কুশুম্বি, বগুড়া। বিপন্নদের সাময়িক আশ্রয়ের জন্যে এখানে-ওখানে অজস্র তাঁবু পাঠাতে লাগল, পাঠাতে লাগল খাদ্য-বস্ত্র। স্যার পি সি রায়ের ডাকে ত্রাণভাণ্ডারে চাঁদা উঠল চার লক্ষ টাকা। প্রফুল্লচন্দ্র সেই ত্রাণ যজ্ঞের পুরোধা হলেন, তাঁর আবেদনে শুধু খাদ্য-বস্ত্র নয়, আসতে লাগল ওষুধ-বিষুধ, নানা প্রতিষেধ। দেশকে ভালোবাসা সার্থক কিসে? শুধু দেশের মানুষকে ভালোবেসে। দেশের মানুষই দেশ। দেশই দেশের মানুষ।

কিন্তু সরকারের মুষ্টি কী কুণ্ঠিত, কী কৃপণ! এই বিরাট ত্রাণকার্যে তাদের বদান্যতা মোটে বিশহাজার।

সরকারের মুখপাত্র দেশী মন্ত্রী, রিফরর্মসের পুত্তল, কী বলছে এই কার্পণ্যের সমর্থনে? বলছে, গভর্নমেণ্ট কোনো দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। শুধু আর্তত্রাণ করে ফতুর হয়ে যাওয়াই তার একমাত্র কাজ নয়।

শোনো কথা। প্রজার দুঃখনিবারণ রাজধর্ম নয়। প্রজা বানের জলে ভেসে যাবে কিন্তু রাজা তার জন্যে চোখের জলটুকুও ফেলবে না।

কংগ্রেসের সেবাত্রাণ বিরাটভাবে সফল হল। দেশবাসীর কাছে বেড়ে গেল কংগ্রেসের মর্যাদা। দুঃস্থের দুঃখমোচন একমাত্র কংগ্রেসই করতে পারে, কংগ্রেসই নিরাশ্রয় জনকে গৃহ তৈরি করে দিতে পারে, কংগ্রেসই ম্লান মুখে হাসি ফোটাতে পারে, বদ্ধ ঘরে বওয়াতে পারে হাওয়া। কংগ্রেসই দিতে পারে সংগ্রামের নির্দেশ। আনতে পারে সর্বমুখী স্বাধীনতা।

কিন্তু কংগ্রেস এখন কী করবে? গান্ধি জেলে, দেশবন্ধুও বেরোননি এখনো। এখন আন্দোলন কোন ঢেউ তুলবে? গান্ধি-কথিত গঠনমূলক কাজ করেই তৃপ্ত থাকবে, চরকা কেটে তাঁত বুনে স্বদেশী পাঠশালায় মাস্টারি করে, না, চিত্তরঞ্জন যা বলছেন, কাউন্সিলে ঢুকে সরকারের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে? হোক বাকযুদ্ধ, বাক্যই ব্রহ্ম। একেকটা বাক্যই শতসঙ্কল্পের বারুদ পোরা। একটি বাক্যের মধ্যেই সমস্ত শক্তির বীজাঙ্কুর। যেমন ধরো, বন্দেমাতরম, আরো পরে কুইট ইণ্ডিয়া, আরো একটু পরে জয় হিন্দ।

একটা কথার মধ্যেই সমস্ত দেশের উদ্বোধন। সমস্ত দেশের প্রাণশুদ্ধি।

এদিকে আইন অমান্য তদন্ত কমিটি বসিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সারা দেশ ঘুরে ঘুরে সাক্ষী সাবুদ শুনে বিচার করে দেখছে আবার আইন-অমান্য আন্দোলন সুরু করা সঙ্গত হবে কিনা। দেশের মনোবল ঠিক দৃঢ় আছে, শুধু নেতৃত্বের অভাবে মাঝে মাঝে এসে যেতে পারে অসংযম। তাই কমিটি সুপারিশ করল, প্রদেশগুলি নিজের-নিজের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে আইন-অমান্য চালাতে পারে, কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও শাসনের মুষ্টি রাখতে হবে যেন আন্দোলন না হিংসায় আবিল হয়ে ওঠে।

তদন্ত কমিটির সদস্য ছয় জন। হাকিম আজমল খাঁ, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, ডাক্তার আনসারি, রাজাগোপালাচারী আর কস্তুরি রঙ্গ আয়াঙ্গার।

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানবর্জনে ওরা একমত হল। জাতীয় স্কুল শুধু স্থাপন করলে চলবে না, সরকারি স্কুল থেকে তারা ভালো এটা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর সেই আকর্ষণেই সরকারি স্কুল ছেড়ে ছেলে আসবে জাতীয় স্কুলে, কোনো পিকেটিংএর প্ররোচনায় নয়।

আদালতবর্জনেও তারা একমত হল। মামলা যারা করছে আর যারা চালাচ্ছে, মক্কেল আর উকিল সবাই আদালত পরিহার করবে। বিচার্য বিষয়কে নিয়ে যাবে গ্রাম-পঞ্চায়েতে—সেই বিচারই যে ঠিক বিচার তার সপক্ষে গড়ে তুলতে হবে জনমত।

কাউন্সিলে প্রবেশের প্রশ্ন নিয়ে কমিটি একমত হতে পারল না। আনসারি, রাজাগোপালাচারী আর আয়াঙ্গার বললে, কাউন্সিলবর্জন সম্পর্কে কংগ্রেসের আগের যা সিদ্ধান্ত আছে তাই বহাল থাকবে, অর্থাৎ কাউন্সিল বর্জিত হবে কিন্তু আজমল খাঁ, মতিলাল নেহরু আর প্যাটেল দেশবন্ধুর অনুকূলে মত দিলে—একবার পরীক্ষা করে দেখা যাক না কেমন চেহারা নেয়।

এবং এই বিভেদকে কেন্দ্র করেই গয়াকংগ্রেসে দেশবন্ধু কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে স্বরাজ্য পার্টির পত্তন করলেন।

নতুন কিছু ভাবো, নতুন কিছু করো। শুধু গতানুগতিককে আঁকড়ে থেকো না।

ছয়

উনিশশো বাইশের নয়ুই আগস্ট রাত্রিতে দেশবন্ধু জেল থেকে ছাড়া পেলেন।

'আপনি মুক্ত।' মেজর সেলিসবারি এসে বললে, 'আপনার ছেলে চিররঞ্জন দাস বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে, আপনি বাড়ি যান।'

যারা পড়ে রইল তাদের কাছে এ দুঃসহ বিরহ। তাদের মনে হল দেশবন্ধুকে যেন পুলিশ গ্রেপ্তার করে তাদের মধ্য থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সকলের চোখ ছলছল করে উঠল।

কিন্তু অনেক কাজ পড়ে আছে। দেশকে স্বাধীন করার কাজ। এই ভেবেই সব শোক দুঃখ মনোবেদনা ভুলতে হবে আমাদের।

যাবার আগে ডাকলেন মথুরকে।

মথুরও কাঁদছে।

'আমি তো ছাড়া পেয়ে বাড়ি চললাম। তোরও তো ছাড়া পেতে বেশি দেরি নেই।' তার মাথায় হাত রাখলেন দেশবন্ধু : 'তুই খালাস পেলেই সটান আমার বাড়ি যাবি, আমার কাছে! বুঝলি?'

বুঝেও বুঝে উঠতে পারছে না মথুর। সে ডাকাত, জেল খাটতে এসেছে, তার উপর দেশবন্ধুর এত বিশ্বাস এত মায়া! আর সে এই নতুন জেল খাটছে না, এর আগে আরো কয়েকবার সে খেটে গেছে। সে যাকে বলে, দাগী ডাকাত। কী শুভক্ষণে কে জানে সে দেশবন্ধুদের ওয়ার্ডে কাজ করতে আসে। আর সবার সঙ্গে মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে যায়।

কিন্তু দেশবন্ধু ছাড়া কে আছেন আশ্রয়দাতা ?

'বাবা, আমি কি তোমার বাড়ি চিনি যে যাব ?' মথুর বললে করুণমুখে।

'সে তোকে ভাবতে হবে না। তোর ছাড়া পাবার দিন আমি ঠিক সময়ে লোক পাঠিয়ে দেব, সে এসে তোকে নিয়ে যাবে।'

নিজের কানে শুনেও যেন বিশ্বাস করতে সাহস পাচ্ছে না মথুর। যদি এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়তে পারত ! এই মুহূর্তেই !

দুপুরে নয় রাত্রে দেশবন্ধুর পা টিপে দিত মথুর আর বলত তার জীবনের কাহিনী। জীবনের কাহিনী মানে ডাকাতির কাহিনী। সে সৎ হবার সুস্থ হবার সময় পেল কই ? ডাকাতি করে ধরা পড়ে, লম্বা জেল হয়ে যায়, বেরিয়ে এসেই তৈরি কোনো বিশ্রাম পায়না, আবার তড়িঘড়ি ডাকাতি করে বসে। আবার লম্বা জেল। এমনি ভাবে আট-দশবার হল। জীবনের আদ্ধেকেরও বেশি কাটল এই জেলখানায়। আর বাঁচব কদিন। তবু ভাগ্য বলব এই শেষবার যে জেলে এসেছিলাম। জেলে এসেই না 'বাবা'র দেখা পেলাম।

হ্যাঁ, শেষবার। বাবার চরণ যখন পেয়েছি তখন আর ছাড়ব না। আর কোনোদিন হব না এমুখো।

বাড়ির সকলের কাছেও দেশবন্ধু তাঁর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু সবাই কেমন একটু সন্ত্রস্ত হল। একটা খুনে ডাকাতকে বাড়িতে এনে আশ্রয় দেওয়া কি ঠিক হবে ?

খুনে ডাকাত ! কি রে, খুন করেছিস নাকি ?

মথুর মাথা চুলকে সলজ্জ মুখে বললে, 'তা দু একটা কোন না করতে হয়েছে।'

সবাই শিউরে উঠল।

'দেখলে কেমন শাদা সত্য কথাটা বললে। হোক না খুনে ডাকাত,' দেশবন্ধু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'ওর কি একটা সুস্থ সমর্থ

মানুষ হবার সুযোগ মিলবে না? একবার ডাকাতি করেছে বলে আবারও ওকে ডাকাতিই করতে হবে এমন কী কথা আছে?'

'তুমি যা ভাল বোঝ তাই করো,' বললেন বাসন্তী দেবী, 'কিন্তু আমি ভাবছি, ওর স্বভাব কি ও ছাড়তে পারবে?'

'খুব পারবে। আমার সঙ্গে থাকবে, আমার সেবা করবে, চুরি-ডাকাতি করবার সময়ও পাবে না। কিরে মথুর,' মথুরের দিকে তাকালেন দেশবন্ধু: 'আবার চুরি-ডাকাতিতে মন দিবি নাকি?'

'বাবার শ্রীচরণ ছাড়া আর কিছুতে মন দেব না।'

দেশবন্ধুর স্বাস্থ্য ভেঙে গেলেও মন ভাঙেনি, অবসন্ন হয়নি তাঁর প্রাণের সজীবতা। নিজের মধ্যে নিজের বেগবান প্রাণের আনন্দে তিনি ভরপুর। এই ছাত্রসমিতি যখন তাঁকে ডাকল অভিনন্দন জানাতে তিনি পরিপূর্ণ উচ্ছ্বাসে সাড়া দিয়ে উঠলেন। যৌবনের ত্যাগ দুঃসাহস পবিত্রতা ক্লেশ সহ্য করবার ক্ষমতা শত বৈফল্যেও বিচলিত না হওয়া—এই মহাজীবনকে তিনিও অভ্যর্থনা জানালেন। তোমরা জীবনে সত্যের পূজা বহন করে চলেছ, তোমাদের রথ সমস্ত পর্বত লঙ্ঘন করে যাবে, তোমাদের তরণী পার হয়ে যাবে সমস্ত সমুদ্র।

স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে দেশবন্ধু দার্জিলিঙ গেলেন। সেখানে কয়েক-দিন কাটিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা। আবার বেরুলেন কাশ্মীরের পথে।

সঙ্গে আরো অনেকের মধ্যে মথুর।

ঠিক দিনে জেল-গেটে লোক পাঠিয়ে দেশবন্ধু তাকে বাড়ি আনিয়েছেন। কী রে, দেখলি তো, ভুলিনি তোকে, ভুলিনি তোর খালাস পাবার দিনটির কথা।

মথুর দেশবন্ধুর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। এত দয়া এত ভালোবাসাও কোথাও আছে, তার মত মানুষের জন্যেও আছে, এ সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

সুভাষ লিখছে তার 'তরুণের স্বপ্নে' : 'মথুরের খালাসের দিন দেশবন্ধু লোক পাঠিয়ে তাকে জেলখানা থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। তারপর প্রায় তিন বছর মথুর তাঁর কাছে ছিল। তাঁর পরিচারক হয়ে সে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরেছে।'

কিন্তু দেশবন্ধুকে কাশ্মীরে ঢুকতে দেওয়া হল না।

প্রবেশপথে, বারমুলায়, পুলিশ তাঁর পথ আটকালো। বললে, 'যদি প্রতিশ্রুতি দেন তবেই ঢুকতে পাবেন।'

'কিসের প্রতিশ্রুতি ?'

'যে, কাশ্মীরে আপনি কোনো রাজনৈতিক কাজে ও কথায় লিপ্ত হবেন না। এই মর্মে, এই নিন,' পুলিশ-সুপার একখানা কাগজ মেলে ধরল : 'প্রতিজ্ঞা-পত্রে দস্তখৎ করে দিন।'

দেশবন্ধু তখন অত্যন্ত অসুস্থ, প্রায় একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর—প্রতিজ্ঞা-পত্রে দস্তখৎ করতে অস্বীকৃত হলেন। যা হবার হবে—প্রাণের চেয়েও সম্মান বড়, স্বাধীনতা বড়—ফিরে চলো এখান থেকে। এক মুহূর্তও দেরি কোরো না।

সুভাষের ঠিক মনের মতন হল। তার গুরুকরণ যথার্থ হয়েছে।

কী বলছেন বিবেকানন্দ ? বলছেন, 'আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর আমাদের উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ তাতে তা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করতে পারে। উপনিষদ কী বলে ? সকল জাতির সকল মতের সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল দুঃখী পদদলিতদের উচ্চরবে আহ্বান করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়িয়ে মুক্ত হতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা— এই উপনিষদের মূলমন্ত্র।'

দেশবন্ধু মারীতে এসে বিশ্রাম নিলেন। জ্বর নেমে গেল। কিছুদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। এবার তবে চলো দেরাদুন।

সেখানে যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক সম্মেলন বসেছে। মন খুলে দুটো কথা বলে আসি।

আর দেরাদুনে সেই রাজনৈতিক সম্মেলনেই দেশবন্ধু সর্বপ্রথম ঘোষণা করলেন: 'আমি সাধারণ মানুষের জন্যে স্বরাজ চাই, উচ্চশ্রেণীদের জন্যে নয়। বুর্জোয়াদের আমি গ্রাহ্য করিনা। তারা সংখ্যায় কজন? জনগণের জন্যেই স্বরাজ আর এই স্বরাজ জনগণই অর্জন করবে।'

রাজনৈতিক মঞ্চে দাঁড়িয়ে এই প্রথম উদাত্ত উচ্চারণ: অগণন সাধারণ মানুষের জন্যে স্বরাজ, মুষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীদের জন্যে নয়। আর এই স্বরাজের কর্মযজ্ঞেই কংগ্রেসের আহ্বান।

তারপর পাঞ্জাবে উত্তরপ্রদেশে বহু জায়গায় ঘুরলেন দেশবন্ধু। সংগ্রাম, সংগ্রাম, এখন শুধু মুখোস খুলে দেওয়ার সংগ্রাম। রিফর্মড কাউন্সিল যে একটা ছলনা, মুখোসমাত্র, সেটাই সপ্রমাণ করবার জন্যে কংগ্রেসের ঐ কাউন্সিলে ঢোকা উচিত। ওদের শিল ওদের নোড়া দিয়েই ওদের দাঁতের গোড়া ভেঙে দেওয়া দরকার। আর বর্জন —বর্জন মানে কী? মুখোসটাকে খুলে ফেলে দেওয়াই কি মুখোসের সত্যিকার বর্জন নয়? কংগ্রেস যদি ইলেকশানে দাঁড়ায় নিশ্চয়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে। আর সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে হাতে-কলমে দেখিয়ে দেওয়া যাবে কতদূর কপট এই ব্রিটিশ ব্যুরোক্রেসি। কপটকে শুধু এড়িয়ে যাওয়া নয়, তার কাপট্যকে চোখের সামনে খুলে ধরাই আসল বীরত্ব।

অবশেষে নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে এসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতি হয়ে বসলেন। সেখানে গান্ধির মতবাদের সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের মতবাদের সঙ্ঘর্ষ বাধল। অর্থাৎ কাউন্সিল বর্জন করা না কাউন্সিল অচল করা। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে ইচ্ছে করেই পৌঁছুনো হল না—ডিসেম্বরেই যখন গয়ায় কংগ্রেস বসছে তখন সেখানেই এ প্রশ্নের নিষ্পত্তি হবে। আর গয়া-কংগ্রেসের সভাপতিও দেশবন্ধু।

দেশবন্ধু বুঝলেন হাওয়া তাঁর প্রতিকূলে।

তবু শেষ পর্যন্ত বলা যায় না কী হয়। বুকভরা বিশ্বাস নিয়ে তিনি চললেন গয়া। সুভাষকে সঙ্গে নিলেন। বলতে চাও বলো সেক্রেটারি, বলো মন্ত্রী-যন্ত্রী, কিংবা বলো তাঁর উত্তরসূরী। তাঁর সমস্ত স্বপ্নের প্রকাশমূর্তি।

দেশবন্ধুর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি রাজনৈতিক মনীষা ও রাজনৈতিক বাস্তববোধে অসীম আস্থা সুভাষের। আর যদি ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামাত্মক মনোভঙ্গিটাকে জাগিয়ে রাখতে হয় তাহলে আপাতত কাউন্সিল-আক্রমণটাই মুখ্য উপায়। নিয়তসংগ্রাম ছাড়া স্বাধীনতা কোথায়?

গয়া-কংগ্রেসে দেশবন্ধুর ভাষণ অপূর্ব হল। এক কথায় বলতে হয়, মহিমান্বিত। যেমন বিশদ তেমনি গভীর, যেমন ওজস্বী তেমনি যুক্তিপূর্ণ। ভাবে আবেগে তত্ত্বে তর্কে বাস্তববুদ্ধিতে যুদ্ধনীতিতে—সব দিক থেকে সুনিপুণ। কিন্তু হলে কী হবে, তাঁর মূল প্রস্তাব, কাউন্সিলে ঢুকে গভর্নমেণ্টকে আঘাত হানা, গৃহীত হল না। নো-চেঞ্জাররা দলে ভারি হল। তাদের ভাবখানা এই, মহাত্মাজি বারণ করে গেছেন, আইন অমান্য করতে হলেও কি তাঁকে অমান্য করা চলে? যেই উনি জেলে, চোখের অন্তরালে চলে গিয়েছেন, অমনি তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াটা কিছুতেই শোভন হতে পারে না। কেউ কেউ এমন কথাও বললে, যে-নীতি তিনি সমর্থন করেন নি তাঁর অনুপস্থিতিতে সে-নীতি মেনে নেওয়া বিশ্বাসঘাতকতার সামিল। শ্রীনিবাস আয়াঙ্গার সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন। অসহযোগের ডাকে এডভোকেট জেনারেলের চাকরি ও সি-আই-ই যিনি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন, কংগ্রেস কাউন্সিলে ঢুকুক, কিন্তু সে আসনও নেবে না, শপথও নেবে না, আর এই ভাবেই সে সরকারকে ঘায়েল করবে। নিরুপদ্রব অসহযোগের এ এক রাজসংস্করণ। না, এতটুকুও নয়, গান্ধিবাদের প্রধানতম বাহক-ধারক

রাজাগোপালাচারী বললেন, মহাত্মা যে নিষেধ আরোপ করে গেছেন কিছুতেই তার অন্যথা হতে পারে না। কাউন্সিলে কংগ্রেসের ঢোকা অর্থই অসহযোগের মূল নীতিকে পথভ্রষ্ট করে দেওয়া।

খিলাফতীরা কিন্তু দেশবন্ধুর দলে। তাঁর দলে আরো অনেক দেশনেতা, মতিলাল নেহরু, বিঠলভাই প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, কেলকার, জয়াকর, মুঞ্জে, অভয়ঙ্কর, আলাম, শেরওয়ানি, সত্যমূর্তি, রঙ্গস্বামী, সেনগুপ্ত, শাসমল ও আরো অনেকে। তবু, এত সব সত্ত্বেও, দেশবন্ধু পরাজিত হলেন। গান্ধিভক্তিই জয়যুক্ত হল। দেশবন্ধুর পক্ষে ভোট ৮৯০, বিরোধী পক্ষে ১৭৪৮। বিরোধীপক্ষের মহারথীদের মধ্যে রাজাগোপালাচারী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বল্লভভাই প্যাটেল, সরোজিনী নাইডু, আনসারি, আব্বাস তায়েবজি, প্রকাশম, ছনিচাঁদ, দেশপাণ্ডে, জগদগুরু শঙ্করাচার্য। পট্টভি সীতারামায়া আরো বেশি উদগ্র। তার মতে কাউন্সিলে ঢোকা শুধু অশোভন নয়, দস্তুরমত অসাধু। একতা ভালো সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধুতা আরো ভালো।

কিন্তু দেশবন্ধু অপরাভূয়। তিনি বললেন, আমার প্রস্তাব আজ পরিত্যক্ত হল বটে কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, শিগগিরই একদিন আসবে যে দিন কংগ্রেস বেশি ভোটে আমারই পক্ষে রায় দেবে।

বলে তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে সরে দাঁড়ালেন, কিন্তু কংগ্রেস ত্যাগ করলেন না। তাঁর নীতি নিষ্ক্রিয়তা নয়, সংগ্রামশীলতা। তাই তিনি তৎক্ষণাৎ কিছু গঠন করে তুললেন, তার নাম হল স্বরাজ্যদল। মতিলাল নেহরুও তাঁর কংগ্রেসের সেক্রেটারির পদ ত্যাগ করে দেশবন্ধুর পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'আমাদের কাজ হবে দেশকে বোঝানো কাউন্সিলে ঢুকে সম্মুখ সংগ্রাম করাই স্বাধীনতার স্বার্থে প্রশস্ত। শুধু দেশকে বোঝানো নয়, কংগ্রেসকেও বোঝানো। কাউন্সিলে না ঢোকাটা নিছক গোঁড়ামি, নিছক অর্বাচীনতা, বরং কাউন্সিলে ঢুকে মুখোস ছিঁড়ে

ফেলাটাই সুস্থ রণকৌশল। ভয় নেই,' দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন দেশবন্ধু, 'এক বছরের মধ্যে কংগ্রেসের ভোটের বোঝা আমার দিকে এনে ফেলব। ফেলবই ফেলব।'

দেশবন্ধু কলকাতা ফিরলেন। পরাস্ত হয়েছেন তার জন্যে দুঃখ নেই বরং অদূর ভবিষ্যতেই যে আবার জয়ী হবেন সেই আনন্দের স্বপ্নে ভরপুর।

কিন্তু তাঁর পথে জনমতকে আনতে হলে প্রচারের ব্যবস্থা করা দরকার। সমস্ত দেশি পত্রিকা গান্ধিরই স্তুতিকার, নতুন স্বরাজ্যদলকে তারা সহ্য করতে চাইছে না। দেশবন্ধু সুভাষকে ডাকলেন। বললেন, 'একটা বাংলা দৈনিক বার করো।'

'সম্পাদক কে হবে?'

'কে আবার হবে! তুমি হবে।'

চার পৃষ্ঠার দৈনিক কাগজ বেরুল, নাম 'বাংলার কথা'। সম্পাদক সুভাষচন্দ্র।

'শুধু ছাপানো কথায় হবেনা, সামনাসামনি মুখের কথাও শোনাতে হবে।' আরো বললেন দেশবন্ধু, 'নানা জায়গায় সভার আয়োজন করো। এমনি জনসভা তো বটেই, যেখানে যেখানে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠান আছে, সেখানে সেখানে তাদেরই আওতায় কংগ্রেসি সভা বসাও। সর্বত্র এই আমাদের বক্তব্য হবে, গয়ার সিদ্ধান্ত ভুল, তাকে উলটে দেওয়াই দেশের পক্ষে মঙ্গলকর।'

সুভাষ সহস্রবাহুতে কাজে লাগল। ঘন ঘন সভা ডাকতে লাগল, আজ এখানে, কাল ওখানে, কখনো সাধারণ সভা, কখনো কংগ্রেসি। হ্যাঁ, যদি আমরা একটা রাজনৈতিক বিপদের অবস্থা গড়ে তুলতে পারি তবেই আমাদের স্বরাজলাভের পথ উন্মোচিত হবে। আর কাউন্সিলে ঢুকে যদি আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারি তবে অচিরেই সে বিপন্ন অবস্থার উদ্ভব হবে। রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় দেশবন্ধুর কোনো ভুল হবার কথা নয়।

নো-চেঞ্জাররা লাগল বিরুদ্ধ প্রচারে। তুদলে শক্রতার ভাব প্রবল হয়ে উঠল। অথচ দুই দলই স্বরাজ চায়, দুই দলেরই ব্রিটিশ শাসন নিশ্চল করার সাধনা। একদল বলছে কাউন্সিলে ঢুকে, আরেকদল বলছে কাউন্সিলের বাইরে চুপ করে বসে থেকে।

শক্রুপক্ষের লোক এমন কথাও রটাল যে সি-আর-দাস মন্ত্রী হতে চায় বলেই তার এই কাউন্সিলে ঢোকার পক্ষে এত ওকালতি।

মন্ত্রীত্বের লালসা টাকার জন্যে? তারা জানেনা কী রাজকীয় আয়ের ব্যারিস্টারি তিনি জীর্ণবাসের মত ছেড়ে দিয়ে এসেছেন?

সুতরাং, ওরা যা বলে বলুক, শুধু যা সত্য বলে বুঝেছ তা নির্ভয়ে প্রচার করে যাও। সুভাষকে বাংলার ভার দিয়ে দেশবন্ধু চললেন দক্ষিণ ভারতে। উত্তর প্রদেশের ভার মতিলাল নেহরুর উপর আর বিঠলভাই প্যাটেল ভার নিলেন বোম্বাই অঞ্চলের। বাংলায় যেমন 'বাংলার কথা', তামিলে তেমনি 'স্বদেশমিত্রম' ও মারাঠিতে 'কেশরী'।

সুভাষকে সাহায্য করতে রইল বাংলার স্বরাজ্যপার্টির অন্যান্য সদস্য, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, কিরণশঙ্কর রায়, সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, হেমেন্দ্রনাথ, দাশগুপ্ত, বসন্ত কুমার মজুমদার, সাতকড়িপতি রায় ও প্রতাপচন্দ্র গুহরায়।

দক্ষিণ ভারত গান্ধিবাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ, তাই বলে যুক্তিবাদকে সে কী করে হটাবে? দেশবন্ধু অসহযোগের নতুন মন্ত্র নিয়ে ঘুরতে লাগলেন ত্রিচনোপলি তাঞ্জোর মাদুরা সালেম, আরো কত কাছে-দূরে শহরে-নগরে, আর প্রাঞ্জল যুক্তিতে বোঝাতে লাগলেন তাঁর প্রস্তাবের যথার্থতা। দক্ষিণ ভারত দ্রবীভূত হয়ে গেল।

'আমাকে বলা হয় বিদ্রোহী।' বলছেন দেশবন্ধু, 'তবে বিদ্রোহকে যে আমি সমর্থন করি না তা নয়। সমস্ত অসহযোগ প্রক্রিয়াটাই তো বিদ্রোহ। সেটা একটা নীরব অহিংস বিদ্রোহ, আর আমার অন্তরতম অন্তরে আমি কারু বিদ্রোহী নই। যে কোনো

প্রকারেরই হোক, সমস্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার বিদ্রোহই। সেই সংজ্ঞায় যদি ধরা হয় আমি কংগ্রেসের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি, আমার সম্পর্কে সেই সংজ্ঞা নির্ভুল বলে আমি মেনে নেব। কিন্তু কেউ যদি বলে আমি কংগ্রেসের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাচ্ছি তা আমি মানতে প্রস্তুত নই। আমি কংগ্রেসকে ছাড়িনি, তার থেকে সরে পড়িনি, শুধু তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি। আসলে আমি কোনো বিদ্রোহীই নই, স্বরাজের গন্তব্যে পৌঁছবার জন্যে যে উপায় প্রয়োজনীয় মনে করছি সেই উপায়ই চাইছি অবলম্বন করতে।'

আবার আরেক সভায় বলছেন : 'শুধু কংগ্রেস কেন, ভারতীয় যে কোনো প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমি বিদ্রোহ করব যদি আমি বুঝি আমার সে বিদ্রোহ স্বরাজের পথ সুগম করবে। আমি স্বরাজ চাই। স্বাধীনতা চাই। তার জন্যে আমি সংগ্রামে সমুদ্যত। জীবনে কাপুরুষতা কাকে বলে তা জানিনা। আমি আমার প্রাণ বলি দিতে প্রস্তুত। আজই আরম্ভ করুন, আমাকে পরীক্ষা করে দেখুন, আমি আপনাদের অভিলাষের শেষ পরিমাপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারি কিনা।'

ওদিকে নো-চেঞ্জাররাও কাউন্সিল-প্রবেশের বিরুদ্ধে বিপরীত প্রচার করতে লাগল।

দু দলে একটা রফানিষ্পত্তির কথা উঠল। মৌলানা আজাদের চেষ্টায় এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভাতে ঠিক হল চলতি ১৯২৩ সালের ৩০শে এপ্রিল পর্যন্ত দুদলেরই পালটা প্রচার বন্ধ থাকবে। ততদিন দুদলের অন্যান্য যা করণীয় আছে তাই সাঙ্গ করুক।

এ মীমাংসায় কোনো পক্ষই তৃপ্ত হল না। তাই এপ্রিলে আবার সভা বসল দিল্লিতে। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরু একদিকে, রাজাগোপালাচারী, হাকিম আজমল খাঁ ও সরোজিনী

নাইডু আরেকদিকে—সমবেত চেষ্টা হল যদি সম্মিলিত কর্মপ্রকরণ ধার্য করা যায়। অসম্ভব। নো-চেঞ্জাররা কিছুতেই টলল না। দেশবন্ধুও সরলেন না এক ইঞ্চি।

বৃথা কালক্ষেপে দরকার নেই। তোমরা সব চলে এস। স্বরাজ্যপার্টির সদস্যদের ডাক দিলেন দেশবন্ধু। ইলেকশান কাছিয়ে আসছে, আমাদের পক্ষে প্রচার এখনো অনেক বাকি।

কলকাতায় ফিরে দেশবন্ধু চললেন পূর্ববঙ্গে।

'কি রে, কেমন আছিস?' পুলিশের জমাদার মথুরকে দেখতে পেয়ে প্রসন্ন মুখে সম্ভাষণ করলে।

আজ আর মথুরের পাশ কাটাবার দরকার হল না। কোথাও কোনো একটা চুরি-ডাকাতি হলেই এই জমাদার-প্রভুরা মথুরকে দাগী আসামী বলে ধরে নিয়ে যেত, অপরাধের ছায়া পর্যন্ত নেই তবু আসামীর খোঁয়াড়ে দিত ভিড়িয়ে। এখন কী বিশাল সুরক্ষিত আশ্রয়ে সে আছে, তাকে পাপ-হাতে ছোঁয় এমন কার সাধ্যি? তাই সহজেই সে জমাদারের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। স্বচ্ছ মুখে বললে, 'ভালো আছি।'

'তা আর ভালো থাকবিনে? মহাপুরুষের ঘরে ঠাঁই পেয়েছিস।' জমাদারের গলায় যেন প্রায় ঈর্ষার সুর: 'যা, তুইও মানুষ হয়ে গেলি।'

মথুর নির্ভয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে গেল। একবার পিছন ফিরেও তাকিয়ে দেখল না।

কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে?

দেশবন্ধু সফর থেকে ফিরেই মথুরকে ডাকলেন। মথুর কোথায়? সেই তো সকলের আগে এগিয়ে আসবে, প্রণাম করবে, প্রাথমিক সেবাশুশ্রূষাগুলো সাঙ্গ করবে, তৈরি করে দেবে স্নানের জল। কী আশ্চর্য, মথুর—মথুর গেল কোথায়?

'সে নেই। সে চলে গিয়েছে।' বললেন বাসন্তী দেবী।

'চলে গিয়েছে মানে?' দেশবন্ধু এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

'কে তাড়াল তাকে?' দেশবন্ধু অস্থির হয়ে উঠলেন।

'কেউ তাড়ায়নি, সে নিজেই পালিয়েছে। এক বাক্স রুপোর বাসন চুরি করে নিয়ে পালিয়েছে।'

'চুরি! চুরি করেছে মথুর? এ হতেই পারে না।'

এর পরে আর কথা কী!

নিজেই আবার কথা বললেন দেশবন্ধু। জিজ্ঞেস করলেন, 'ও যে চুরি করেছে তার প্রমাণ কী?'

'প্রমাণ আবার কী! বাক্সভর্তি রুপোর বাসন একটাও নেই আর সঙ্গে-সঙ্গে মথুরও উধাও। তারপর আজ দু'দিন চলে গেল সে ফিরল না।'

'এতেই প্রমাণ হল সে চোর?' দেশবন্ধু যেন বিরক্ত হলেন। বললেন, 'হয়তো রাস্তায় বেরিয়ে গাড়ি-চাপা পড়েছে, মরেছে না হাসপাতালে আছে তা কে জানে। যেহেতু সে বাড়ি ফেরেনি, ফিরতে পারেনি, তাই সে চোর বনে গেল!'

'আমি তখনই বলেছিলাম, স্বভাব যায় না ম'লে। আমার কথাই ঠিক হল।'

শ্রান্তের মতন একটা চেয়ারে বসে পড়লেন দেশবন্ধু। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ নিয়ে থানায় কোনো খবর দেওয়া হয়নি তো?'

'না, না, এ নিয়ে নালিশ কে করতে যাবে?'

দেশবন্ধু আপন মনে বলে উঠলেন, একটু বা অনুশোচনার সুরে, 'ওকে তখন আমার সঙ্গে নিয়ে গেলেই পারতাম। যেই আমার থেকে আলাদা থেকেছে—না, এ আমি বিশ্বাস করি না।' দেশবন্ধু উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে: 'ও নিশ্চয়ই গাড়ি-চাপা পড়েছে, ঠিকানাটা বলে যেতে পারেনি। বেচারার চোর নাম আর ঘুচল না।'

সাত

কংগ্রেসের মধ্যে দুদলে, শোধনবাদী ও সনাতনবাদী, চেঞ্জার আর নো-চেঞ্জারের মধ্যে বিভেদ তুমুল হয়ে উঠল।

তখন নতুন ওয়ার্কিং কমিটির ভাবনা ধরল কোনো মীমাংসায় আসা যায় কিনা। ঠিক হল এই লক্ষ্যে কংগ্রেসের একটা বিশেষ অধিবেশন ডাকা যাক দিল্লিতে। আবুল কালাম আজাদকে করা যাক সভাপতি।

'কাউন্সিল বর্জন করা নিরর্থক।' আজাদ সভাপতির আসন থেকে ঘোষণা করল: 'গত ইলেকশানে আমরা বর্জন-নীতি গ্রহণ করেছিলাম, এখন আগামী ইলেকশানে পরিবর্তিত অবস্থায় আমাদের বিপরীত পন্থা অবলম্বন করা উচিত। আমরা দাঁড়াব, জয়ী হব, যত বেশি সম্ভব আসন নিয়ে ভিড় করব আমরা। অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নীতিকেও পালটাতে হবে। এটা শুধু রাজনীতি নয়, কাজনীতি, উপসর্গ বুঝে চিকিৎসার ব্যবস্থা।'

এদিকে মহম্মদ আলি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চলে এসেছে দিল্লি। সে আজাদের প্রস্তাব সমর্থন করলে। 'তা ছাড়া,' মঞ্চে দাঁড়িয়ে মহম্মদ আলি রহস্যের হাসি হাসল: 'তা ছাড়া স্বয়ং মহাত্মাজি আমাকে খবর পাঠিয়েছেন, দেশের স্বার্থে যদি সঙ্গত হয় তবে কাউন্সিলে ঢোকার ভিত্তিতেই বিভেদ মিটিয়ে ফেলতে হবে।'

'মহাত্মাজির খবর!' সমস্ত সভা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল: 'আপনি পেলেন কী করে?'

'বলতে পারেন কোনো অলৌকিক উপায়ে, বেতারে।' হাসল মহম্মদ আলি: 'কিন্তু খবরটা খাঁটি।'

তখন সহজ হল মীমাংসা। কংগ্রেস তার বর্জন-নীতিতে নিশ্চল থাকল, তবে কংগ্রেসসভ্যদের ব্যক্তিগতভাবে অনুমতি দেওয়া হল তারা ইচ্ছে করলে কাউন্সিলে ঢুকতে পারবে আর ঢুকে ভিতর থেকে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে চালাতে পারবে সংগ্রাম।

'আর সেইটেই সার্থকতর সংগ্রাম।' উল্লাস-উজ্জ্বলকণ্ঠে দেশবন্ধু বলে উঠলেন: 'আমরা আইনসভার টেবিল থেকে কটা রুটির টুকরো কুড়িয়ে নেবার জন্যে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি রিফর্মসকে চিতায় তুলতে। রিফর্মস শুধু একটা মিথ্যার বেসাতি। ইংরেজ যে ভণ্ড, তার যে মুখে এক মনে আর, সেটাই প্রমাণিত করে দেব। যারা চাকরি চাও, সুখসুবিধের ফিকির চাও, তারা আমার সঙ্গে এস না, যারা লড়তে চাও, যারা শত্রুকে তার নিজের অস্ত্রে পরাস্ত করতে চাও, তারা আমার সঙ্গী হও। যে রিফর্মস, যে অরাতি-অসুর আমাদের জীবনের রক্ত শুষে নিচ্ছে তাকে ধ্বংস করাই আমাদের কাজ। আমি কাউন্সিল-প্রবেশটা কংগ্রেসের মূলনীতি হিসেবেই গৃহীত করাতে পারলামনা বটে, কিন্তু যে মীমাংসায় আমরা পৌঁচেছি তাই এখনকার মত যথেষ্ট। আমার জয়ের চেয়েও কংগ্রেসের ঐক্য বেশি দামি।'

'কিন্তু কাউন্সিলে কংগ্রেস যদি মাইনরিটি হয়?'

'যদি আমরা সংখ্যালঘু হই, তাহলে আমি বলে রাখছি,' বললেন দেশবন্ধু, 'কাউন্সিলে আমাদের সিটগুলো খালি থাকবে। আর সে সব শূন্য আসন জ্বলবে অসহযোগের প্রদীপ হয়ে।'

ওদিকে নাগপুরে সুরু হয়েছে পতাকা-সত্যাগ্রহ।

জাতীয় পতাকা নিয়ে মিছিল করে সিভিল লাইনের দিকে যাওয়া যাবে না এই মর্মে পুলিশ এত্তেলা দিয়েছে। যথারীতি জারি করেছে একশো চুয়াল্লিশ ধারার নোটিশ।

হাতে-কাঁধে জাতীয় পতাকা নিয়ে আমরা যেখানে খুশি সেখানে যাব, এ আমাদের মৌলিক অধিকার, কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকেরাও

দৃঢ়সংকল্প হল। শেঠ যমুনালাল বাজাজ দাঁড়াল সেই আন্দোলনের পুরোবর্তী হয়ে। গ্রেপ্তার হল যমুনালাল, বিচারে তার তিন হাজার টাকা জরিমানা হল। জরিমানার টাকা আদায় করতে গভর্নমেণ্ট তার মোটরগাড়ি ক্রোক করলে। নিলামে চড়ালে সে গাড়ি নাগপুরবাসী কেউ কিনতে এল না। তখন সে-গাড়ি বিক্রির জন্যে নিয়ে যাওয়া হল কাথিয়াওয়াড়ে।

পতাকা-সত্যাগ্রহ নাগপুরেই আবদ্ধ রইল না, সর্বভারতীয় আন্দোলনে প্রসারিত হল। অগ্রগ হয়ে দাঁড়ালেন দুই প্যাটেল-ভাই, বিঠলভাই আর বল্লভভাই, সমস্ত প্রদেশ থেকে আসতে লাগল স্বেচ্ছাসেবী। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গোড়া থেকেই এই আন্দোলনে প্রেরণা দিয়েছে, এখন জোগাল উদ্‌যাপনের শক্তি—লোক আর অর্থ, আর পতাকাকে নত না করার প্রতিজ্ঞা।

গভর্নমেণ্ট নরম হতে চাইল। বললে, মিছিল করে যাচ্ছ তো যাও, শুধু একটু অনুমতি নিয়ে যাও।

কিসের অনুমতি? কংগ্রেস যেমন দৃঢ় ছিল তেমনি দৃঢ় রইল। রাজপথ দিয়ে যাব, একা হোক কি মিছিল করে হোক, এ আমার জন্মের অধিকার। হাত আমার রিক্ত কি হাতে আমার পূজার অর্ঘ্য না জাতীয় পতাকা সে আমি বুঝব।

অনুমতির জন্যে শুধু একটা মামুলি আবেদন। গভর্নমেণ্ট বুঝিয়ে বললে, শুধু একটা লেপাফা।

কংগ্রেস বললে, আমি বাতাসে নিশ্বাস নেব এর জন্যে কোনো অনুমতি লাগেনা। নিরুপদ্রবে পথ চলা আমার তেমনি অধিকার। আর জাতীয় পতাকা আমার বুকের নিশ্বাসের চেয়েও প্রিয়তর।

বিঠলভাই দিন ঠিক করে দিলেন। ছকে দিলেন মিছিলের রাস্তা। একেবারে প্রধানতম রাজপথ। প্রশস্ততম শোভাযাত্রা।

কিন্তু কী আশ্চর্য, পুলিশ বাধা দিল না। পতাকাবাহী শোভা-যাত্রা চলে গেল সিভিল লাইন পার হয়ে।

অসহযোগের জয় হল।

অসহযোগের উজ্জ্বলতর জয় দেখাল আকালি শিখেরা, গুরুকা-বাগে। সনাতনপন্থী শিখেরা হচ্ছে উদাসী আর শোধনপন্থী শিখেরা হচ্ছে আকালি। শিখ-মন্দির বা গুরুদ্বারগুলি উদাসীপুষ্ট মোহন্তদের হাতে। সেখানে অনেক অনাচার জমে উঠেছে, তাদের সংস্কার-শোধন দরকার, আকালিদের এই দাবি। আকালিরা চাইছে মন্দিরগুলির তত্ত্বাবধান করতে। এই নিয়ে দুই সম্প্রদায়ে সংঘর্ষ।

আর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধলেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের মজা। এক্ষেত্রে, বলা বাহুল্য, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট মোহন্তদের পক্ষে। আকালিরা যেকালে মৌরসিপাট্টাদারদের বিরুদ্ধে, সেকালে আকালিদেরই দমন করো। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও তো এই মৌরসিরই দাবিদার।

বছর দুই আগে নানকানায় কী ভীষণ হত্যাকাণ্ড ঘটে গেল। রাজভক্ত মোহন্ত তার বাড়িতে একগাদা রিভলভার আর গুলি মজুত করে রেখেছিল। কী হল কে জানে, গুরুদ্বারে সম্মিলিত নিরীহ তীর্থযাত্রীদের উপর গুলিবর্ষণ সুরু হল। প্রায় জালিয়ানওয়ালাবাগ থেকেই পাঠ নেওয়া। অভিযোগ হল মোহন্তর লোকেরাই আকালি তৈর্থিকদের হত্যা করেছে। কিন্তু পুলিশ কই, পুলিশ কী করছে? কর্তাব্যক্তিরা চোখ টিপল আর ঢোঁক গিলল। এই হত্যাকাণ্ড তো পুলিশের মাতব্বরিতে।

গুরুকাবাগের ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাটা আরো স্পষ্ট হল। গুরুকাবাগের মন্দিরপ্রাঙ্গণের একটা গাছ আকালিরা কেটেছে এই অভিযোগে মোহন্ত পুলিশের রক্ষণাবেক্ষণ চাইল। পুলিশের তো কাজই এই, ত্রাণ ও পালন করা, তারা লাঠি উঁচিয়ে দাঁড়াল পথরোধ করে। আকালিরা সত্যাগ্রহ সুরু করল, তাদের মন্দিরে তাদের রয়েছে পূর্ণ অধিকার, শুধু প্রবেশের নয়, পরিচালনার। দরকার হলে তারা নেবে গাছ কেটে।

পুলিশ লাঠি চালাল। আর বীরবিক্রান্ত আকালি শিখেরা, যারা রণরুদ্র ও প্রাণদুর্মদ, দেখাল কাকে বলে অহিংসা। শত লাঠির ঘায়েও একটি আঙুল তুলল না। দেখাল কাকে বলে ধৈর্যের মাধুর্য, সহিষ্ণুতার শান্তি। ইচ্ছে করলে এই আকালির দল পুলিশের গর্বিত লাঠিকে খর্ব করে দিতে পারত, অন্তত বাধাতে পারত একটা খুনো-খুনি। কিন্তু না, যেহেতু আকালিরা অহিংসায় প্রতিশ্রুত, তারা একটা আঁচড় পর্যন্ত কাটল না, স্তব্ধতায় সংহত হয়ে রইল। পুলিশ যে পুলিশ, সে পর্যন্ত ভেবড়ে গেল। এত লাঠি অথচ পালটা একটা কেউ ঢিল পর্যন্ত ছুঁড়ল না।

মহাত্মা বললেন, 'লাঠির নিচে মাথা পেতে দেওয়ার চেয়ে গুলির সামনে বুক পেতে দেওয়া সোজা। যে অসীম বীরত্বে এই আকালি 'জাঠা' লাঠির বাড়ি সহ্য করেছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন এক গৌরবের পরিচ্ছেদ হয়ে থাকবে। কিসের গৌরব? শিখের বীর্যসুন্দর মহত্ত্বের গৌরব।'

গুরুকাবাদেই পুলিশ তার লাঠিচার্জের কারুকার্য সম্পূর্ণ করে নিল। সমস্ত দেশ জুড়েই তারা এখন এই আঙ্গিকে শাসন রচনা করবে।

করুক। কিন্তু আকালি শিখেদের কাছে পুলিশের লাঠি পরাস্ত হল। মারতে মারতেই তারা হার মানল। শত মারেও যে ওদের স্রোত কমে না, পুলিশের হাতেই শুধু ব্যথা ধরে। পুলিশ তখন মার ছেড়ে ধরপাকড় করে জেলে পুরতে লাগল। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের জেল হয়ে গেল আঠারো মাস।

সামরিক বিভাগে কাজ করে এমন কজনকে সত্যাগ্রহের অপরাধে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সামরিক বিচারে তাদের শাস্তিও হয়েছে। খবর পৌঁছুল গুরুকাবাদ থেকে কোথাও তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ট্রেনে করে। বিরাট এক 'জাঠা' রওনা হল সেই সব সত্যাগ্রহীদের সংবর্ধনা করতে, মালা দিতে, খাবার দিতে।

পাঞ্জাসাহেব স্টেশনে তারা এসে জড়ো হল। এখানে ট্রেন থামাও। আমাদের দেখতে দাও। আমরা তাদের জন্যে খাবার নিয়ে এসেছি, তাদের হাতে তা পৌঁছিয়ে দিতে দাও।

পাঞ্জাসাহেব স্টেশনে ট্রেন থামবে না।

না, থামবে। থামাতে হবে। আমরা এই বসে পড়লাম লাইনের উপর।

আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা নয়। দস্তুরমত দেখেশুনে বুঝে হিসেব করে ট্রেন আসতে লাগল হু হু শব্দে। না, পাঞ্জাসাহেবে থামল না।

কিন্তু কিছুদূর গিয়ে তাকে থামতে হল। তার আগেই কতগুলো লোককে ট্রেন রক্তমাংসের পিণ্ড করে ছেড়েছে।

তবু কিছুতেই দমল না আকালিরা। আইন পাশ করিয়ে ছাড়ল। গুরুদ্বার পরিচালনার আইন। জনমতের জয় হল। ক্ষান্ত হল আন্দোলন।

তবু শান্তি নেই। নাভার মহারাজাকে গদিচ্যুত করা হল। গভর্নমেণ্ট অবশ্যি কতগুলি কারণ দেখাল কিন্তু প্রবন্ধক-সমিতি তা মানতে চাইল না। সমিতির মতে মহারাজা শিখ ও স্বদেশপ্রেমিক বলেই গভর্নমেণ্টের বিরাগভাজন হয়েছেন, অতএব মহারাজকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নতুন আন্দোলন চালাও।

হ্যাঁ, সভা করো, বক্তৃতা দাও। 'অখণ্ড পন্থ' পাঠ করো।

বক্তৃতা দিলেই রাজদ্রোহ। 'অখণ্ড পন্থ' পড়লেও তাই। সুতরাং যারাই মহারাজার পক্ষে বক্তৃতা দেবে বা পাঠ করবে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হবে।

প্রত্যহ পঁচিশ জনের 'জাঠা' যেতে লাগল নাভায়, নির্দেশ অমান্য করে যেতে লাগল জেলে।

শেষে যেতে লাগল পাঁচ শো জনের 'জাঠা', শহিদি-জাঠা। এবার আর পুলিশ গুলি না ছুঁড়ে পারল না। ডাক্তার কিচলু ও

আচার্য গিদোয়ানি গ্রেপ্তার হল। কিচলুকে কদিন পরে ছেড়ে দিলেও গিদোয়ানিকে ধরে রাখল একবছর।

হাজার হাজার আকালির শোভাযাত্রা অব্যাহত রইল। এ শোভাযাত্রার সমাপ্তি কারাবাসে।

ভারতের সর্বত্রই গান্ধিবাদ অভ্যর্থিত হল না। ডাঙ্গে বোম্বাইয়ে কজন বন্ধু ও সহচর নিয়ে একটা ক্লাব খুললে, একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা বের করলে, যার বিষয় ও বক্তব্য হচ্ছে সমাজতন্ত্র। এই থেকেই কম্যুনিজম বা সাম্যবাদের গোড়াপত্তন হল।

আর বাংলা—বাংলাও যেন পুরোপুরি অহিংস ও নিষ্ক্রিয় থাকতে রাজি নয়। তার যুদ্ধ চাই। সাহসী বলে বীর বলে আত্মোৎসর্গকারী অগ্নিহোত্রী বলে চিহ্নিত হওয়া চাই। বিপ্লব ছাড়া তার মন ভরে না।

দেশবন্ধুর ভূমিকাও এই যুধ্যমানতার ভূমিকা, যদিও তা অহিংসার ক্ষেত্রে।

কলকাতায় ফিরেই দেশবন্ধু তাড়াতাড়ি বাংলার মফস্বলে ঘুরে এলেন যাতে আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থীকেই পাঠানো হয় কাউন্সিলে।

ব্যক্তিত্বের ইন্দ্রজালে অঘটনকে ঘটিয়ে তুললেন। কোথায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, কোথায় নবীন ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। একজন ভারতীয় রাজনীতিতে রাজস্বরূপ, আরেকজন রাজনীতিতে সম্পূর্ণ অর্বাচীন। কিন্তু যা কেউ ভাবেনি তাই সত্য হল। ভোটে বিধান রায়ের কাছে সুরেন্দ্রনাথ হেরে গেলেন।

হেরে গেলেন এস আর দাশ, বাংলার এডভোকেট জেনারেল, সাতকড়িপতি রায়ের কাছে। এস আর দাশ স্বনামধন্য রাজপুরুষ, কত তাঁর সমারোহ, হেরে গেলেন এক ত্যাগব্রতী দেশসেবকের কাছে। আর স্যার নীলরতন সরকার, অগ্রগণ্য চিকিৎসক, তাঁকে হারিয়ে দিল অল্পখ্যাত বিজয়কৃষ্ণ বসু।

দিকে দিকে স্বরাজ্য পার্টির জয় হতে লাগল। স্বরাজ্য পার্টির সভ্যেরাই হয়ে গেল সংখ্যাগুরু।

সুতরাং বাংলার লাট, লর্ড লিটন, মন্ত্রীসভা গঠন করবার জন্যে দেশবন্ধুকে আহ্বান করলেন। সে আহ্বান সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করলেন দেশবন্ধু। লিখলেন, স্বরাজ্যপার্টির সভ্যদের সংকল্পই হচ্ছে রিফর্মস অ্যাক্ট তাদের যে অধিকার দিয়েছে সে অধিকারের বলে ডায়ার্কি বা দ্বৈতশাসন অচল করে দেওয়া। যদি তারা মন্ত্রীত্ব নেয় তাহলে এই সংকল্পের উদ্‌যাপন হয় না। অবশ্য মন্ত্রীত্ব নিয়ে ভিতর থেকে বাধা সৃষ্টি করে শাসনব্যবস্থা যে বানচাল করে দেওয়া যায় তারা সেটা জানে কিন্তু সে আচরণ সদাচরণ হবে না। যে মন্ত্রীত্ব আপনার হাতের দান তা একবার গ্রহণ করে পরে তাকেই প্রতিরোধের অস্ত্র করে তোলা অসঙ্গত হবে। সুতরাং আপনার অনুরোধ রাখতে পারছি না। দেশের জাগ্রত চেতনা এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন চায়, অন্তত শাসকবর্গের হৃদয়ের কিছু পরিবর্তন, যার ফলে তারা সহযোগিতার অকুণ্ঠ হাত স্বচ্ছন্দে বাড়িয়ে দিতে পারে। যতদিন তা না হচ্ছে ততদিন আপনার অনুরোধ রাখা অসম্ভব হচ্ছে। তবু সংবিধান অনুযায়ী আপনার এই আহ্বানের জন্যে ধন্যবাদ।

কোকনদে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই কাউন্সিল-প্রবেশ নীতি সরকারি ভাবে সমর্থিত হল। নো-চেঞ্জারদের বেশি হৈ চৈ করতে দেখা গেল না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অনুপস্থিত, রাজাগোপালাচারী ও বল্লভভাই প্যাটেল দু জনই মৌনে অবস্থান করলেন। একমাত্র শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী বজ্রকণ্ঠে বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কিছু ফল হল না। সভাপতি মহম্মদ আলির সেই মন্ত্রই কার্যকর হল—মহাত্মাজি আমার কানে কানে বলে দিয়েছিলেন, যদি মনে করো কাউন্সিলে ঢুকেই বিরোধিতা ফলপ্রসূ হবে, আমি সম্মত আছি।

দেশবন্ধু তাঁর কথা রাখলেন। বলেছিলেন এক বছরের মধ্যে

কংগ্রেসকে দিয়ে কাউন্সিল প্রবেশ-নীতি গ্রহণ করাব, তাই করলেন।

এদিকে ইংরেজের যা কূটকৌশল, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের বারুদে আগুন ধরাল। জায়গায় জায়গায় দাঙ্গা বেধে গেল, মুলতানে, অমৃতসরে, দিল্লিতে। মুসলমানেরা নিজেদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান জোরদার করতে চাইল, হিন্দুরা চালাল 'সংগঠন' আর 'শুদ্ধি' যার পুরোধা হলেন স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। হিন্দুসমাজে যারা অবনত তাদেরকে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে সমান অধিকার দিতে হবে,—তাই সংগঠন, আর যারা নানা বিপর্যয়ে পড়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে তাদের ফের হিন্দুত্বে প্রতিষ্ঠিত করা—তাই শুদ্ধি।

বাংলাতেও এই সাম্প্রদায়িক কলহ করাল ছায়া ফেলেছে। যাতে এই ছায়া না সর্বস্তরে বিস্তীর্ণ হয় তারি জন্যে দেশবন্ধু সতর্ক হতে চাইলেন। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা চুক্তি ঘটালেন যার নাম হল বেঙ্গল প্যাক্ট। চাইলেন কোকনদের কংগ্রেস এই প্যাক্টের উপর তার সমর্থনের স্বাক্ষর রাখুক।

দেখা গেল এই প্যাক্টে মুসলমানদের সুবিধে কিছু বেশি দেওয়া হয়েছে। সেটা কংগ্রেসের মতে জাতীয়তার পরিপন্থী। সুতরাং ঐ প্যাক্ট বাতিল করো।

'ডিলিট দি বেঙ্গল প্যাক্ট, ডিলিট দি বেঙ্গল প্যাক্ট—' কংগ্রেস উচ্চ ঘোষে কোলাহল করে উঠল।

'কিন্তু আমি বলে যাচ্ছি, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তি ছাড়া ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকে ধ্বংস করা অসম্ভব। আর মুসলমানকে যদি আশ্বস্ত না রাখা যায় সে কিসের আকর্ষণে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবে? মুসলমানের সন্তোষেই আন্দোলনের সাফল্য।'

অরণ্যে রোদন মাত্র হল। বেঙ্গল প্যাক্ট ছুঁড়ে ফেলে দিল কংগ্রেস। পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানের উপায় হিসেবে

লাজপত রায় ও আনসারি অনুরূপ প্যাক্ট তৈরি করেছিল, তাও সরাসরি অগ্রাহ্য হল।

কে জানে তখন থেকেই কংগ্রেস এ ব্যাপারে সক্রিয় মনোযোগ দিলে আত্মীয়-কলহের বিষ বহুদূর সঞ্চারিত হত কিনা। হত কিনা দেশবিভাগ।

কে জানে হয়তো চিরকালের জন্যে দুই ভাই ঐক্যবদ্ধই থেকে যেত।

দেশবন্ধু গর্জে উঠলেন : 'বাংলাকে বাংলার মতই ভাবতে দেওয়া হোক। তার সমাধানের চাবি তার নিজের হাতে।'

আট

উনিশ শো চব্বিশের বারো জানুয়ারি গোপীনাথ সাহা আর্নেস্ট ডে-কে খুন করল।

ডে সকালবেলা বেড়াচ্ছিল চৌরঙ্গি ধরে। পার্ক স্ট্রিট আর চৌরঙ্গির মোড়ে একটা দোকানের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে প্রদর্শিত জিনিসগুলি দেখছিল, তার পাঁচ-ছ হাত দূরে দাঁড়াল গোপীনাথ। পরনে ধুতি, গায়ে খাকি শার্ট, পায়ে কালো জুতো, একটি নিরীহ যুবক। ডে ভাবল সেও বুঝি তারই মত প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছে।

আর গোপীনাথ দেখল এই সেই দুর্ধর্ষ পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্ট।

গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ। প্রথম গুলি ভ্রষ্ট হল। চমকে পাশ ফিরে তাকাল ডে। দ্বিতীয় গুলিতে ভুল হল না, ডে ফুটপাতে লুটিয়ে পড়ল। সন্দেহের অতীত করে রাখবার জন্যে শায়িত দেহে আরো কটা গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ।

ভাবেনি যে পালাবার জন্যে তাকে ছুটতে হবে। ঐ ভোরে কটা লোকই বা রাস্তায় চলাচল করছে। তাই হাওয়া-খাওয়া ভঙ্গিতেই হাঁটতে সুরু করল। কিন্তু, না, একটা ট্যাক্সি তার পিছু নিয়েছে। ট্যাক্সিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল গোপীনাথ, ট্যাক্সিকে নিরস্ত করল। ঢুকল রাসেল স্ট্রিটে। তারপর খানিকটা এলোমেলো ঘুরে আবার এল পার্ক স্ট্রিটে। দেখল একটা প্রাইভেট মোটর দাঁড়িয়ে আছে। বললে, আমাকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে এস না। ড্রাইভার অস্বীকার করলে। তখন ড্রাইভারকে গুলি করল গোপীনাথ। ড্রাইভারের কোমরের বেল্টে সে গুলি লাগল। ড্রাইভার অক্ষত রইল।

তখন গোপীনাথ ছুটল। তার পিছনে একটা জনতাও উদ্ধাবিত হয়েছে।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে একটা লোকের হাতে প্রায় ধরা পড়ছিল গোপীনাথ, তার বাহুতে গুলি বিঁধিয়ে আবার ছুটল রয়েড স্ট্রিটের দিকে। ককবার্ন লেন হয়ে রিপন স্ট্রিটে পৌঁছুল। সেখান থেকে ওয়েলেসলি স্ট্রিটে। দেখল একটা ফিটন দাঁড়িয়ে আছে। ফিটনের পাদানিতে পা রাখতে যাচ্ছে, ফিটনওয়ালা বললে, গাড়ি ভাড়া যাবে না। বাড়তি ভাড়া দেব, তবুও না।

একটু বচসা মতন করতে গিয়েই হয়তো মনোযোগ শিথিল হয়েছিল, একটা লোক পিছন থেকে এসে জাপটে ধরল, মাটিতে পড়ে গেল গোপীনাথ। কোত্থেকে একটা কনস্টেবল এসে জুটল, দৃঢ় হাতে গোপীনাথকে বন্দী করলে।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াল গোপীনাথ। পাতলা ছিপছিপে শরীর, শামলা রঙ, মুখে কৈশোর-কমনীয়তা, চোখ দুটি উদাসীন। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ। পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল হয়তো, নয়তো আর কারু প্রহারের ফল।

থেকে থেকে শুধু একজনের দিকে তাকাচ্ছে গোপীনাথ। সে আর কেউ নয়, অদূরে দাঁড়ানো চার্লস টেগার্ট।

পাবলিক প্রসিকিউটর যথারীতি সাক্ষী সাজাচ্ছে। একজন গোপীনাথকে সনাক্ত করে বললে, 'হ্যাঁ, আমি এই লোকটাকে লালবাজারের সামনে ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। একদিন একটা লোকের সঙ্গে বউবাজার স্ট্রিটের একটা বাড়িতে তাকে ঢুকতে দেখলাম।'

'মিথ্যে কথা।' কাঠগড়া থেকে চেঁচিয়ে উঠল গোপীনাথ: 'আমি একাই ঘুরে বেড়াতাম, আমার কোনো দিন কোনো সঙ্গী ছিল না। টেগার্ট সাহেবকে খুন করব এ আমার একার সংকল্প। টেগার্ট সাহেবকে আমি ভালো করেই চিনতাম কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য

আমি ভুল করে এক নিরীহ ভদ্রলোককে খুন করে বসেছি। ভদ্রলোককে ঠিক টেগার্ট সাহেবের মতই দেখতে, তাই আমার এই ভুল হয়েছে। ভগবানের দয়ায় টেগার্ট সাহেব বেঁচে গেছেন আর আমার দুর্ভাগ্য আমার দেশের শত্রুকে আমি শেষ করতে পারিনি।'

টেগার্ট বুঝি কোণে দাঁড়িয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসল।

তার দিকে চোখ পড়তেই ঝলসে উঠল গোপীনাথ: 'টেগার্ট সাহেব নিজেকে নিরাপদ মনে করতে পারেন কিন্তু তিনি নিরাপদ নন। আমার অসম্পূর্ণ কাজ সাঙ্গ করবার জন্যে নিশ্চয়ই আর কেউ এগিয়ে আসবে।'

ম্যাজিস্ট্রেট গোপীনাথকে হাইকোর্টের দায়রায় সোপর্দ করলে। করবার আগে একবার জিজ্ঞেস করলে গোপীনাথকে: 'কোনো বিবৃতি দেবে?'

গোপীনাথ বললে, 'কোনো প্রয়োজন নেই।'

'সাক্ষী দেবে?'

'কোনো প্রয়োজন নেই।'

হাইকোর্টের দায়রার বিচারপর্ব শেষ হলে, শাস্তির শেষ রায় উচ্চারিত হবার আগে গোপীনাথ বলে উঠল: 'আজ আমার জীবনে এক শুভ দিন। আমার মা আমাকে তাঁর বুকে বিশ্রাম নেবার জন্যে ডাকছেন, আমি আমার মায়ের কাছে ফিরে যাব। রোজ খবরের কাগজে পড়তাম আমাদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে টেগার্ট সাহেব কী অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। লোকের মুখেও অজস্র নির্যাতনের কাহিনী শুনতাম। ভাবতে-ভাবতে আমার মাথা গরম হয়ে উঠত। আমি খেতে পারতাম না, ঘুমুতে পারতাম না, সমস্ত রাত বাড়ির ছাতে পাইচারি করে বেড়াতাম। এমনি অবস্থায় একদিন মায়ের ডাক শুনলাম, টেগার্টকে অনুসরণ করো, ওকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দাও। কিন্তু আমার ভুল হল। আমি টেগার্ট মনে করে এক নির্দোষ সাহেবকে খুন করলাম।

সাহেব মাত্রই তো আমার শত্রু নয়, শুধু টেগার্ট আমার শত্রু। ভুল করে এক নির্দোষ সাহেবকে খুন করেছি বলে আমি দুঃখিত কিন্তু আমি আরো দুঃখিত, টেগার্ট এখনো বেঁচে আছে বলে।'

সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়ে গোপীনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কে এ প্রাণবান ছেলে! নির্ভীক, আত্মবীর, এ কার মাতৃ-আরাধনা!

একটি মাত্র মুহূর্ত। তার পরেই নেমে এল বাস্তবের রূঢ় স্পর্শ। জজ ফাঁসির হুকুম দিলেন।

এতটুকু ম্লান হল না গোপীনাথ। কাঠগড়া থেকে নেমে যাবার আগে বললে দৃপ্ত স্বরে: 'আমার দেহের প্রতি রক্তবিন্দু ভারতবর্ষের প্রতি ঘরে স্বাধীনতার বীজ বপন করুক।'

মাকে শেষ চিঠি লিখল: মা, প্রতি ঘর আমার মায়ের মত মায়ের স্পর্শে পবিত্র হোক আর প্রত্যেক মায়ের কোলে আমার মত ছেলে জন্মাক।

ফাঁসির আসামীর জন্যে নির্দিষ্ট রুদ্ধশ্বাস অন্ধকূপের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে গোপীনাথ, কিন্তু মুখমণ্ডল সব সময়েই প্রসন্ন তাতে এমন একটা দিব্য দ্যুতি যেন জীবনধারণটা কত বড় গরিমার, কত বড় আনন্দের ব্যাপার। ভাগ্যিস সে জন্মগ্রহণ করেছিল, বেঁচেছিল এ কটা দিন—আবার বাঁচতে চলেছে আরেক মহাদেশে, মুক্তির মহাদেশে, আর মৃত্যু বুঝি সেই দেশে যাবারই বহির্দ্বার।

ফাঁসির আগের রাত খুব ভালো ঘুম হল গোপীনাথের। ভোর-বেলা উঠে মনে হল, আজ না জানি কোথায় তার যাবার দিন! ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটু পরেই তার ফাঁসি হবে, ট্রেন স্টেশনে এই এসে পড়ল বলে।

তাড়াতাড়ি স্নান-টান সেরে তৈরি হয়ে নিল গোপীনাথ। ওজন নিয়ে দেখা গেল, আশ্চর্য, পাঁচ পাউণ্ড বেড়েছে। মৃত্যুভয়ে লোক শুকিয়ে যায়, গোপীনাথের উলটো, তার স্বাস্থ্যসঞ্চয় হয়েছে।

কারুর সাহায্য লাগল না, গোপীনাথ একাই এসে দাঁড়াল প্ল্যাটফর্মে, ফাঁসিমঞ্চে। যত দেবদেবীর নাম মনে ছিল আওড়াতে লাগল, শেষে যখন ট্রেন এসে দাঁড়াল, দড়ির ট্রেন, গার্ডের সিগন্যাল পেয়ে হেঁচকা টানে স্টার্ট দিল, তখন কণ্ঠ বিদীর্ণ করে বেরুল শেষ দেবতার নাম—বন্দে মাতরম।

বাংলার কংগ্রেস কি এই বীর বালকের বন্দনা করবে না? তার পথ বা পদ্ধতি সে সমর্থন না করতে পারে, তাই বলে তার সাহস তার বীর্য তার দীপ্তিমান চরিত্র, সর্বোপরি মহত্তম আদর্শের জন্যে প্রাণোৎ-সর্গের মহত্ত্বকে সে প্রশংসা করবে না?

কিন্তু সে কথা পরে।

উনিশ শো তেইশে ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল য়্যাক্ট পাশ হয়েছে। এটা, সন্দেহ কী, স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিরই কীর্তি, দেশবাসীকে শাসন পরিচালনা করবার এই প্রথম স্বাধীন সুযোগ দেওয়া। স্বরাজ্যপার্টি ইলেকশন লড়ল ও সংখ্যায় গরীয়ান হয়ে জয়লাভ করল। তখন 'সেপারেট ইলেক্টরেট,' অর্থাৎ হিন্দুর ভোট হিন্দুর জন্যে, মুসলমানের ভোট মুসলমানের জন্যে। দু দলের থেকেই স্বরাজ্যপার্টির লোকই সগৌরবে বেরিয়ে এল। প্রথম মেয়র নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু, ডেপুটি মেয়র শহিদ সারওয়ার্দি। আর চিফ একজি-কিউটিভ অফিসর একজন সাতাশ বছরের যুবক, সুভাষচন্দ্র বসু।

সুভাষচন্দ্রকে এমন একটা শক্তিশালী পদে নির্বাচিত হতে দেখে বাংলা সরকারের বুকটা ফেটে যেতে লাগল। কিন্তু উপায় নেই, নতুন আইনের মর্দাযা রাখবার জন্যে কিল খেয়েও হজম করতেই হবে।

সুভাষের পরিচালনায় বেরিয়েছে ইংরেজি দৈনিক, ফরোয়ার্ড, কর্পোরেশনের নতুন দায়িত্বের দরুন কাগজের থেকে তাকে সরে দাঁড়াতে হল। আর কেউ দেখবে ফরোয়ার্ড, দেশবন্ধু বললেন, সুভাষ এখন তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কলকাতাকে গড়ে তুলুক।

কলকাতা উঠলেই বাংলা দেশ উঠবে, আর বাংলা বাঁচলেই ভারতের উজ্জীবন।

কাউন্সিলে দেশবন্ধুর মন্ত্র সংহার, কর্পোরেশনে দেশবন্ধুর মন্ত্র সংগঠন। এখানে 'ভেঙে ফেল' নয়, এখানে শুধু 'গড়ে তোলো', 'বিশাল করে তোলো।'

কাউন্সিলার, অলডারম্যান, মেয়র সবাই খদ্দর পরে অফিসে আসতে লাগল। খদ্দরই তখন অফিসি পোশাক, কর্মচারীদেরও সেই পরিধেয়। সবাই যেন কলঙ্কমোচনের ব্রতে শুভসাধনের সংকল্পে শুভ্রশুদ্ধ হয়েছে। সকলেই আমরা সেবার ব্রতে দীক্ষিত, চিত্তের সেই প্রসন্নতাই যেন বাইরে এই বিমলশ্রী ধারণ করেছে।

প্রাথমিক ভাষণে দেশবন্ধু বললেন, 'ভারতবর্ষের আদর্শ চিরকাল দরিদ্রসেবা, দরিদ্রকে নারায়ণজ্ঞানে সেবা আর সেই সেবাই পূজার নামান্তর। তার চোখে ভগবানই দরিদ্রের বেশ ধরে এসেছেন পৃথিবীতে। আমিও তাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এই দরিদ্রসেবাতেই চালিত করব। যদি কিছু পরিমাণেও আমরা এই প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারি তবেই আমাদের কর্পোরেশনে আসা সার্থক হবে।'

তাঁর প্রধান কর্মাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র। আর সুভাষের কাছে কর্ম শুধু সম্পাদনার বিষয় নয়, কর্ম সাধনার বিষয়। সে কেবল কর্মী নয়, সে কর্মযোগী। তার সমস্ত কর্মপ্রেরণার পিছে অধ্যাত্মপ্রেরণা।

কী বলছেন বিবেকানন্দ? বলছেন: 'লড়াই করলুম কোমর বেঁধে—এ আমি খুব বুঝি। আর যে বলে, কুছ পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি—তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার। তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা। আর যেগুলো খালি 'বাবা রে এগিয়োনা, ওই ভয়, ওই ভয়'—ডিসপেপটিকগুলো—প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনের এত জোর যে, ঘোর ডিসপেপসিয়া কখনো আমায়

কাপুরুষ করতে পারবেনা। কাপুরুষদের আর কি বলবো, কিছুই বলবার নেই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনো কোনো কাজ থেকে হটেন নি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেনি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিনমিনে, ভিনমিনে, ছেঁড়া ন্যাতা তমোগুণ আর নরককুণ্ড আমার চক্ষে দুই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর।' আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই—'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা'—এই ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মত, যে আমায় বুঝবে।'

আর কত ছেলেবেলা থেকেই সুভাষের এই সেবার্চনা।

'যখন জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ অভিন্ন তখন জীবের সেবা ও ঈশ্বরে প্রেম দুই একই। বিশেষ এই, জীবকে জীববুদ্ধিতে যে সেবা করা হয় তা দয়া, প্রেম নয়, আর আত্মবুদ্ধিতে যে জীবের সেবা করা হয় তা প্রেম। আত্মা যে সকলেরই প্রেমাস্পদ তা শ্রুতি, স্মৃতি, প্রত্যক্ষ, সর্বপ্রকার প্রমাণ দ্বারাই জানা যায়। বৈরাগ্যবান ব্যক্তির কাছে আত্মা জীবাত্মা নয়, সর্বব্যাপী সর্বান্তর্যামী, সকলের আত্মারূপে অবস্থিত সর্বেশ্বর। অদ্বৈতনিষ্ঠ আমরা, আমাদের জীববুদ্ধি বন্ধনের কারণ। সুতরাং আমাদের অবলম্বন—প্রেম, দয়া নয়। আমরা দয়া করিনা, সেবা করি। কাউকে দয়া করছি, এ অনুভব আমাদের নেই, তার পরিবর্তে আমরা সকলের মধ্যে প্রেমানুভূতি ও আত্মানুভব করে থাকি।'

কর্পোরেশনের অধীনে প্রথমেই একটা শিক্ষাবিভাগ খোলা হল, সারা শহরে স্থাপন করা হল অনেকগুলো অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল, শুধু ছেলেদের জন্যে নয়, মেয়েদের জন্যেও। নিরক্ষরতাই তো পরবশ্যতার আশ্রয়, আর গৃহের আসল যে আলো সে তো শিক্ষার আলো, বাইরের আলো নিবে গেলেও যাতে দেখা যায়। খোলা হল

স্বাস্থ্যবিভাগ, পাড়ায় পাড়ায় বসানো হল ডিসপেনসারি যাতে গরিবেরা বিনামূল্যে পেতে পারে চিকিৎসা, পেতে পারে ডাক্তারি পরামর্শ। শুধু রোগের প্রতিকার নয়, রোগের প্রাদুর্ভাবের প্রতিষেধ তৈরি করো। নির্ভেজাল খাদ্য জোগাও, আর তা শস্তা দরে। দুধ সরবরাহের ব্যবস্থা করো। সেই সঙ্গে বস্তির উন্নয়ন। উন্নয়ন যানবাহনের। আর পর্যাপ্ত জল দাও সকলকে। সব মিলিয়ে কলকাতাকে অমল-উজ্জ্বল করে তোলো। চারদিকে মঙ্গলের শঙ্খ বাজাও।

আর এ সমস্ত চারুকর্মের দক্ষ কারুকার সুভাষ।

ভারতীয় মহাপুরুষদের নামে রাস্তা ও পার্কের নামকরণ করো। মিউনিসিপ্যালিটি চিরকাল লাট-বড়লাট ও সরকারি হোমরা-চোমরাদের অভিনন্দন জানিয়েছে, এবার থেকে দেশবরেণ্যদের অভ্যর্থনা করো—মহাত্মা গান্ধিকে, পণ্ডিত মতিলাল নেহরুকে, বল্লভভাই প্যাটেলকে।

কিন্তু মহাত্মা--জেলে মহাত্মার সঙ্কটাপন্ন অসুখ। তাঁর এপেনডিসাইটিস হয়েছে। খবর পাওয়া গেল বারোই জানুয়ারি তাঁর অপারেশন হবে। অপারেশন করবে ইংরেজ ডাক্তার, কর্নেল ম্যাডক। সমস্ত দেশ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগল, অস্ত্রোপচারের ফল যেন শুভ হয়, মহাত্মা যেন সেরে ওঠেন।

আর ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের ভয়, ফল অশুভ হলে কর্নেল ম্যাডকের অস্ত্রাঘাতের কী-নাজানি ব্যাখ্যা করে ভারতবর্ষ।

যাই হোক, অপারেশন ভালো ভাবেই হল আর উনিশ শো চব্বিশের পাঁচুই ফেব্রুয়ারি, মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার বহু আগেই, গভর্নমেণ্ট তাঁকে খালাস দিয়ে দিল।

ছাড়া পেয়ে গান্ধি বোম্বাইয়ের কাছে জুহুতে গেলেন বিশ্রাম করতে। দেশবন্ধু আর মতিলাল নেহরুকে ডেকে পাঠালেন কাউন্সিল-প্রবেশের নীতিটা আরেকবার যাচাই করে দেখতে।

কাউন্সিলে স্বরাজ্যদলীদের কৌশল কৃতকার্য হয়েছে, বিশেষত

বাংলায় আর মধ্যপ্রদেশে। শাসনকাণ্ডের যে বিভাগগুলো 'রিজার্ভড' বা খোদ লাটসাহেবের অধীন, তাদের ছোঁয়া যাবে না, কেননা তারা ভোটের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু যে বিভাগগুলো 'ট্রানস-ফারড' বা মন্ত্রীমহোদয়দের অধীন, তা ভোটে ফেলে ঐ দুই প্রদেশ একেবারে নস্যাৎ করে দিল। মধ্যপ্রদেশে তো সমস্ত বাজেটটাই বাতিল হয়ে গেল। বাংলায় স্বরাজীরা মন্ত্রীদের মাইনেই নাকচ করে দিল। এ সব নাকচ করবার পর গভর্নর অবশ্য তার বিশেষ ক্ষমতার বলে 'ভিটো' করে দিতে পারত। 'ভিটো' করলে তো এই দাঁড়ায় প্রাক-রিফর্ম দিনের মত গভর্নরই রাজ্য চালাচ্ছে, মন্ত্রীরা সব কাষ্ঠ পুত্তলী, বড়জোর নিশ্চল সঙ। বাংলার গভর্নর রিফর্মসকে সেই উপহাস্য পর্যায়ে নিতে যেতে চাইল না। মন্ত্রীরা বিদেয় হল।

তাই দেখ কাউন্সিল বর্জন করে কংগ্রেস কিছুই করতে পারেনি, শুধু বাজেমার্কা কতগুলো লোককে মজা লোটবার সুবিধে করে দিয়েছে, আর এইবার কাউন্সিলে ঢুকে স্বরাজীরা কত বড় জয়ের মুকুট মাথায় পড়ল। সরকারের হারে জনগণের সে কী উল্লাস! আর উল্লাসই তো সংগ্রামের পরম রসায়ন।

যত উল্লাস তত সংগ্রাম, যত সংগ্রাম তত উল্লাস।

সেবাও তো সংগ্রামেরই অঙ্গ। ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম, দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সংগ্রাম নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে। দেশবাসী যদি সুস্থ, শিক্ষিত ও শক্তিশালী না হয়, তা হলে স্বাধীনতার জন্যে সৈন্য হবে কী করে? পাছে স্বাধীনতার সৈন্য হয় সে ভয়েই তো বিদেশী গভর্নমেণ্ট দেশের লোককে রেখে দিয়েছে অন্ধকারে, অক্ষর-হীনতায়, রেখে দিয়েছে দারিদ্র্যের পঙ্ক-পল্বলে, রোগের শোকের অভাবের তাড়নার মধ্যে।

তারই নিরাকরণের আপ্রাণ চেষ্টায় সুভাষ রাত-দিন খাটছে। সেই সকালে অফিসে ঢুকছে, বাড়ি ফিরতে-ফিরতে কখনো প্রায় মাঝরাত। কেননা কর্পোরেশনের ভিতরে-বাইরে পরিদর্শনের

কাজটাও তো তারই। তাই সবাই ঠিক সময়মত অফিসে আসে, কাজে মন লাগায়, ফাঁকি দিতে কারু ইচ্ছে করে না। সুভাষ এমনই প্রিয় ও প্রীতিস্নিগ্ধ যে ওর সমস্ত কথা নির্বিরোধে পালন করতে সবাই উৎসাহ পায়। সুভাষের উপস্থিতিটাই উৎসাহ।

কিন্তু চিফ ইঞ্জিনিয়র কোটস বুঝি একটু অসতর্ক। সুভাষের সামনেই সিগারেট খাচ্ছে।

সুভাষ গম্ভীর মুখে বললে, 'ইজ ইট প্রপার, মিস্টার কোটস, টু স্মোক বিফোর এ সুপিরিয়র অফিসর ?'

'সরি।' কোটস তৎক্ষণাৎ সিগারেট ফেলে দিল।

ঢিলেমির ঢালুতট দিয়ে কোনো কিছুই বয়ে দিতে দেবে না সুভাষ। সময়নিষ্ঠা, তৎপরতা, সচেষ্টতা তো নয়ই, না, সৌজন্যও নয়। শৈথিল্যই সব চেয়ে বড় পাপ। মরে থাকাই অশুচিতা। কাজ করছি এ ভাব মনে না রাখলেই অপরিমেয় কাজ করতে পারবে। না, কাজ নয়, প্রাণের আনন্দে আত্মবিকাশ করছি।

কোটস টেবিলের উপরই বসে আছে পা ঝুলিয়ে। চিফ একজি-কিউটিভ অফিসর যে ঘরে ঢুকেছে বোধহয় লক্ষ্য করেনি কিংবা লক্ষ্য করলেও সহজাত ইংরিজি মেজাজে এই উপর-চড়া ভাবটাকে বিসদৃশ ঠাওরায়নি।

সুভাষ ধীরস্বরে বললে, 'সুপিরিয়র অফিসরের সামনে এ ভাবে বসাটা ঠিক নয়। চেয়ারে বসাটাই সমীচীন।'

কোটস তক্ষুনি দাঁড়িয়ে পড়ল। দোষ মেনে নিল সলজ্জ মুখে।

সেই থেকে সুভাষের সামনে কোটস দাঁড়িয়ে থাকতে চাইত। কিন্তু সুভাষ তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দিত না। বলত, 'সিট ডাউন প্লিজ।'

তখন সুভাষের অনুরোধ না রেখে উপায় থাকত না।

তরুণ যুবক, অথচ নম্রতার শক্তিতে প্রশান্তগম্ভীর, সর্বত্র দক্ষতা ও কর্মোৎসাহের দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে, সকলেই সুভাষের প্রতি শ্রদ্ধায়

আকৃষ্ট হচ্ছে। আর মাইনে যেখানে আড়াই হাজার টাকা, সুভাষ নিচ্ছে মোটে দেড় হাজার, হাজার টাকা অম্লান মুখে ছেড়ে দিচ্ছে। আমার অততে প্রয়োজন নেই, ও দিয়ে অনেক জরুরি অভাব মেটানো যাবে। আমি এখানে বাণিজ্য করতে আসিনি যে নিজেকে পণ্যে পরিণত করব।

এই তপঃশুচি নিরাসক্ত চরিত্রের সৌরভে কে না মুগ্ধ হবে?

দেশবন্ধুর কাছে কর্পোরেশন সম্পর্কে অনেকে তবু নানা অভিযোগ এনে জড়ো করে। দেশবন্ধু বললেন, 'দাঁড়াও, আমাদের একটু নিশ্বাস ফেলবার সময় দাও। জানো না এ কর্পোরেশনের উন্নতিসাধনের জন্যে আমি আবার একটা ত্যাগ স্বীকার করেছি?'

আবার কী ত্যাগ! অভিযোক্তারা চট করে বুঝতে পারে না।

'আমার স্বরাজ্যদলের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে কর্পোরেশনে দান করেছি। আমার দলের ক্ষতি হচ্ছে হোক, কর্পোরেশন পয়মন্ত হয়ে উঠুক।'

তখন লোকে বুঝতে পারে ত্যাগের তাৎপর্য। বুঝতে পারে সেই শ্রেষ্ঠ মানুষটি কে।

জুহুতে মহাত্মার সঙ্গে এসে মিললেন দেশবন্ধু, সঙ্গে মতিলাল। স্বরাজ্যপার্টির সাফল্য কোথায় কতদূর হচ্ছে তারই খতিয়ান করার উদ্দেশ্যে এই মিলন। কিন্তু আবার সেখানে নীতির ক্ষেত্রে গান্ধির সঙ্গে দেশবন্ধুদের অনৈক্য হল।

গান্ধি বললেন, 'আমি এখনও এই অভিমতে স্থির আছি যে কাউন্সিল-প্রবেশ অসহযোগ-নীতির সঙ্গে সমঞ্জস নয়। শুধু অসহযোগ কথাটার ব্যাখ্যা থেকে সামঞ্জস্য খুঁজলে চলবে না, আসলে দেখতে হবে মানসিক ভঙ্গিটা কী। শুধু ফল দেখলেই চলবে না, উপায়ও দেখতে হবে।' সেই পুরোনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন: 'প্রাপ্তিই একমাত্র বিবেচ্য নয়, পদ্ধতিও বিবেচ্য।'

উত্তরে দেশবন্ধু আর মতিলাল যুক্ত বিবৃতি দিলেন: 'কাউন্সিল-

প্রবেশ যে কী করে অসহযোগের পরিপন্থী হতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে অসহযোগ যদি জীবন্ত আচরণ না হয়ে শুধু একটা মানসিক ভঙ্গিমাত্র হয়, তা হলে দেশের সত্যিকার স্বার্থের খাতিরে আমরা অসহযোগকেও বর্জন করতে বাধ্য হব। এই বাক্যদ্বন্দ্ব অনর্থক। আমরা মনে করি আমাদের কাউন্সিল-প্রবেশও অসহযোগ আন্দোলন গ্রন্থেরই একটি অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা।'

কিন্তু বিভেদ সত্ত্বেও কোনো বিরোধ হল না। মহাত্মা বললেন, আমি গঠনমূলক কাজে মন দিই, তোমরা দেখ শাসনযন্ত্র অচল করতে পারো কিনা।

গোলমাল বাধল গোপীনাথ সাহাকে নিয়ে।

মে মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভা বসল সিরাজগঞ্জে, সভাপতি আক্রম খাঁ। গোপীনাথ সাহার ফাঁসি হয়ে গেছে কিন্তু স্বাধীনতা-যজ্ঞে তার আত্মাহুতির আগুন তখনো নিষ্প্রভ হয়নি। তাই সেই সম্মিলনে তার সম্পর্কে একটা প্রস্তাব গৃহীত হল। 'যদিও সশস্ত্র বলপ্রয়োগের নীতি কংগ্রেস সমর্থন করে না বরং হেয় বলে নিন্দিত করে, যেহেতু অহিংসাই তার ধ্রুব নীতি, তবুও গোপীনাথ সাহার আত্মবলিদানের আদর্শ দেশের সাম্প্রতিক স্বার্থের বিচারে ভ্রান্ত হলেও অভিনন্দনযোগ্য।' মোটকথা এটাই শাদা কথায় বলা হল যে গোপীনাথের মত ও পথ কংগ্রেস বরদাস্ত না করলেও তার নিঃস্বার্থ ও বীরত্বপূর্ণ আত্মবিসর্জনের ভাবটাকে সে প্রশংসা তো করেই, সম্মানও করে।

প্রস্তাব দেখে গভর্নমেন্ট তো চটে গেলই, মহাত্মা গান্ধিও ক্ষুব্ধ হলেন।

আহমেদাবাদে অখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সিরাজগঞ্জের প্রস্তাবটাকে পরোক্ষে কটাক্ষ করা হল। আর্নেস্ট ডে-র অকাল-মৃত্যুর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করা হল, তার শোকসন্তপ্ত পরিবারকে জানানো হল সমবেদনা। আর গোপীনাথ সম্পর্কে বলা হল, যদিও

তার দেশপ্রেম সম্বন্ধে কংগ্রেস সচেতন, সে দেশপ্রেম ভ্রান্ত পথে চালিত, এবং কংগ্রেস অহিংসনীতিতে বিশ্বাসী বলে তার বিচারে ঐ দেশপ্রেমজাত হত্যা নিতান্ত গর্হণীয়। আরো বলা হল, ঐ সব রাজনৈতিক হত্যা আইন-অমান্য-আন্দোলনের প্রস্তুতিকে ব্যাহত করে, স্বরাজ বা স্বাধীনতার পথকে করে তোলে কণ্টকাকীর্ণ, সুতরাং তা সর্বতোভাবে শোকাবহ।

বলা বাহুল্য এ বয়ানের পক্ষে স্বয়ং গান্ধি, আর দেশবন্ধু যিনি বাংলার কংগ্রেসের সভাপতি তিনি তার বিরুদ্ধে—আর কিছুর জন্যে না হোক, মমতাহীন ভাষাটার জন্যে। এমন নয় যে দেশবন্ধু রাজনৈতিক হত্যায় বিশ্বাসী, এমন নয় যে তিনি হিংসা বা সশস্ত্রতার স্বপক্ষে, তবু কী অমানুষিক অত্যাচারের ফলে এই হত্যাস্পৃহা, সে সম্বন্ধে কিছু বলা হবে না? আর্নেস্ট ডে-র মৃতুতে দুঃখ প্রকাশ করা ভালো কথা কিন্তু মাতৃগতপ্রাণ সরল গোপীনাথের জন্যে একটুও গোপন সহানুভূতি থাকবে না?

অথচ বছর চারেক আগে দেশবন্ধুর বাড়িতে বিপ্লবপন্থীদের সঙ্গে মহাত্মার সাক্ষাৎ হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, 'যদি ভারতবর্ষের তরবারি থাকত আমি তাকে তা নিষ্কাশিত করতে বলতাম। কিন্তু যখন তার তরবারি নেই আমি তাকে অহিংস অসহযোগ অবলম্বন করতে বলি। অহিংসাকে একটা কূটনীতি হিসেবেই গ্রহণ করা যেতে পারে। এ শয়তান গভর্নমেণ্টকে ধ্বংস করাই আমার একমাত্র ব্রত।'

বিপ্লবপন্থীদের অনেকেই গান্ধির কথা মেনে নিল, অহিংসা শুধু একটা বিকল্প ব্যবস্থা, কার্যসিদ্ধির শুধু একটা পদ্ধতি-প্রকরণ। কিন্তু বিপ্লবীদের মধ্যে যারা তরুণ যারা অত্যুৎসাহী তারা বশীভূত হতে চাইল না। তারা তাদের বিপ্লবের স্বপ্নকে নিষ্ক্রিয়তায় বিবর্ণ করে দিতে পারল না। গান্ধিবাদের প্রথম ব্যতিক্রম ঘটাল তারা শাঁখারিটোলা পোস্টাপিসের আক্রমণে, যার ফলে বরেন ঘোষের ফাঁসি হল। সে আক্রমণের নেতা সন্তোষ মিত্র।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এই গোপীনাথ।

এমনি একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে পরিচিত হলে আর্নেস্ট ডে-র খুনটাও হয়তো ফাঁকায় মিলিয়ে যেত, কিন্তু প্রাদেশিক কংগ্রেস তাতে তার সসম্মান পুষ্পহার রাখল বলেই গান্ধিজি ক্ষুণ্ণ হলেন।

তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন দেশবন্ধু। আমরা তো গোপীনাথের প্রাণটাকেই বাহবা দিচ্ছি, তার প্রণালীটাকে নয়। আমরা তো এ কথা বলিনি যে হিংসার পথটা মহনীয়, আমরা বলতে চেয়েছি গোপীনাথের দেশপ্রেম মহনীয়। বিদেশী ডে-র জন্যে শোক করব এ ভালো কথা, আমরা আমাদের স্বদেশবাসী গোপীনাথের জন্যেও দু ফোঁটা ফেলি চোখের জল।

আর সুভাষের কী মত?

তার বিপ্লবের স্বপ্ন তো আরো অতিকায়। সে তো এমনি বিচ্ছিন্ন হনন নয়, সে এক সামগ্রিক সামরিক অভ্যুত্থান। বর্তমান অবস্থায় ভারতবর্ষে সে অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। তাই তো আমরা সাম্প্রতিক কৌশল হিসেবেই অহিংসাকে ব্রত করেছি। কিন্তু মনে-প্রাণে-বুদ্ধিতে সব সময়েই আমাদের বিপ্লবের স্বপ্ন অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

বলা যাক, শৈল্য চিকিৎসায় অক্ষম হয়ে ভারতবর্ষ আপাতত হোমিওপ্যাথি ধরেছে।

তরবারি থাকলে কে আর তা খাপে ঢেকে রাখত! আপনার অস্তিত্বের আনন্দে নিজেই সে বেরিয়ে আসত খাপ থেকে।

গোপীনাথের ফাঁসির পর হরিশ পার্কে যে সভা হয়েছিল তাতে বলেছিল সুভাষ: 'আর কিছু নয়, শুধু ব্রিটিশদের বণিকস্বার্থে আঘাত করো, অর্থাৎ তাদের ভাতে মারো। দুই উপায়ে এদের তাড়ানো যায়, হয় হাতে মেরে, নয় ভাতে মেরে। হয় অস্ত্রের শক্তিতে নয় ওদের মুনাফার সংকোচ ঘটিয়ে। যেহেতু অস্ত্রশক্তি ভারতবর্ষের পক্ষে এখন অলভ্য বা বলতে পারো অনুপযোগী, বিকল্প

পথই আমাদের বেছে নিতে হবে। হাতে মেরে নয়, ভাতে মেরে ওদের বিতাড়িত করব।'

কোনো বিপ্লবী দলের সঙ্গে সুভাষ প্রত্যক্ষে সংশ্লিষ্ট নয়, সে কংগ্রেসেরই একজন, তাই বলে বিপ্লবীদের দেশপ্রেমের প্রতি তার শ্রদ্ধা ষোল আনা। আর তার আদিগুরু তো সেই ক্ষুদিরাম।

মেদিনীপুর জেলার মধ্যে ঘাটাল মহকুমা, ঘাটাল মহকুমার মধ্যে দাসপুর থানা আর দাসপুর থানার মধ্যে গ্রাম সোনাখালি। সেই সোনাখালি গ্রামে সভা হচ্ছে। সভার উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, সভাপতি, বক্তা—সব মিলে শুধু একজন। শ্রোতা অগণন গ্রামবাসী। সভাস্থল একটা বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত মাঠ।

সভার আয়োজন সামান্য। একটা টেবিল, একটা চেয়ার, পাশে একটা খুঁটি পোঁতা, খুঁটিতে টাঙানো একটি মানচিত্র—ভারতবর্ষের মানচিত্র।

আর বক্তার হাতে একটা শীর্ণ লাঠি। একটা চিহ্নদণ্ড, ঋজু ও তীক্ষ্ণ। সেই দণ্ডধর কে?

সুভাষচন্দ্র।

সুভাষ চেয়ারে না বসে টেবিলে উঠে দাঁড়াল বক্তৃতা দিতে।

বক্তৃতাও অভিনব। সংক্ষিপ্ত ও তেজোদ্ধত।

লাঠি দিয়ে মানচিত্রকে স্পর্শ করল সুভাষ। জনতাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ কোন দেশের মানচিত্র?'

জনতা উত্তর দিল: 'ভারতবর্ষের।'

'মানচিত্রে এ দেশের রঙ লাল কেন?'

'পরাধীন বলে,' জনতার থেকে কে একজন বললে, 'যন্ত্রণায় লাল।'

আরেকজন বললে, 'রঙটা ব্রিটিশ অহঙ্কারের রঙ। অন্য দেশকে পায়ের তলায় রেখেছি, সেই জয়োল্লাসের। আমাদের সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায়না সেই অহমিকার।'

'এখন কী করতে হবে?' জিজ্ঞেস করল সুভাষ।

জনতা ধ্বনিত হয়ে উঠল : 'রঙটা পালটাতে হবে।'

'হ্যাঁ, পালটাতে হবে। একে সবুজ করতে হবে। সবুজই প্রাচুর্যের রঙ, যৌবনের রঙ, অগ্রগতির রঙ। কিন্তু এ রঙের বদল হবে কী করে যদি না আমরা স্বাধীনতা আনতে পারি?'

'স্বাধীনতা আসবে কিসে?'

'চলুন আমার সঙ্গে চলুন।'

সুভাষ নেমে পড়ে গ্রামের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। পিছনে-পিছনে চলল জনতা।

কোথায় চলেছে কোন দিকে চলেছে কেউ প্রশ্ন করল না। পুরোবর্তী হয়ে অমনি কেউ এগিয়ে চললে তাকে বুঝি বিনাবাক্যেই অনুসরণ করতে হয়। ঐ দৃপ্ত নেতৃত্বকে মানবার জন্যে যেন নিজের থেকেই প্রেরণা আসে।

একটা বাড়ির সামনে এসে থামল সুভাষ। সঙ্গে সঙ্গে পিছনের জনতাও দাঁড়িয়ে পড়ল।

বাড়ির সামনে তুলসীমঞ্চ। সেখানে সুভাষ তার একটি নীরব-নিবিড় প্রণাম নিবেদন করল। আর সকলকে বললে প্রণাম করতে। পরে ভাবগম্ভীর স্বরে বললে, 'আমার গুরুদেবের বাড়ি। আমার —আমাদের— সকলের তীর্থ।'

গ্রামবাসী জনতা সকলেই জানত এ বিপ্লবী ক্ষুদিরামের বাড়ি। আজ আবার নতুন অর্থে জানল, সুভাষের গুরুদেবের গৃহ।

সুভাষ বললে, 'ক্ষুদিরামের পথই আমাদের পথ—বলসাধনার পথ, স্বদেশমুক্তির যজ্ঞে আত্মবিসর্জনের পথ। কথা অনেক হয়েছে এখন শুধু চলা, পথচলা। আমাদের সব পথই এগিয়ে যাবার পথ, ফিরে যাবার পথ নেই।'

গোপীনাথ সম্পর্কে সিরাজগঞ্জের প্রস্তাব গান্ধিকে ক্ষুণ্ণ করেছিল বটে কিন্তু সাত বছর পরে ১৯৩১এ করাচি কংগ্রেসে যখন ভগৎ সিং, সুখদেও আর রাজগুরুর ফাঁসির কথা উঠল তখন মহাত্মা আর মুখ

ফিরিয়ে থাকতে পারলেন না। তাঁরই সম্মতিতে আর সমর্থনে প্রস্তাব পাশ হল, যদিও বিপ্লবীদের হিংসাকাণ্ডগুলি নিন্দনীয়, তাদের সাহস, বীরত্ব ও আত্মবলিদান নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য।

দেশবন্ধুর পরলোকগমনের পর মহাত্মা বললেন, 'গোপীনাথ সাহা সম্বন্ধে আমার ও দেশবন্ধুর মধ্যে বাদানুবাদটা প্রেমের কলহমাত্র ছিল।'

তবে কি গোপীনাথের সাহস, বীরত্ব ও আত্মবলিদানের প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল? অনুচ্চারিত সমর্থন?

নয়

স্বরাজ্যদলের অগ্রগামিতায় সরকার বিচলিত হয়ে পড়ল। এদিকে তারকেশ্বর নিয়ে নতুন ধরনের এক গোলমাল পাকিয়ে উঠেছে। সে আন্দোলনের পুরোধাও দেশবন্ধু।

দেবস্থান কলুষিত হয়ে যাচ্ছে, মোহন্তের আচরণ সাধুজনোচিত নয়, বিরাট দেবসম্পত্তি নানা উচ্ছৃঙ্খলতায় অপচিত—বাংলা কংগ্রেস কমিটির উপর চাপ এল, পাঞ্জাবে আকালি আন্দোলনের মত তারকেশ্বরেও আন্দোলন চালাও, তীর্থকে পাপপঙ্ক থেকে উদ্ধার করো। দেশবন্ধু খবর নিয়ে জানলেন অভিযোগ ভয়াবহভাবে সত্য। স্থির করলেন আন্দোলন চালাবেন। মোহন্তের কবল থেকে মন্দির ও সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি উদ্ধার করে তাদের পরিচালনার ভার জনসাধারণের নির্বাচিত কোনো কমিটির উপর ন্যস্ত করবেন।

সুরু হল সত্যাগ্রহ। স্বেচ্ছাসেবকের দল যাত্রা করল মন্দিরের দিকে। মোহন্ত সতীশ গিরি যথারীতি পুলিশকে আহ্বান করল।

কুলিশ-পাণি পুলিশ যথারীতি লাঠিচার্জ করল।

সুরু হল শান্তিপূর্ণ প্রতিরোধ। বাড়তে লাগল স্বেচ্ছাসেবীর দল। দীর্ঘতর ঘনতর শোভাযাত্রা।

লর্ড লিটন শ্রীরামপুরের এক সভায় ব্যঙ্গ করে বললে, তারকেশ্বর আন্দোলন একটা অতিকায় ভাঁওতা।

ভাঁওতা না খাঁটি, দেখাচ্ছি। দেশবন্ধু চিররঞ্জনকে ডাকলেন, 'অসহযোগ আন্দোলনেও তোমাকে সর্বাগ্রে জেলে পাঠিয়েছি, এবারও পাঠাতে চাই। তোমাকে না পাঠালে যে আর সব ছেলেকে ডাকতে পারছি না। কী, যাবে?'

'এক্ষুনি।' চিররঞ্জন এক ডাকে প্রস্তুত।

পরের অভিযানে চিররঞ্জন অগ্রণী। পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে গেল। সরাসরি বিচারে তার ছ মাস জেল হয়ে গেল।

দেশবন্ধু তখন বাঙলার যুবকদের ডাকলেন। এ আর ধর্মীয় আন্দোলন নয়, এ রাজনৈতিক আন্দোলন। তোমরা এস, প্রমাণ দিয়ে যাও আমাদের স্বাধীনতাই পরম পদার্থ আর বর্বর পরশাসনই ভাঁওতা।

লাঠিচার্জ গুলিবর্ষণে উন্নীত হল।

দেশবন্ধু বললেন, 'এবার তবে আমি যাব।'

মোহন্ত সতীশ গিরি তখন বেগতিক দেখে গদি ছাড়ল। শিষ্য প্রভাত গিরি স্থলাভিষিক্ত হল। তারপর আপোসনিষ্পত্তি হতে দেরি হল না।

একদিকে ধর্মের নামে নগ্ন অভিচার আরেকদিকে ধর্মের নামে অন্ধ প্রতিহিংসা। দিকে-দিকে সুরু হয়ে গেল হিন্দু-মুসলমানের মারামারি কাটাকাটি, দিল্লিতে, নাগপুরে, লখনৌয়ে, এলাহাবাদে—সবচেয়ে ভয়াবহ, ভীষণের চেয়েও ভীষণ, কোহাটে।

একটা স্পেশ্যাল ট্রেনে করে চার হাজার হিন্দু পথের ভিখিরি হয়ে ফিরে এল রাওলপিণ্ডিতে, লাহোরে, এখানে-সেখানে। দিল্লিতে, মহম্মদ আলির বাড়িতে, গান্ধি একুশ দিনের অনশন সুরু করলেন। ভাবলেন তাঁর এই আত্মপীড়নে সাম্প্রদায়িক হিংসাবোধ বিদূরিত হবে। দিল্লিতে যথারীতি ঐক্যসম্মিলন বসল, নানা বিধি-নিষেধের নির্ঘণ্ট তৈরি হল, মন্দিরে মসজিদে উত্থিত হল নানা নীরব-সরব প্রার্থনা, কিন্তু জাতির মন থেকে হিংসা আর গেল না। যা যাবার নয় তাই নানা রন্ধ্রে ইন্ধন খুঁজতে লাগল।

বাংলায় প্যাক্টের জন্যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বাধতে পেল না। তখন গভর্নমেণ্ট স্বরাজিস্টদের দাবাবার অন্য পথ না পেয়ে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স নামে এক জরুরি অর্ডিন্যান্স জারি করে বসল। জরুরি,

যেহেতু এ অর্ডিন্যান্স ছাড়া ক্রমবর্ধমান সহিংস বিপ্লববাদকে দমন করা যাচ্ছে না। এ অর্ডিন্যান্সে যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করা যাবে ও বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা যাবে খুশিমত। সুতরাং একজালে প্রায় সত্তর জন স্বরাজীকে গ্রেপ্তার করে অন্তরীণ করা হল। এই সত্তর জনের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য সুভাষ, কলকাতা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা।

আর সকলকে ধরা হল বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে, সুভাষের বেলায় আনা হল সেই পুরোনো পচা আইন, সেই ১৮১৮-র রেগুলেশন থ্রি —সুভাষের সঙ্গে আরো দুজনকে জুড়ে দেওয়া হল, সত্যেন্দ্র মিত্র আর অনিলবরণ রায়কে।

এই গ্রেপ্তারের কারণ, সরকার থেকে বলা হল, বিপ্লব ঘটাবার ষড়যন্ত্র। হুবহু বাজে কথা, বিক্ষুব্ধ দেশবাসী তা মেনে নিতে পারল না। রাজবন্দীরা ব্যক্তিগত ভাবে বিপ্লবে বিশ্বাসী হতে পারে কিন্তু তারা কোনো সংহিস অভ্যুত্থানের ষড়যন্ত্র করেছে এ নিদারুণ মিথ্যে। টাউন হলে, কালা কানুনের বিরুদ্ধে সভা হল, ডাকা হল হরতাল।

দেশবন্ধু তখন সিমলেয়, ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করবার চেষ্টায় বিশ্রাম করছেন। তাঁর কাছে খবর পৌঁছুতেই তিনি গর্জে উঠলেন : 'কী, সুভাষকে ধরেছে! এবার আমি গভর্নমেণ্টকে কাঁপিয়ে ছাড়ব।'

আর তাঁকে বিশ্রামে কে আবদ্ধ করে রাখে! তাঁর প্রধান সহকর্মীদের তাঁর কাছ থেকে এমনি করে অপসারিত করার অর্থ তাঁকেই পঙ্গু করে ফেলা। কর্পোরেশনে সুভাষ কত কল্যাণকর কাজের পত্তন করেছে, সব এক নিমেষে ভণ্ডুল হয়ে যাবে! সুভাষ তো এখন পুরোদস্তুর গঠনের কাজে ব্যস্ত, ওর এখন রাজনীতি ঘাঁটবার সময় কোথায়? এ আর কিছু নয়, এ হচ্ছে হীনতম প্রতি-হিংসা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কেন গোপীনাথের আত্মত্যাগকে প্রশংসা করল? কেন স্বরাজ্যদল মন্ত্রীদের গদিচ্যুত করে ডায়ার্কি বা দ্বৈরাজ্যের অবসান ঘটাল?

কলকাতায় ফিরে এসে মেয়রের আসন থেকে দেশবন্ধু দৃপ্ত ভাষণ দিলেন: 'সুভাষ যেমন বিপ্লবী আমিও তেমনি বিপ্লবী। তবে ওরা আমাকে গ্রেপ্তার করছে না কেন? যদি দেশপ্রেম অপরাধ হয়, আমি অপরাধী। যদি সুভাষ অপরাধী হয়, আমিও অপরাধী। এই কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা ও মেয়র একই অপরাধে সমান অপরাধী। তবে একজনকে ধরলে আরেকজনকে ধরছে না কেন?

এ আইন কোনো বিপ্লববাদ দমন করবার জন্যে প্রয়োগ করা হচ্ছে না—প্রয়োগ করা হচ্ছে বিধিসম্মত সংগঠনগুলিকে ভেঙে দেবার উদ্দেশ্যে। এ অত্যাচার আমরা কিছুতেই সহ্য করব না।

শুধু পাশবিক শক্তির প্রাবল্যে সুভাষকে ধরে নিয়ে গেল। প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করতে সুভাষ সকালবেলা কাজে বেরুল, কাজ থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখল পুলিশবাহিনী তার জন্যে অপেক্ষা করছে। কোনো অভিযোগ জানলে না, কোনো কৈফিয়ত চাইল না—কোনো বক্তব্য নেই ব্যাখ্যা নেই—শুধু ঘোষণা করলে, আমাদের শরীরে বন্য পাশবিকতা আছে, তার জোরে তোমাকে আমরা কারাগারে টেনে নেব। এই কি আইন? এই কি বিচার? এই কি সভ্যতা?'

টাউন হলের সভায় দেশবন্ধু বাংলার যুবকদের ডাকলেন উদার-কণ্ঠে: 'বাংলার যুবক, তোমাদের বুকে স্বাধীনতার তৃষ্ণা আগুন হয়ে জ্বলে উঠুক। স্বাধীনতার জন্যে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এস, আত্মবিসর্জন দিতে দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠো। এই জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে সর্বাগ্রে আমি সম্মুখীন হব, তোমরা পিছে এস। মা, একবার সংহারমূর্তিতে প্রকাশিত হও মা, আমরা সকলে তোমার পায়ে আত্মোৎসর্গ করে স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত করে রাখি।'

আরো বিশদ হলেন চিত্তরঞ্জন: 'স্বাধীনতার জন্যে আমি জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। বিপ্লববাদীদের বর্তমান পথ বিচার করে দেখলে আমি বিপ্লববাদী নই কিন্তু স্বাধীনতার জন্যে বিপ্লববাদীদের

যে হৃদয়াবেগ তা আমি অনুভব করি। আমি মনে করি তাদের পথে স্বাধীনতা আসবেনা, যদি বিশ্বাস হয় আসবে তা হলে আমি এখুনিই তাদের আন্দোলনে যোগ দিই। তবে এ কথা ঠিক, স্বাধীনতার জন্যে সমস্ত দুঃখভোগে আমি প্রস্তুত, দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দুপাতে আমি সম্মত।'

দেশবন্ধু মহাত্মাকে টেলিগ্রাম করলেন, কলকাতায় চলে আসুন। অনুরূপ টেলিগ্রাম গেল মতিলাল নেহরুর কাছে, মুঞ্জে কেলকার সরোজিনী নাইডুর কাছে। তাঁরা সদলবলে চলে এলেন কলকাতা। সমস্ত দেখে-শুনে মহাত্মা বুঝলেন, কাউন্সিলে ও কর্পোরেশনে স্বরাজ্যদলের অভূতপূর্ব জয়ই গভর্নমেণ্টকে হিংস্র করে তুলেছে। অপদস্থতার শোধ নেবার জন্যেই এই চণ্ডনীতি। এ আরেকরকমের সন্ত্রাসবাদ।

মহাত্মা তখন নিরঙ্কুশ ঘোষণা করলেন : স্বরাজ্যপার্টির কর্মধারাই কংগ্রেসের প্রধান কর্মপদ্ধতি বলে পরিগণিত হবে। সেই ঘোষণায় যুক্ত স্বাক্ষর দিলেন দেশবন্ধু আর মতিলাল।

রবীন্দ্রনাথ তখন আর্জেন্টিনায়, দক্ষিণ আমেরিকায়। তিনি লিখে পাঠালেন :

'প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই
জেনো মনে তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখসহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে॥'

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে মাসখানেকের মত ছিল সুভাষ। সেখানে বসেই সে কর্পোরেশনের কাজ করে, ফাইল দেখে, অর্ডার লেখে। আলোচনা করতে আসে সেক্রেটারি রামায়া, ইঞ্জিনিয়র কোটস, আসে জে সি মুখার্জি। সি-আই-ডির লোকেরা অবাক হয়ে চেয়ে

থাকে। তরুণ সুভাষকে ঘিরে প্রবীণ সব উচ্চপদস্থ কর্মচারী, দৃশ্যটা তাদের কাছে খুব প্রীতিপ্রদ লাগে না।

ঠিক হয় তাকে বহরমপুর জেলে বদলি করবে।

বদলির দুদিন আগে দেশবন্ধু তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কেমন আছ?

সুভাষের মুখে সেই আশার দীপ্তি, চোখে সেই স্বপ্নের অঞ্জন, দুই হাতে সেই শক্তির লাবণ্য।

প্রণাম করল সুভাষ। আশীর্বাদ করলেন দেশবন্ধু।

সুভাষ বললে, 'আমাদের আর শিগগির দেখা হচ্ছে না।'

'না, না, তা কী করে হয়?' দেশবন্ধু গর্জন করে উঠলেন: 'আমি তোমাকে যত শিগগির পারি আমার কাছে নিয়ে আসব।'

দেশবন্ধু ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে রাস্তায় বেরুলেন জাতীয় পুনর্গঠনে দেশবাসীর কাছ থেকে চাঁদা চাই, হ্যাঁ, স্বরাজ্য ফণ্ডে, স্বরাজ্যপার্টির কাজের জন্যে। দেশবাসী দুঃস্থ তা তিনি জানেন, কিন্তু দেশবাসী আবার সরকারী লাঞ্ছনার প্রতিবাদে সমুদ্যত—এই তো তাদের কাছ থেকে ভিক্ষে নেবার সময়। অন্তত চাঁদা চেয়ে বোঝা যাবে তাঁর প্রতি তাঁর দলের প্রতি তাদের আস্থা আছে কিনা। ভালোবাসা আছে কিনা।

যা সাড়া পাওয়া গেল, এক কথায় বলতে গেলে আশাতীত। এ সাড়া কোনো বিশুদ্ধ রাজনীতি বা বৈজ্ঞানিক বাস্তববাদ আনতে পারে না, এ আনতে পারে একমাত্র ভালোবাসা, ভাষাতীত হৃদয়স্পর্শ।

'মৃত্যুর গর্জন

শুনেছে সে সঙ্গীতের মত। দহিয়াছে অগ্নি তারে
বিদ্ধ করিয়াছে শূল, ছিন্ন তারে করেছে কুঠারে
সর্বপ্রিয়বস্তু তার অকাতরে করিয়া ইন্ধন
চিরজন্ম তারি লাগি জ্বেলেছে সে হোম-হুতাশন

হৃৎপিণ্ড করিয়া ছিন্ন রক্তপদ্ম-অর্ঘ্য-উপহারে
ভক্তিভরে জন্মশোধ শেষ পূজা পূজিয়াছে তারে
মরণে কৃতার্থ করি প্রাণ। শুনিয়াছি তারি লাগি
রাজপুত্র পরিয়াছে জীর্ণ কন্থা, বিষয়ে বিরাগী
পথের ভিক্ষুক।'

ডিসেম্বরে বেলগাঁওয়ে কংগ্রেস বসল, মহাত্মা গান্ধি সভাপতি। স্বরাজীদের কাছে হার স্বীকার করলেন মহাত্মা। আইনসভাগুলি অধিকার করাই কংগ্রেসের প্রধান কর্মনীতি হয়ে দাঁড়াল আর বয়কট বা বর্জনের মধ্যে রইল শুধু বিদেশী বস্ত্র।

দেশবন্ধুর জীবনে এই শেষ কংগ্রেসে যোগদান আর এই শেষ কংগ্রেসে উত্থিত হল তাঁরই জয়পতাকা।

কলকাতায় ফিরে এসেই দেশবন্ধু নিদারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ উনিশ শো পঁচিশের এপ্রিলেই উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তাই তাকে আইনে পরিণত করবার জন্যে নতুন বিল এনেছে গভর্নমেণ্ট। সাতুই জানুয়ারি সেই বিল পাশ করিয়ে নেবার আয়োজন হয়েছে। বিরুদ্ধতা করবার জন্যে দেশবন্ধুর দরকার। কিন্তু কী করে যাবেন? কলিকের ব্যথায় তিনি ঘোরতর কাতর।

'যে করে হোক আমি যাব।' যন্ত্রণার মধ্যেও দেশবন্ধু বলছেন আর্তকণ্ঠে, 'ঐ ব্ল্যাক বিল পাশ হতে দেব না। ডাক্তারদের বলো আমার ব্যথা সারিয়ে দিতে।'

মর্ফিয়া ইনজেকশান দেওয়া হল। তাতে যন্ত্রণার কিছু উপশম হলেও, জ্বর কমল না, আর জ্বরের দরুন শরীরও ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ল।

'মরি আর বাঁচি, সাতুই আমাকে কাউন্সিলে যেতেই হবে।'

এল সেই সাতুই। সাধ্য নেই কেউ তাকে নিরস্ত করতে পারে। না, বাসন্তী দেবীও না। 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় হয়ে গেলেও ওঁকে নিবৃত্ত করা যাবেনা।'

'তুমি কিছু ভেবোনা, শরীরের ডাকের আগে আমার দেশের ডাক।'

স্ট্রেচারে করে দেশবন্ধুকে নিয়ে যাওয়া হল। সঙ্গে সহচর ডাক্তার রইল বিধান রায় আর জে. এম. দাশগুপ্ত।

কে জানে কাউন্সিল থেকে তিনি জীবিত ফিরে আসবেন কি না।

'আমার সোনার দেশের সোনার ছেলেরা বিনাবিচারে বন্দী আর আমি আমার শরীরের কষ্টের জন্যে অনুপস্থিত থেকে সে বর্বর আইন পাশ করিয়ে নেবার সুযোগ দেব? প্রাণ থাকতে নয়।'

চিত্তরঞ্জনের উপস্থিতিতে অসাধ্যসাধন হয়ে গেল, যারা সরকারের খয়েরখাঁ তাদেরও কয়েকজন বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিলে। যেন তাদেরও হৃদয় অলক্ষ্যে স্বদেশপ্রেমে রঞ্জিত হল। ফলে বেশি ভোটে বিল অগ্রাহ্য হয়ে গেল।

টাউনহলের বাইরে অপেক্ষমান জনতার সে কী হর্ষধ্বনি! জয় দেশবন্ধুর জয়! বন্দেমাতরম!

কিন্তু বিল অগ্রাহ্য হলে হবে কী, গভর্নরের অতিরিক্ত ক্ষমতাবলে সেই বিলই আইন বলে চালু হয়ে গেল। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। এমনই সংবিধান তৈরি করা হয়েছে যে সাপও মরবে লাঠিও বজায় থাকবে।

স্বাস্থ্যোদ্ধার করতে পাটনায় এলেন দেশবন্ধু। পাটনায় যাবার আগে তাঁর শেষ সম্পত্তি, তাঁর প্রাসাদোপম বাড়ি দেশের স্ত্রীজাতির কল্যাণে দান করে দিলেন। 'আমি যখন আজ সেই বাড়িতে গেলাম,' মে মাসে মির্জাপুর পার্কের এক সভায় মহাত্মা বলছেন, 'আমি শোকে অভিভূত হয়ে পড়লাম। এই বাড়ি, এই সুন্দর অট্টালিকা আর দেশবন্ধুর নয়—পৃথিবীতে তাঁর যে ধনসম্পদ ছিল তার শেষ চিহ্নটুকুও তিনি নিজের হাতে মুছে দিলেন। তাঁর কথা ভেবে আমি না কেঁদে থাকতে পারছি না। তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে তবু তিনি নিজের সুখসুবিধের দিকে দৃকপাত না করে দেশের ডাকে ঘুরে

বেড়াচ্ছেন, গিয়েছেন ফরিদপুরে, প্রাদেশিক সম্মিলনে। নিজের বলে মানুষের যা কিছু রক্ষণীয় তার সমস্তটুকু এমন ভাবে কেউ বিনিঃশেষ ত্যাগ করতে পারে এ আমার কল্পনার অতীত।'

একটু সুস্থ হতেই মার্চ মাসে আবার কলকাতায় ডাক পড়ল— মন্ত্রীদের মাইনের প্রসঙ্গ আবার উঠেছে কাউন্সিলে।

'এবার আর আশা নেই।'

'মন বলছে আশা কম কিন্তু প্রাণ বলছে জয়লাভ হবে।' বললেন দেশবন্ধু, 'মাই হার্ট হুইসপার্স সাকসেস।'

কলকাতায় পৌঁছেই কাউন্সিলের সভ্যদের ডাক দিলেন: 'আপনাদের নিজের বলতে আর কী আছে? আছে শুধু এক বিবেক। সে বিবেকের কান্না শুনুন। নিজের ক্ষুদ্রস্বার্থের জন্যে বিবেকের কণ্ঠরোধ করবেন না। আপনাদের স্বদেশপ্রাণ বীর ভাইয়েরা আজ জেলে শৃঙ্খলিত, জেলের বাইরেও আপনাদের কোনো স্বাধীনতা নেই। দেশবাসীরা দৈন্যক্লিষ্ট ব্যাধিজর্জর নিত্যবুভুক্ষু। এই নির্লজ্জ ব্যুরোক্রেসিই সমস্ত দুঃখদারিদ্র্যের কারণ। ওদের হাত থেকে আপনাদের সহায়তা সরিয়ে নিন, ওদের নিয়োজিত মন্ত্রীর মাইনে অগ্রাহ্য করুন।'

আবারও দেশবন্ধুর জয় হল। মন্ত্রীর মাইনে নাকচ হয়ে গেল। গভর্নর লিটন তার একজিকিউটিভ কাউন্সিলের সভ্যদের দিয়ে শাসন চালাতে লাগল।

স্টেটসম্যান জ্বলতে লাগল গাত্রদাহে। দেশবন্ধুকে বললে, 'দুষ্টবুদ্ধি, ইভিল জিনিয়াস, ধ্বংসের সেবক, যার আধ্যাত্মিক বাস মস্কোয়, সেই ঘৃণার রাজধানীতে।'

পাটনায় ফিরে গেলেন দেশবন্ধু। বললেন, 'রাজনৈতিক স্বাধীনতার চেয়ে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বেশি মূল্যবান। জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলা দরকার। দে ফিল এণ্ড গ্রোন বাট ক্যানট স্পিক। তারা শুধু অনুভব আর আর্তনাদ করে কিন্তু কথা বলতে পারে না।'

ডাক্তার সান্যাল বললে, 'অনেক টাকার দরকার। আবার প্র্যাকটিস সুরু করে দিন।'

দেশবন্ধু উদাসীন হয়ে গেলেন। বললেন, 'প্র্যাকটিস করতে গিয়ে অনেকরকম লোক দেখেছি, আবার এ অবস্থায় ভগবান সৎসঙ্গ জুটিয়ে দিচ্ছেন। রাজারাজড়ার আয়ের চেয়ে এই সৎসঙ্গের আনন্দ অনেক বেশি।' তাকালেন গঙ্গার দিকে : 'এখন আমার মন কী চায় জানেন? ঐ যে মজরুল হকের আশ্রমটি আছে গঙ্গার পারে, ঐ রকম একটি আশ্রম করে থাকি।'

কিন্তু অসুখ আবার হঠাৎ মন্দের দিকে গেল। রক্তবমি হয়ে দারুণ দুর্বল হয়ে পড়লেন।

ডাক্তার বললে, 'আবার আপনাকে একটু ব্রাণ্ডি ধরতে হবে।'

'ও আর এ জীবনে নয়।' স্থির কণ্ঠে বললেন দেশবন্ধু, 'যে বিষ একবার ছেড়েছি তা আর নয়।'

হঠাৎ একদিন বাসন্তী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, ভীষণ বিচলিত হলেন দেশবন্ধু। ডাক্তারকে বললেন, 'ওকে ভালো করে দিন। জীবনে ও একদিনের জন্যেও আমার অসুবিধে করেনি।'

দেশবন্ধুর ইচ্ছে সমুদ্রভ্রমণে যান। ডাক্তারদেরও সেই বিধান, তাতেই স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? অন্তত কুড়ি হাজার টাকার দরকার। বাংলার বাইরে একজন সদাশয় দশ হাজার দিতে চেয়েছেন। আর বাকি দশ?

একজনের কাছে চিঠি দিয়ে হেমেন দাশগুপ্তকে কলকাতায় পাঠালেন। এই ব্যক্তি একবার স্বেচ্ছায় দেশবন্ধুকে লাখ টাকা দিতে চেয়েছিল, দেশবন্ধু তা নেন নি। আজ যদি এই অনটনের দিনে কিছু সাহায্য করে।

'শুধু স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে নয়, দেশোদ্ধারের জন্যেই বিলেত যাওয়া দরকার।' বললেন দেশবন্ধু, 'সেখানে গেলে মিটমাটের জন্যে পার্লামেন্টের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ করা যেত।'

কিন্তু সেই ব্যক্তি টাকা দিল না।

'এই দেখ দুনিয়া।' দেশবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন না, হাসলেন : 'এই হচ্ছে জীবন।'

'প্র্যাকটিস সম্পূর্ণ না ছাড়লে পারতেন।' কে একজন বললে।

'সম্পূর্ণ না ছাড়লে কি কাজ করতে পারতাম ?' দেশবন্ধু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন : 'সম্পূর্ণ না ছাড়লে কি কেউ আমাকে মানত, এত ভালোবাসত ?'

'কিন্তু এত কষ্টও তো দেখা যায় না।'

'তোমরা কি ভাবো আমার খুব কষ্ট হচ্ছে, আমি খুব দুঃখিত ?' দেশবন্ধু প্রদীপ্ত মুখে বললেন, 'দুঃখ আমার জন্যে নয়, আমার জন্যে অনন্ত সুখ।' কিন্তু হঠাৎ থেমে পড়ে আহত স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, একটা শুধু আমার কষ্ট।'

কী কষ্ট জানবার জন্যে সকলে উৎসুক হয়ে রইল।

'অভাবগ্রস্ত লোকের দুঃখ দূর করতে পারি না। কেউ আর কিছু চায় না আমার কাছে।'

কিন্তু পৃথিবীতে এসে যে লোক দুঃখ পেল না সে তো তার জীবনের থেকে সব পাওনা আদায় করে নিতে পারল না, তার পাথেয় কম পড়ে গেল।

জানুয়ারিতেই সুভাষকে মান্দালয় জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সে সেখান থেকে চিঠি লিখছে বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে :

'তুমি লিখেছ মানুষের অশ্রু দিনের পর দিন কেমন করে পৃথিবীর মাটিকে একেবারে অতলতল পর্যন্ত ভিজিয়ে দিচ্ছে, তাই দেখে তুমি বিষণ্ণ ও গম্ভীর হচ্ছ প্রতিদিন। কিন্তু এ অশ্রুর সবটুকুই কি দুঃখের ? তার মধ্যে কি ভালোবাসা ও করুণার অমৃতবিন্দু নেই ? সমৃদ্ধতর ও প্রশস্ততর আনন্দের অম্বুনিধিতে পৌঁছুবার সম্ভাবনা থাকলে তুমি দুঃখকষ্টের ছোটখাটো ঢেউগুলো পার হয়ে যেতে অসম্মত হবে ? আমি নিজে তো দুঃখবাদে নিরুৎসাহ হবার কোনো কারণ দেখি না,

বরং আমার মনে হয় দুঃখকষ্টেই উন্নততর কর্ম ও উজ্জ্বলতর সফলতার অনুপ্রেরণা এনে দেবে। তুমি কি মনে করো বিনা দুঃখকষ্টে যা লাভ করা যায় তার কোনো মূল্যে আছে?'

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য। মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে। দুঃখই মানুষের একমাত্র শক্তি, একমাত্র স্পর্ধা।

'দুঃখ আমার ঘরের জিনিস
খাঁটি রতন তুই তো চিনিস
তোর প্রসাদ দিয়ে তারে কিনিস
এ মোর অহঙ্কার।'

পাটনা থেকে ফিরলেন দেশবন্ধু। উঠলেন ৫ নম্বর বিশপ লিফ্রয় রোডের ফ্ল্যাটে। তিরিশে এপ্রিল রওনা হলেন ফরিদপুর। পরদিন, পয়লা মে, রওনা হলেন মহাত্মা।

ব্রিটিশ শাসনের ভূগোলে বাংলাই ঝটিকার কেন্দ্র। তাই প্রাদেশিক সম্মিলনে বাংলা দেশের বক্তব্যকে গভর্নমেণ্ট মূল্য দিতে পক্ষপাতী। তাই দেশবন্ধুর ভাষণ বিশেষ করে গভর্নমেণ্টকেই লক্ষ্য করে। সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে নিজের কণ্ঠে ঘোষণা করলেই বক্তব্যকে জীবন্ত মনে হবে, তাই ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েই এসেছেন দেশবন্ধু।

'কেবল স্বাধীনতায়ই স্বরাজ লাভ হবে না।' বললেন চিত্তরঞ্জন, 'স্বরাজের আদর্শ আরো মহৎ। ইংরেজ চলে গেলে আমরা অধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারি, তবু শুধু তাতেই স্বরাজ অর্থে আমি যা বুঝি তার প্রতিষ্ঠা হবে না। পক্ষান্তরে ইংরেজ থেকেও যদি জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশলাভে কোনো বাধা না জন্মায়, তবে ইংরেজ থাকুক, তাতে ক্ষতি কী। স্বায়ত্তশাসন আর স্বরাজ এক বস্তু নয়।'

এই স্বরাজলাভের পথ কী? দেশবন্ধু আবার ঘোষণা করলেন, অহিংসা। তাই বলে কাপুরুষের অহিংসা নয়, বলবানের অহিংসা।

বললেন, 'যে দাসত্বের লৌহশৃঙ্খল কৃতদাসের গলায় সবলে বেঁধে দেয় সে যেমন পাপ করে তেমনি পাপ করে সেই ভীরু ক্লীব যে দাসত্বের শৃঙ্খলে বাধা পড়ার সময়ে বাধা দেয় না বা আবদ্ধ হয়ে থাকতেই আরাম বোধ করে।'

বিনাবিচারে কারারুদ্ধ দেশসেবকদের মুক্তির প্রসঙ্গ বাদ পড়তে পারে না কিছুতেই। দেশবন্ধু বললেন, 'সুভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্পূর্ণ নির্দোষ, অন্তত এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত।'

'আর বাকি সকলে?' প্রতিপক্ষ আপত্তি করল, 'বিনাবিচারে আবদ্ধ সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি চাই। প্রস্তাবে বিভেদবাদ চলবে না।'

'হিংসা যেমন নীতিবিরুদ্ধ তেমনি বিনাবিচারে নির্বাসনও নীতি-বিরুদ্ধ। সকলেরই বিচার চাই। তবে দেশে হিংসার পক্ষপাতী লোক নেই এ বলা মিথ্যে হবে। সুভাষ, সত্যেন আর অনিলবরণ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তারা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে লিপ্ত নয়, তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ।'

এ নিয়ে সভায় গোলমাল সুরু হল। প্রতিপক্ষ ভাবল দেশবন্ধু বুঝি তিনজন সম্পর্কে পক্ষপাতিত্ব করছেন।

'ওরা না বুঝে গোলমাল করছে।' দেশবন্ধু সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

কিন্তু পরদিন দেশবন্ধুর প্রস্তাবই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। মহাত্মা বললেন, 'দেশবন্ধুর প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে আমি একমত। যদি কেউ আমাকে এ আমার রচনা বলে সই করতে বলে আমি সানন্দে সই করব, কিন্তু মুস্কিল এই, এমন সুযুক্তিপূর্ণ ও সুলিখিত অভিভাষণ আমার কলম থেকে বার হত না।'

স্টেটসম্যান আর ইংলিশম্যান রটাল, সুভাষই বাংলাদেশের বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের মস্তিষ্ক। কী করে তোমরা এ কথা বলো, তোমাদের হাতে প্রমাণ কী? সুভাষ বিপ্লবে বিশ্বাস করে কিনা, করলে সে

কোন ধরনের বিপ্লব, সে সব প্রশ্ন উঠছে না, সাম্প্রতিক সহিংস আন্দোলনে সে লিপ্ত, এটা প্রমাণ করো। সুভাষের পক্ষ থেকে ঐ দুই পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনা হল। হয় খেসারত দাও, নয় নিজের কান মলো, ক্ষমা চাও নিঃসর্তে।

ফরিদপুর থেকে ফিরে এলেন দেশবন্ধু। বললেন, 'দেখ মহাত্মার কোনো শত্রু নেই, আমার এত শত্রু কেন? মহাত্মার মনে কোনো হিংসা নেই, তাই তাঁর শত্রুও নেই। আমার মনে নিশ্চয়ই কোথাও হিংসা আছে, তাই উঠতে-বসতে আমার এত শত্রু।'

এবার চলো দার্জিলিঙ যাই। দার্জিলিঙেই আমার শরীর সারবে।

দশ

এগারোই মে দার্জিলিঙ গেলেন দেশবন্ধু। চব্বিশে মে আনি বেশান্ত গেল তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে। তার কমনওয়েলথ বিল নিয়ে সে তখন ভারি ব্যস্ত। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সে এ বিল চালু করতে পারবে এই তার ধারণা। এ বিলের উদ্দেশ্য ভারতকে 'হোম রুল' দেওয়া, কমনওয়েলথে থেকে স্বায়ত্তশাসন। এতে কংগ্রেসের অনুমোদন থাকলে দাবি জোরদার হবে এই ভেবে বেশান্ত বেলগাঁওয়ে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সে ছলের জালে পড়তে চায়নি। বেশান্ত ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিল। এখন দেখল নতুন ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড দেশবন্ধুর সঙ্গে কথা চালাচ্ছেন, লর্ড রেডিংকে এই প্রসঙ্গে ডেকে নিয়ে গিয়েছেন লণ্ডনে। কাজেকাজেই এখন দেশবন্ধুকে গিয়ে ধরি, যদি কমনওয়েলথ বিলে তাঁর সমর্থন পাই।

দেশবন্ধু বললেন, 'এতে আমার আপত্তি হবে না, ফরিদপুরে এই মর্মেই বলে এসেছি। কিন্তু এক কথা, যদি এ বিল পাশ না হয়, তবে আপনি আমাদের সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সে আসবেন তো?'

'সে কি, এর পরেও আপনারা সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স করবেন নাকি?' বেশান্ত ঘাবড়ে গেল।

'বা, করব না? আপোষে না পেলে ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করব না? অহিংস আইন-অমান্যই আমাদের ব্রহ্মাস্ত্র।'

'তার জন্যে আপনাদের প্রস্তুতি কই?'

'প্রস্তুত হতে হতেই প্রস্তুতি। বলুন তখন আপনি আসবেন আমাদের আন্দোলনে?'

'না, মাপ করুন। ঐ আন্দোলনে আমার সহানুভূতি নেই।'

চৌঠা জুন গান্ধি এসে পৌঁছুলেন দার্জিলিঙ।

দেশবন্ধু বললেন, 'আমার খুব বিশ্বাস বার্কেনহেড জবরদস্ত লোক, আমার বিশ্বাস সে চুপচাপ বসে থাকবে না।'

গান্ধি বললেন, 'আমার ধারনা উলটো। দেশে এখন হিন্দু-মুসলমানের ঝগড়া, সর্বত্র দলাদলি, সর্বত্র বিসংবাদ। সংহতি না থাকলে, সবাই একতাবদ্ধ না হলে কিছু হবে না। ইংরেজ কখনো কোনো দুর্বল শত্রুর কাছে মাথা নোয়ায় না।'

ঘোষণা করা হল সাতুই জুলাই পার্লামেণ্টে বার্কেনহেড ভারতবর্ষ সম্পর্কে গুরুতর কিছু ঘোষণা করবে।

ষোলই জুন মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটায় দেশবন্ধু মহাপ্রয়াণ করলেন।

সাতুই জুলাই কী ঘোষণা করল বার্কেনহেড?

আর ঘোষণা! তাদের প্রধান শত্রু অপসৃত হয়েছে, ইংরেজ শাসকদের চাপা মুখের হাসি তখন দেখে কে? গলায় খাঁখারি দিয়ে বলতে সুরু করল বার্কেনহেড। ভারতবর্ষ—ভারতবর্ষের অগ্রগতি সম্ভব শুধু শ্রমশিল্পের উন্নতিতে। ভারতবর্ষ এখন শুধু শ্রম-শিল্পের প্রসারে মনোযোগী হোক।

দেশবন্ধুর দেহ কলকাতায় নিয়ে আসা হল আর কলকাতা দেখাল কাকে বলে বীরপূজা! স্বয়ং গান্ধি সে শবশোভাযাত্রায় অগ্রণী হলেন। আর রবীন্দ্রনাথ দুটি ছত্রে শাশ্বত করে রাখলেন সেই মৃত্যুমৃত্যু মহামৃত্যুকে:

'এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান॥'

মান্দালয় জেল থেকে সুভাষ তিনখানা চিঠি লিখলে—একখানা হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে, একখানা দিলীপকুমার রায়কে, আরেকখানা বাসন্তী দেবীকে।

জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অলৌকিক প্রভাবের হেতু কী, প্রথম পত্রে তার সুন্দর বিশ্লেষণ করেছে সুভাষ। এক কথায় সেই হেতু, নির্বিচার লোকপ্রেম। সে প্রেমের উৎপত্তি মস্তিষ্কে নয়, হৃদয়ে—কারু দোষ না দেখা, গুণের হিসেব না করা। 'যারা তাঁর পাণ্ডিত্যের কাছে মাথা নোয়ায়নি, অসাধারণ বাগ্মিতায় বশীভূত হয়নি, বিক্রমের কাছে পরাভব স্বীকার করেনি, অলৌকিক ত্যাগে মুগ্ধ হয়নি,' লিখছে সুভাষ : 'তারা পর্যন্ত ঐ বিশাল হৃদয়ের টানে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। দেশবন্ধুর একটি কথায় তারা প্রাণ দিতে প্রস্তুত।'

সাধারণ সাংসারিক জীবের মত দেশবন্ধুর আত্ম-পর জ্ঞান ছিল না। তাঁর বাড়ি সাধারণের সম্পত্তি হয়ে পড়েছিল। সর্বত্র, এমন কি তাঁর শোবার ঘরেও তাদের গতিবিধি ব্যাহত হয়নি। সহচরদের যে তিনি শুধু ভালোবাসতেন তাই নয়, তাদের জন্যে তিনি লাঞ্ছনা সইতেও প্রস্তুত ছিলেন। একদিন তাঁর এক আত্মীয় তাঁর এক সহকর্মী সম্পর্কে ক্রুদ্ধ মন্তব্য করেছিলেন, আমি ওকে ঘৃণা করি। দেশবন্ধু ব্যথিত মুখে বললেন আমার মুস্কিল এই, আমি ঘৃণা করতে পারিনা।

'দেশবন্ধুর সঙ্গে আটমাস জেলখানায় কাটাবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল।' লিখছে সুভাষ : 'তার মধ্যে দু মাস তো আমরা প্রেসিডেন্সি জেলের পাশাপাশি সেলে ছিলাম। বাকি ছ মাস ছিলাম আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে, একটি বড় ঘরে, সহমর্মী বন্ধুদের সঙ্গে। এই সময় তাঁর সেবার ভার কতকটা আমার উপর ছিল। আলিপুর জেলে শেষ কয়েক মাস তাঁর একবেলার রান্না আমাদেরই করতে হত। গভর্নমেণ্টের কৃপায় আমি যে আটটি মাস তাঁর সেবা করবার সুযোগ ও অধিকার পেয়েছিলাম এ আমার পক্ষে পরম গৌরবের ব্যাপার।'

জেলখানায় দেশবন্ধু-সুভাষদের পাহারার জন্যে সঙিনদার গুর্খা সৈন্য মোতায়েন ছিল। একদিন দেখা গেল গুর্খা সৈন্যের বদলে রুলধারী সেপাই এসে দাঁড়িয়েছে।

'ব্যাপার কী হে সুভাষ?' দেশবন্ধু পরিহাস করলেন : 'শেষটা অসি ছেড়ে বাঁশি? আমরা কি এতই নিরীহ?'

স্বরাজ 'পিপলের', জনসাধারণের জন্যে, পৃথিবীতে এ কথা নতুন নয়। তবে ভারতের রাজনীতিতে এ কথা নতুন বটে। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় ত্রিশ বছর আগে তাঁর 'বর্তমান ভারতে' এ কথা লিখে গিয়েছেন কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যৎ-বাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির মঞ্চে শোনা যায় নি। প্রথম শোনালেন দেশবন্ধু।

'তাঁর অলৌকিক প্রভাবের আরেকটি কারণ আমি বলব।' এই মর্মে লিখছে সুভাষ : 'সে কারণ হচ্ছে তাঁর ধর্মপ্রাণতা। তিনি সর্বদা অনুভব করতেন যে তিনি যা করেন তা সবই তাঁর ধর্মজীবনের অঙ্গস্বরূপ। বৈষ্ণবধর্মের সাহায্যে তিনি বাস্তবে ও আদর্শে এক মধুর সামঞ্জস্য স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেকে ভগবানের অনন্তলীলার যন্ত্রস্বরূপ বলে মনে করতেন। নিষ্কাম কর্মের ফলে চিত্তশুদ্ধি ঘটলে মানুষের অহংকর্তৃত্বজ্ঞান লোপ পায়। অহঙ্কারের লোপ হলে মানুষ দিব্য শক্তির আধারে পরিণত হয়। তখন তার শক্তির কাছে সাধারণ মানুষ দাঁড়াতে পারে না।'

সুভাষ নিজেও ছিল এই দিব্যশক্তির মহাসাধক। শুধু সাধক নয়, মহা-উদ্বোধক। কে তাকে রুখবে? কে তার সামনে দাঁড়াতে সাহস পাবে?

কিন্তু সে কথা পরে।

'জীবনে মরণে শয়নে স্বপনে দেশবন্ধুর ছিল এক ধ্যান এক চিন্তা—স্বদেশসেবা।' আরো লিখছে সুভাষ : 'আর সেই স্বদেশসেবাই তাঁর ধর্মজীবনের সোপানস্বরূপ।'

সুভাষেরও এক ধ্যান এক চিন্তা—সেই স্বদেশসেবা। স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে নিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকাই তো মহত্তম সেবা।

বন্ধু দিলীপকুমারকে এই মর্মে চিঠি লেখে সুভাষ : 'তুমি জানো

আজকের দিনে কিসে আমার মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। আমার বিশ্বাস আমাদের সকলেরই সেই একই চিন্তা—সে হচ্ছে মহাত্মা দেশবন্ধুর দেহত্যাগ। কাগজে যখন এই দারুণ সংবাদ দেখি তখন চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারিনি। কিন্তু হায়, সংবাদটা নিতান্তই সত্য, নির্মম সত্য।'

'যে সব চিন্তা আজ মনে উঠছে সেগুলো এত পবিত্র ও এত মূল্যবান যে অচেনা লোকদের কাছে তা প্রকাশ করা যায় না—আর সেন্সরদের অজানা-অচেনা না মনে করে পারি না। আমি শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে সমগ্র দেশের অপূরণীয় ক্ষতি তো হলই, সব চেয়ে বড় সর্বনাশ হল বাংলার যুবকদের। তিনি ছিলেন চিরনবীন, চিরতরুণ—এক কথায়, তিনি শুধু তরুণের বন্ধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তরুণের রাজা।'

তারপর দার্শনিক সুভাষ দুঃখবাদের কথা তুলল। লিখলে : 'তুমি যখন আসলে এই কথাটাই বলো যে দুঃখটা কষ্ট নয়, তখন আমি তোমার সঙ্গে একমত। জীবনে অবশ্য এমন সব ট্রাজেডি আছে—এই যেমন এখন একটা আমাদের উপর এসে পড়েছে—সেগুলোকে আমি সানন্দে বরণ করে নিতে পারি না। আমি এত বড় তত্ত্বজ্ঞানী বা এত বড় ভণ্ড নই যে বলব আমি সবরকম দুঃখকষ্টই সমস্ত হৃদয় দিয়ে বরণ করে নিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও ভেবে দেখতে হয়, সংসারে এমন কতগুলো হতভাগ্যও আছে—হয়তো তারা সত্যি-সত্যি ভাগ্যবান—যারা সকলরকম দুঃখকষ্ট সহ্য করবার জন্যেই যেন নির্দিষ্ট হয়ে আছে। কম-বেশি যাই হোক, যদি কাউকে পাত্র ভরে দুঃখ পান করতে হয় তা হলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিয়ে পান করা ভালো। এতে আর যাই হোক না হোক, স্বাভাবিক সহ্যশক্তি অনেক বেড়ে যায়।'

সুভাষের আছে সেই সহ্যশক্তি। সেই আত্মশক্তি। সেই শক্তির উৎস সর্বাত্মসমর্পণে। কোথায়? দেশমাতার পূজার বেদীতে।

বাঙালির নিজস্ব সাধনাই মাতৃসাধনা। তারা শুধু ভগবানকেই মা বলে না, তারা দেশকেও মা বলে। তাদের প্রাণদ মন্ত্র বন্দে-মাতরম। তাদের মা অবলা নয়, বহুবলধারিণী রিপুদলবারিণী—প্রবলপ্রচণ্ডিকা রণরামা। 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ।' 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননী ভারতবর্ষ।' 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী, জনকজননী-জননী।'

'নিখিল বঙ্গের মাতা' দেবী বাসন্তীকে দেখ।

তাঁর সম্পর্কে এই মর্মে লিখছে সুভাষ: 'যে দেবী লোকচক্ষুর অন্তরালে মূর্তিমতী সেবা ও শান্তির মত ছায়া হয়ে সর্বদা দেশবন্ধুর পাশে থাকতেন, তাঁকে বাদ দিলে দেশবন্ধুর জীবনে কতটুকু বাকি থাকে, তা কে বলতে পারে? ভোগের উচ্চশিখরে উঠেও যিনি হিন্দু নারীর আদর্শ—লজ্জা, নম্রতা ও সেবা কোনোদিন বিস্মৃত হননি—বিপদের ঘনান্ধকারে যা হিন্দু পতিব্রতার একমাত্র সম্বল, চিত্তস্থৈর্য ও ভগবদবিশ্বাস, হারাননি—সেই দেবীর কথা লিখতে গেলে আমি ভাষা খুঁজে পাই না। দেশবন্ধু ছিলেন তরুণদের রাজা, তাঁর পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী ছিলেন তরুণদের মাতা। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর তিনি আজ শুধু চিররঞ্জন-মাতা নন, শুধু তরুণদের মাতা নন, তিনি আজ নিখিল বঙ্গের মাতা। বাঙালি হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য আজ তাঁর চরণে সমর্পিত।'

মাতা বাসন্তীকে চিঠি লিখল সুভাষ:

'তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হয় আলিপুর জেলে। তখন আমি সংবাদ পেয়েছি যে আমি বহরমপুরে বদলি হব। বিদায়ের সময় আমি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললাম, আপনার সঙ্গে বোধহয় অনেক দিন দেখা হবে না। তিনি উত্তরে হেসে বললেন, 'না, আমি তোমাদের বেশি দিন জেলে থাকতে দিচ্ছি না।' হায়, তখন কি আমি জানি আমার কথা এতখানি সত্য হয়ে দাঁড়াবে! অদৃষ্টের কি পরিহাস!'

মনে পড়ল জেলে থাকতে দেশবন্ধুর কত সে সেবা করেছে, আর সে সেবা তিনি কী অমেয় স্নেহে গ্রহণ করেছেন। সে কথা বারে বারে মনে পড়ছে সুভাষের, মনে পড়ছে শেষ গতি শরণাগতির কথা।

লিখছে: 'আমি বাইরে থাকলে আমার সেবায় কোনো ফল হত কিনা জানিনা। আমার সেবার প্রয়োজন হত কিনা তাও জানিনা। কিন্তু সেবার সুযোগ যে থাকত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আজ যে আমার সেবার সুযোগমাত্র নেই এই কথা ঘুরে ফিরে মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। এবং ব্যর্থ বাসনা ও ততোধিক ব্যর্থ প্রয়াস যেন বারে বারে বন্ধ দুয়ারের গায়ে আঘাত খেয়ে ফিরে আসছে। যেখানে মানুষ সামর্থ্যহীন, সেখানে ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সে ভগবানের শরণাপন্ন হয়। তাই আমি আবার প্রার্থনা করি, তিনিই আপনাকে সান্ত্বনা ও শক্তি দিন। আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করে আমায় ধন্য করুন।'

আলিপুর জেলে বিপ্লবী ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর সঙ্গে সুভাষের আলাপ হয়। বিপ্লবীরা থাকত 'বম্ব ইয়ার্ডে' আর সত্যাগ্রহীরা অন্য এলেকায়। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা বিপুলায়তন হয়ে উঠলে দুই এলেকা আলাদা করে রাখা সম্ভব হল না। যুবকের দল দেয়াল টপকে যাওয়া আসা করতে লাগল। তখন সুপারইন্টেন্ডেন্ট দু দলে মেলামেশার সুযোগ করে দিল।

বিপ্লবীরা জেলে বসে কবে আর বাইরের খাবার খেয়েছে। সত্যাগ্রহীদের বন্ধুতায় বিপ্লবীরা এবার তাই খেতে লাগল—কলা, কমলালেবু, রসগোল্লা! চিড়েগুড়ের কী চমৎকার আস্বাদ তা যেন ভুলেই গিয়েছিল সকলে। একদিন তো দেশবন্ধু ত্রৈলোক্যকে পাশে বসিয়েই খাওয়ালেন। আর খাবার পরিবেশন করল সুভাষ।

ত্রৈলোক্যের ডাক নাম মহারাজ। তার সম্পর্কে সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর সে জীবনের ত্রিশবছর ব্রিটিশের জেলে কাটিয়েছে।

দেশবন্ধুর কাছে কারা গিয়ে নালিশ করলে, বোমা-ইয়ার্ডের

লোকেরা হিংসার কথা বলে ছোকরা সত্যাগ্রহীদের মাথা বিগড়ে দিচ্ছে।

এ অভিযোগে প্রথমটা কর্ণপাত করেননি দেশবন্ধু, পরে আবার সেই অভিযোগ পেশ করা হলে তিনি বললেন, 'বিপ্লবীদের কথা যখন ভাবি তখন আমার সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে যায়।'

একই জাহাজে সুভাষের সঙ্গে মহারাজ চলেছে রেঙ্গুন। সঙ্গী আরো অনেকে, তার মধ্যে আছে সত্যেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র ঘোষ, মদন মোহন ভৌমিক, বিপিন গাঙ্গুলি, হরিকুমার চক্রবর্তী, জীবন গাঙ্গুলি; অবধায়ক স্বয়ং লোম্যান। আর আই-বির দারোগা যে কত, কত যে বন্দুকধারী প্রহরী, তার লেখাজোখা নেই।

জাহাজের তিন দিন সকলের সঙ্গে কী আনন্দে যে কাটল! মান্দালয় জেলে পৌঁছে সুভাষ বললে, আমার পাশেই মহারাজের সিট থাকবে।

এরি মধ্যে আন্দামান ঘুরে এসেছে মহারাজ। আন্দামানে নানা বিরুদ্ধতা করে সে বিখ্যাত হয়েছে। বেত ছাড়া হেন শাস্তি নেই যা তার হয়নি। ক্রস-বার-ফেটার্স, ডাণ্ডা-বেড়ি, শিকলি বেড়ি, খাড়া হাতকড়ি, পিছনে হাতকড়ি, হাতে হাতকড়ি, পেনাল ডায়েট, সেল-বাস—সমস্ত। বেড়ি পায়ে দিতে-দিতে পায়ে কড়া পড়ে গিয়েছে। বেড়ি পায়ে দিয়েই ফুটবল খেলেছে। ফুটবল কোথায়? কম্বলের কুর্তাই ফুটবল।

এমন একজন বিচিত্র কাহিনীতে ভরা বীর বিপ্লবীকে পাশে পেয়ে সুভাষ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করল।

জাহাজের ডেকে মহারাজ ও সত্যেন মিত্র বেড়াচ্ছে, সঙ্গে-সঙ্গে চলেছে আই-বির দারোগাবাবু। সব সময়ে তার কড়া নজর রাখবার কথা, রাজবন্দীরা হঠাৎ কিছু না করে বসে। কিন্তু সত্যেন আর মহারাজ ক্রমশ এমন দ্রুত ছুটতে সুরু করল, দারোগাবাবু আর তাল রাখতে পারল না, ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। মহারাজ আর সত্যেন

তখন দারোগাবাবুর থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে, লোম্যানের আবির্ভাব হল।

লোম্যানকে দেখে দারোগাবাবুর চক্ষু স্থির। ভ্রমণরত বন্দীদের থেকে সে পিছিয়ে রয়েছে, সেই অপরাধেই দুর্ধর্ষ লোম্যান তার চাকরি খেয়ে দেবে।

পই-পই করে ছুটে বন্দীদের সঙ্গ ধরল দারোগা।

'আপনাদের জন্যে আমি মারা যাব দেখছি।' হাঁপাতে-হাঁপাতে দারোগাবাবু বললে, 'আপনাদের পিছু-পিছু ছুটতে ঘোড়া দরকার, মানুষের সাধ্য নেই যে চলতে পারে। লোম্যান সাহেব দেখে ফেলেছে আমি পিছিয়ে রয়েছি।'

মহারাজ হেসে বললে, 'আপনার ভয় নেই, আমি লোম্যান সাহেবকে বলে দেব।'

'সে কী কথা!' দারোগাবাবু হাঁ হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, লোম্যানের সঙ্গে আমার অনেক দিনের খাতির।' বললে মহারাজ, 'আমি আপনার হয়ে সুপারিশ করে দিলে নিশ্চয়ই তিনি আপনার চাকরি খাবেন না।'

'কী সর্বনাশ! আপনি সুপারিশ করবেন? তা হলে আমার চাকরি এই দণ্ডে চলে যাবে।'

দুর্ধর্ষ লোম্যান। টেগার্টের চেয়েও বুঝি এককাঠি সরেস।

'তোমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন জানো?' মহারাজকে ডাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল লোম্যান।

'কেন?'

'যাতে তোমরা কোনো হিংসাত্মক কাজ না করতে পারো।'

'আমি বা আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ কোনোদিন হিংসাত্মক কাজ করিনি।' মহারাজ বললে স্পষ্টস্বরে।

'রাখো।' প্রায় ধমকে উঠল লোম্যান: 'করোনি কিন্তু করবার জন্যে পরামর্শ করছিলে।'

'হিংসাত্মক কাজ করবার জন্যে পরামর্শ লাগে না। তুমি কি মনে করো ইচ্ছে করলে চোখের পলকে দু-চারটে খুন করতে পারতাম না?'

'তা পারতে নিশ্চয়ই। তোমরা তেমনিধারা ভয়ঙ্কর লোক। তাই তো তোমাদের আটকে রেখেছি। কী, ভালো করিনি?' লোম্যান হঠাৎ সুর নামাল: 'আচ্ছা, একটা বিষয়ে তুমি আমাকে কিছু পরামর্শ দিতে পারো?'

'বলুন।'

'দেশের যুবকেরা যে সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে তাদের দমন করবার উপায় কী?'

'সন্ত্রাসবাদী বলবেন না, বলুন বিপ্লবী। টেররিস্ট বলবেন না, বলুন রেভলিউশানারি।'

'রাখো।' লোম্যানের স্বরে আবার ধমক এসে পড়ল: 'আচ্ছা, যুবকদের মধ্যে যে হিংসাত্মক কাজ করবার প্রবৃত্তি জাগছে তা কী করে দমন করা যায়?'

মহারাজও প্রতিবাদে দৃঢ়তর হল। বললে, 'হিংসাত্মক কাজ করবার প্রবৃত্তি নয়, জেগেছে দেশকে স্বাধীন করবার প্রচেষ্টা।'

'বেশ, এই প্রচেষ্টাটাই বা কী করে দমন করা যায়?' লোম্যান তাকাল তীক্ষ্ণ চোখে।

'যতক্ষণ পর্যন্ত ভারতবর্ষ না স্বাধীন হয় ততক্ষণ চলবে এই প্রচেষ্টা। তাকে দমন করা যাবেনা।'

'স্বাধীন!' লোম্যান খেপে গেল। বললে, 'স্বাধীন হবার মত তোমাদের যোগ্যতা আছে?'

'সে যোগ্যতারই তো পরীক্ষা দিচ্ছি আমরা।'

'আমরা যদি ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাই তোমরা তোমাদের দেশকে রক্ষা করতে পারবে?' লোম্যানের গলার স্বর আরো চড়া হল: 'আমরা চলে গেলেই তোমরা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি সুরু করে দেবে।'

মহারাজের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল : 'আমাদের নিয়ে তোমাদের মাথাব্যথা কেন? একবার চলে গিয়েই দেখ না। তা তোমরা কি অমনি-অমনি চলে যাবে?'

এই লোম্যানকেই প্রায় ছ বছর পরে, ১৯৩০ সালের ২৯ শে অগাস্ট ঢাকায় বিনয় বসু গুলি করে মারে।

তখন লোম্যান পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল। বিপ্লবীদের কাছে খবর এসে পৌঁছুল ২৯শে অগাস্ট সে ঢাকায় আসছে।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। বিপ্লবীদের কাছে সে-রব অবশ্যি গূঢ় ও গোপন।

সকালবেলা, নটা বেজে পনেরো মিনিট। নারায়ণগঞ্জ রিভার-পুলিশের ইংরেজ সুপারইনটেণ্ডেন্ট স্ট্রোক হয়ে হাসপাতালে ঢুকেছে, মিটফোর্ড হাসপাতালে। তাকেই দেখতে এসেছে লোম্যান। সঙ্গে ঢাকার পুলিশ-সুপার হডসন।

হাসপাতালের অঙ্গনে লোম্যান হডসনের সঙ্গে কথা বলছে, পিছন থেকে কে একজন নির্ভয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে এল। সন্দেহ করবার অবকাশও নেই এমনি নিরীহ একজন যুবক। হাসপাতালেরই কোনো কর্মী হয়তো। না কি পিছন দিক থেকে কেউ আসছে, পুলিশ-প্রবরেরা আন্দাজই করতে পারেনি।

বিনয় এমনি আত্মস্থ। আর তার হাতের কাজ যেমন ক্ষিপ্র তেমনি অব্যর্থ।

প্রায় ত্রিশ হাত দূর থেকে সে গুলি ছুঁড়ল। পর-পর পাঁচটা গুলি। একটা গুলিও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল না। দুটো গুলি বিদ্ধ করল লোম্যানকে আর তিনটে হজম করল হডসন।

তারপর বিনয় পালাল। আত্মহত্যা করে গ্রেপ্তার এড়াবে তখনো সে সিদ্ধান্তের দরকার হয়নি।

কোত্থেকে হাসপাতালের এক কণ্ট্রাক্টর ছুটে এসে বিনয়ের হাত চেপে ধরল। বিনয় সবলে হাত ছাড়িয়ে নিল। হাত থেকে খসে

পড়ল রিভলভার। তা যাক, জামার পকেটে আরো একটা আছে। খবরদার, আর এগিয়ে এস না।

খবরদার। বিনয়ের সঙ্গে আছে দুজন সহচর। তারাই বুঝি দীনেশ আর সুধীর।

আততায়ীদের ধরা গেল না। পুলিশের ক্রোধ ফেটে পড়ল ডাক্তারি হস্টেলের ছেলেদের উপর। যখন হাসপাতালের কম্পাউণ্ডে এই দুষ্কাণ্ড ঘটেছে তখন, সন্দেহ কী, সংলগ্ন হস্টেলবাসীরাই অপরাধী। তাদের উপরেই হামি হল পুলিশ। পিটিয়ে একান্ন জনকে ঘায়েল করে মিটফোর্ড হাসপাতালেই ভর্তি করালে।

লোম্যান আর হডসন—তারাও ঢুকেছে মিটফোর্ডে। দুজনের দেহেই অস্ত্রোপচার হল। হডসন বেঁচে উঠলেও লোম্যান বাঁচল না।

কিন্তু সেসব কথা আরো পরে।

'আচ্ছা আপনার তো বড় ঘরে জন্ম,' মহারাজ জিজ্ঞেস করল সুভাষকে, 'ছেলেবেলা থেকে কত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে থেকেছেন, জেলের এত সব ক্লেশকষ্ট সহ্য করছেন কী ভাবে?'

'আপনারা যে ভাবে করছেন আমারও সেই ভাব। সবাই আমরা দেশের জন্যে।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু এত সব অখাদ্য খান কী করে? এতটুকুও আপত্তি করেন না!'

'বা, আপত্তি কিসের? আপনারা সবাই খেতে পারলে আমি পারব না কেন?'

আর জেলের চাকরবাকরদের প্রতি সুভাষের কী সস্নেহ ব্যবহার! কোনোদিন এসব দুর্বল নিরীহের প্রতি একটাও কটু কথা বেরুল না তার মুখ থেকে।

কত সামান্যেই মানুষের হৃদয় জয় করা যায়। একটি মধুর স্বর, একটি সস্নেহ হাসি, একটি সদয় করস্পর্শ। শুধু ব্রিটিশ-হৃদয়ই জয় করা গেল না। গান্ধিজিও সেই বিশ্বাস ছেড়ে দিলেন। ও তো শুধু

শাসকের আহ্লাদেই ভরা নয়, শোষকের লুব্ধতায় ভরা। যতক্ষণ শোষণ থাকবে কে করবে অহিংসার ভজনা?

স্বয়ং গান্ধিই বলছেন, 'যে মুহূর্তে শোষণের ভাব চলে যাবে, সেই মুহূর্তেই অস্ত্রসজ্জা দুর্বহ ভার বলে মনে হবে। জাতিগুলি পরস্পরের শোষণে বিরত না হওয়া পর্যন্ত সত্যিকারের নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব নয়।'

কয়েদিরা যখন ছাড়া পায়, প্রায়ই আসে সুভাষের কাছে জামা-কাপড় চাইতে। পারতপক্ষে কাউকে ফেরায় না সুভাষ, যা হাতের কাছে পায় দিয়ে দেয়।

সব সময়েই কায়ে-মনে-প্রাণে একটি সেবার ভাব জাগিয়ে রাখে। যে সেবক হতে জানে না সে নেতা হবে কী করে?

টেনিস খেলতে গিয়ে মহারাজ পড়ে গিয়েছে, হাঁটুর চামড়া উঠে গিয়ে ঘা হয়ে গিয়েছে। নিম পাতা সেদ্ধ-করা জল দিয়ে সুভাষ রোজ নিজের হাতে সেই ঘা ধুয়ে দিচ্ছে, ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছে। কোন ঘরে কার অসুখ করেছে, খবর পেয়েই সুভাষ ছুটছে সেই ঘরে, বসছে তার শিয়রে। সারা রাত জেগে সেবা করছে।

মহারাজ ভাবছে এই মহত্ব আর মাধুর্যের উৎস কোথায়? কোথা থেকে আসে এই সুখে-দুঃখে নির্বিচল ভাব, এই সমপ্রাণতা? মাত্র দেশপ্রেমই কি এর সমগ্র রহস্য? না, এ রহস্য একটি ঠাকুরঘর। জেলের প্রকোষ্ঠেই সুভাষ একটি ঠাকুরঘর তৈরি করেছে। সেই ঠাকুরঘরটিতে সে স্তব্ধ শান্ত হয়ে বসে আর ধ্যান করে। তার সমস্ত প্রাণশক্তিকে ঊর্ধ্বে কোন এক অধ্যাত্মশক্তির সঙ্গে যুক্ত করে। সমস্ত শক্তির আধারই অধ্যাত্মশক্তি। সেই যোগায়, চালায়, পাইয়ে দেয়। সেই শক্তির থেকে বিযুক্ত থাকলে কোনো শক্তিই স্থায়ী হয় না। অধ্যাত্মশক্তিই অপরাভূয়।

এই মান্দালয় জেলেই লোকমান্য তিলক ছয় বছর কাটিয়ে গেছেন। ছয় বছর? হ্যাঁ, দীর্ঘ ছয় বছর। তাই জেল-জীবনে যখনই কোনো ক্লেশকষ্ট এসেছে, তখনই বন্দীরা ভেবেছে এরকম

কষ্টক্লেশ তিলকও ভোগ করে গেছেন। এই উত্তরাধিকারের চেতনাও শক্তি দিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে, উদ্বুদ্ধ করেছে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞায়।

তিলক নিজের হাতে একটি নেবুগাছ পুঁতে গিয়েছিলেন। দেখ সেই গাছে আজ ফল ধরেছে। তিলকের অধ্যাত্মশক্তির সাধনাও কি নিষ্ফল হবে?

সুভাষ বললে, আসুন এবার আমরা জেলের মধ্যে দুর্গাপূজা করি।

সকলে সমস্বরে আনন্দধ্বনিত হয়ে উঠল। দুর্গাপূজা। অশিব-নাশিনী দুর্বৃত্তদমনীর উদ্বোধন।

জেল-সুপার মেজর ফিগুলের কাছে রাজবন্দীরা আবেদন করল, আমাদের দুর্গাপূজা করতে দেওয়া হোক এবং পূজার ব্যয় বাবদ সঙ্গত টাকা মঞ্জুর করা হোক।

ফিগুলে বিচার করে দেখল এ আবেদনে অন্যায় কিছু নেই, অন্তত রাজদ্রোহ নেই। তা ছাড়া ভারতীয় জেলখানায় খ্রিস্টান কয়েদীদের ধর্মাচরণ করবার সুবিধে দেওয়া হয়, সুতরাং হিন্দু বন্দীদের বেলায় ব্যতিক্রম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু চূড়ান্ত অনুমতিদানের কর্তা তো সে নয়, কর্তা স্বয়ং গভর্নমেণ্ট। সুতরাং গভর্নমেণ্টের চূড়ান্ত অনুমতির সাপক্ষে ফিগুলে দরখাস্ত মঞ্জুর করলে। বন্দীরা আয়োজনে লেগে গেল।

গভর্নমেণ্ট আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে। উলটে ভর্ৎসনা করলে ফিগুলেকে। একটা যুদ্ধফেরত মেজর, তার মধ্যে এই কোমলতা কেন?

আয়োজন থামিয়ে বন্দীরা গভর্নমেণ্টকে জানিয়ে দিলে তাদের পূজার আবেদন গ্রাহ্য না হলে তারা অনশন করতে বাধ্য হবে।

করো গে—এমনি একটা বর্বর ভঙ্গি দেখিয়ে গভর্নমেণ্ট অনশনের হুমকিকেও অগ্রাহ্য করে দিল।

বেশ। সুরু হল অনশন।

অনশন সুরু হতে না হতেই বন্দীদের পত্রব্যবহার বন্ধ করে

দেওয়া হল। বাইরের জগতের সঙ্গে থাকলনা কোনো যোগাযোগ। অনশন করে আছ এ খবরটাও বাইরে কাউকে জানাতে পারবে না। শুধু খাদ্যের অনশন নয়, চিত্তেরও অনশন।

কিন্তু কী আশ্চর্য, তিন দিন পরেই ফরোয়ার্ডে অনশনের খবর প্রকাশিত হয়ে গেল।

কী করে খবর পেল ফরোয়ার্ড? গভর্নমেণ্ট হকচকিয়ে গেল। তাদের এত কঠিন গূঢ়চারিতার জাল কে ছিন্ন করল? কারণ শুধু অনুমানই করা যায়, আর অনুমানকে প্রমাণের পর্যায়ে নিয়ে এসেই বা লাভ কী? থলের থেকে বেরাল তো বেরিয়েই পড়েছে।

আরো একটা খবর বেরিয়েছে—সেটা বুঝি আরো মারাত্মক।

ভারতীয় জেল-সংস্কার সম্পর্কে একটা কমিটি বসেছিল। তাতে জেলের ডাক্তার লেফটেনেণ্ট কর্নেল মুলভেনি সাক্ষ্য দিয়েছে। আশ্চর্য সত্যবাদী সাক্ষী। বলেছে, কোনো কোনো রাজবন্দীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যে-রিপোর্ট দিয়েছি আই-জির অনুরোধে সে-রিপোর্ট প্রত্যাহার করে পরিবর্তে আমাকে মিথ্যে রিপোর্ট দিতে হয়েছে।

ইঙ্গিতটা কী? ইঙ্গিত দিনের আলোর মত স্পষ্ট। রাজবন্দীদের স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও মুলভেনিকে ভালো বলতে হয়েছে।

এ খবরটাও বের করল ফরোয়ার্ড। দেশের লোক খেপে গেল। আই-জির অপসারণ চাই।

কিন্তু গভর্নমেণ্ট কি কখনো দেশের কথায় কান দেয়?

দিল্লিতে তখন এসেম্বলি চলেছে। স্বরাজী তুলসীচন্দ্র গোস্বামী মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করল। মান্দালয় জেলে রাজবন্দীদের অনশনের জন্যে আর ঐ মুলভেনির রোমাঞ্চকর সাক্ষ্যের জন্যে। তুলসীচন্দ্রের বক্তৃতা যেমন শালীন তেমনি শাণিত। গভর্নমেণ্ট দন্তস্ফূট করতে পারল না। রাজবন্দীদের পূজার দাবি মেনে নিল

পনেরো দিন পর অনশন ভঙ্গ করল বন্দীরা।

অনশনের আগে সুভাষ এই মর্মে লিখেছিল বাসন্তী দেবীকে : 'মা, আজ মহাষ্টমী। আজ বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এ বছর এখানেই শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা করছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেননি তাই এখানে এসেও তাঁর পূজার্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে। এই ভাবে ক বছর কাটবে জানিনা। তবে মা যদি বৎসরান্তে এসে একবার দেখা দিয়ে যান তবে কারাবাস দুর্বিষহ হবেনা আশা করি।'

অনশন ও অনশনভঙ্গের পর সুভাষ এই মর্মে লিখছে দেশসেবক অনিলচন্দ্র বিশ্বাসকে :

'আপনি বোধহয় শুনেছেন যে আমাদের অনশনব্রত একেবারে নিষ্ফল হয়নি। গভর্নমেণ্ট আমাদের ধর্মবিষয়ে দাবি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন এবং এর পর বাংলা দেশের রাজবন্দী পূজার খরচা বাবদ বছরে তিরিশ টাকা 'এলাউয়েন্স' পাবে। তিরিশ টাকা অতি সামান্য এবং এতে আমাদের খরচ কুলোবেনা তবে যে প্রিন্সিপল গভর্নমেণ্ট এতদিন স্বীকার করতে চায়নি তা যে এখন মেনে নিয়েছে এই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ। টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা।

অনশনব্রতের সব চেয়ে বড় লাভ অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ-লাভ। দাবিপূরণের কথা বাইরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। 'সাফারিং' ছাড়া মানুষ কখনো নিজের অন্তরের আদর্শের সঙ্গে অভিন্নতা বোধ করতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়লে মানুষ কখনো স্থির নিশ্চিন্ত ভাবে বলতে পারে না তার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরো ভালো ভাবে চিনতে পেরেছি এবং নিজের উপরে আমার বিশ্বাস শতগুণে বেড়ে গেছে।'

'বিশ্বজননীতে বিশ্বাস ও ভরসা রেখো', এই মর্মে লিখছে হরিচরণ বাগচিকে : 'তুমি তাঁর কৃপায় সমস্ত বিপদ ও মোহ উত্তীর্ণ হতে পারবে। মনের মধ্যে সুখ ও শান্তি না থাকলে কোনো অবস্থায়—বাইরের অভাব দূর হলেও, মানুষ সুখী হতে পারেনা। সুতরাং সকল কর্তব্য করার সঙ্গে-সঙ্গে বিশ্বজননীর চরণে হৃদয় নিবেদন করা চাই।'

অভয়ার সন্তান বিবেকানন্দ। অভয়ার সন্তান অরবিন্দ। অভয়ার সন্তান সুভাষ।

এগারো

উনিশশো পঁচিশ সালের নয়ুই অগাস্ট।

অহিংসা দিয়ে কিছু হবে না—বিপ্লবীরা পারল না নিষ্ক্রিয় থাকতে। রাতের ট্রেন কাকোরি ছেড়ে লখনৌর দিকে চলেছে, চারজন যুবক গার্ডের ব্রেকভ্যানে উঠে পড়ল। গার্ডকে বললে, তাড়াতাড়িতে তাদের মালপত্র তুলতে পারেনি, ট্রেনটা থামানো হোক। গার্ড অস্বীকার করল। এই কথা! মুহূর্তে দুজন দুটো রিভলভার ওঁচাল—ওঁচাতেই গার্ড কেঁচো হয়ে গেল। একজন দিল চেন টেনে। আর ট্রেন থামতেই কম-সে-কম ষোলজন লোক ব্রেকভ্যানে উঠে পড়ল।

গার্ডের সিন্দুক সরিয়ে নিয়ে গেল ধরাধরি করে।

একজন গুর্খা যাত্রী তার রাইফেল তুলতেই বিপ্লবীদের গুলিতে খুন হয়ে গেল। কে আরেকজন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচাতে গিয়েছিল, তাকেও স্তব্ধ করা হল। আর কোন এক সাহেব সাহস করে ট্রেন থেকে নেমে পড়েছিল বন্দুক নিয়ে, সেও খোঁড়া হয়ে পড়ল মুখ থুবড়ে।

স্টেশনের থেকে খুব বেশি দূরে নয়, একটা ঝোপের মধ্যে পুলিশ পেল সেই সিন্দূকগুলোকে, কিন্তু হায়, সবগুলই লুণ্ঠিত, বলা যায়, অন্তঃসারশূন্য।

বিপ্লবীদের ধরতে-ধরতে সেপ্টেম্বর। আর মামলা সাজাতে-সাজাতে ডিসেম্বরের শেষ।

আসামীর খাঁচায় ঢোকানো হল পঁচিশ জনকে। তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য তিনজন—রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ি, রামপ্রসাদ বিসমিল আর ঠাকুর রোশন সিং। চতুর্থ আরেকজন ছিল, নাম আশফাকউল্লা—সম্প্রতি পলাতক।

রাজেনের পরনে মুসলমানী পোশাক, ডাক-নাম নবাব। আশফাকউল্লার পরনে হিন্দু পোশাক, ডাক-নাম কুঁয়রজি। রামপ্রসাদ আর রৌশন কখনো হিন্দু কখনো মুসলমান, কখনো শিখ কখনো কাশ্মিরি।

দায়রার বিচার শেষ হতে-হতে পরের বছর এপ্রিল। বিচারে রাজেন, রৌশন আর রামপ্রসাদের ফাঁসির হুকুম হল। ইতিমধ্যে আশফাকউল্লাও ধরা পড়েছে, আলাদা বিচারে তার সম্পর্কেও সেই একই আদেশ হল।

রাজেনকে নিয়ে যাওয়া হল গোণ্ডা জেলে, রামপ্রসাদকে গোরক্ষপুর জেলে, রৌশনকে এলাহাবাদ জেলে আর আশফাক-উল্লাকে ফয়জাবাদ জেলে।

সবাই প্রিভিকাউন্সিলে আলাদা-আলাদা আপিল করলে। সবগুলিই পত্রপাঠ বাতিল হয়ে গেল। নিয়মরক্ষার জন্যে বড়লাটের কাছে করুণা প্রার্থনা করা হল, তাও বিনা বিবেচনায় প্রত্যাখ্যাত হতে সময় নিল না।

রাজেনের ভাই গোণ্ডা জেলে এসেছিল শেষ দেখা দেখে যেতে। কাল ভোরে ফাঁসি হবে তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই রাজেনের। সেলে বসে ভজন গাইছে, গীতা আওড়াচ্ছে। ভাইকে দেখে বললে, 'বাড়ি ফিরে গিয়ে আমার জন্যে প্রার্থনা করিস। কী প্রার্থনা? আমার মুক্তির জন্যে নয়, দেশের মুক্তির জন্যে। প্রার্থনা করিস আমি যেন আবার আমার ভারতবর্ষে এসে জন্মাই, আর আবার তার কল্যাণের জন্যে প্রাণ উৎসর্গ করি।'

রামপ্রসাদের সঙ্গে তার বাবা-মা দেখা করতে এসেছে। সুস্থ-সমর্থ জোয়ান ছেলে কয়েক ঘণ্টা পরেই পৃথিবী থেকে অপসৃত হয়ে যাবে—দুঃখিনী মার নাজানি কী ভীষণ লাগবে, সেই অনুভবে কেঁদে ফেলল রামপ্রসাদ।

রামপ্রসাদের মা থমকে গেল। বললে, 'তুমি কাঁদবে এ আমি দেখতে আসিনি।'

রামপ্রসাদ সবিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি দেশের জন্যে প্রাণ দিচ্ছ, তোমার চোখমুখ না জানি আনন্দে কত উজ্জ্বল হয়ে আছে।'

'কই আমি কাঁদিনি তো।' রামপ্রসাদ দু হাতে দু চোখ মুছে ফেলল। জলের লেশমাত্র না রেখে দু চোখে জ্বালল দুটি আনন্দের প্রদীপ।

কিন্তু বুড়ো বাপ যে কেঁদে আকুল।

তখন রামপ্রসাদই বাপকে সান্ত্বনা দিল। বললে, 'মাকে দেখ। মা কেমন ছেলের গৌরবে শোক ভুলেছে। বাবা, তুমিও মার মতো শক্ত হও, আমাকে বুঝতে দাও আমি তোমার যোগ্য উত্তরাধিকারী।'

রৌশনের সঙ্গে কেউ দেখা করতে আসেনি। তার মুখে শুধু এক মন্ত্র—বন্দে মাতরম। যখন ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে উঠছে—বন্দে মাতরম। যখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে—তখনো বন্দে মাতরম।

আশফাকউল্লার ওজন বেড়ে গিয়েছে।

'ওজনবৃদ্ধিতে আপনি সমস্ত রেকর্ড ভেঙেছেন,' বললে জেলর, 'শুধু একজন ছাড়া।'

'তার মানে জেলে ওজনবৃদ্ধির ইতিহাসে আমি দ্বিতীয়, প্রথম নই?'

'না, আরেকজনের নাম পাচ্ছি, তার ওজন বেড়েছিল আপনারো চেয়ে ছ পাউণ্ড বেশি।'

আশফাকউল্লা ম্লান হয়ে গেল, বললে, 'তা হলে জেলে বি-ক্লাশে আমাকে আরো ক দিন রাখুন দয়া করে। ফাঁসি তো দেবেনই, তা কে আর রুখতে যাচ্ছে? আর সামান্য কটা দিন বেঁচে যেতে পারলে উচ্চতম রেকর্ডটা ভেঙে দিতে পারি।'

'তা হয়না। ফাঁসির হুকুম হবার সঙ্গে-সঙ্গেই আপনাকে

কনডেমড সেলে চলে যেতে হবে।' জেলর কী করবে, ফাঁসির প্রতীক্ষা-করা আসামীর আর কোনো ক্লাশ নেই।

'মৃত্যুর জন্যে দুঃখ নেই, কিন্তু হায়, ওজনবৃদ্ধির রেকর্ডটা ভাঙতে পারলাম না।'

আত্মীয়স্বজন যারা দেখা করতে এসেছিল তাদেরকে বললে, 'আনন্দ করো, উৎসব করো, আমিই বোধহয় প্রথম মুসলমান যে দেশের স্বাধীনতার জন্যে ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিল।'

এত সব প্রাণোৎসর্গের প্রদীপ্তি হিন্দু-মুসলমানের আত্মহননের কালিমায় ম্লান হয়ে গেল। উনিশশো ছাব্বিশের এপ্রিলে কলকাতায় দারুণ দাঙ্গা বাধল—মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো নিয়ে। দিল্লিতে আবদুল রসিদ স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করে মারলে।

শ্রদ্ধানন্দ তখন অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে ছিলেন। কে একজন স্লিপ পাঠাল, জরুরি প্রয়োজনে দেখা করতে চাই। কিছুমাত্র সন্দেহ না করে শ্রদ্ধানন্দ তাকে আসতে বললেন, বলুন কী বক্তব্য। আবদুল রসিদ পিস্তলের গুলিতে তার বক্তব্য বললে।

গৌহাটিতে কংগ্রেস বসেছে, সভাপতি শ্রীনিবাস আয়াঙ্গারকে নিয়ে হাতির শোভাযাত্রা বেরুবে এমন সময় শ্রদ্ধানন্দের হত্যার খবর এসে পৌঁছুল। হাতির দলকে খেদিয়ে দেওয়া হল, সমস্ত গৌহাটি—শুধু গৌহাটি নয়, সমগ্র দেশ শোকাভিভূত হয়ে পড়ল।

শ্রদ্ধানন্দের উপর শোকপ্রস্তাবটা মহাত্মা গান্ধিই পেশ করলেন আর তা সমর্থন করল মহম্মদ আলি।

গান্ধি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি আবার বলছি, আবদুল রসিদ আমার ভাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দকে গুলি করলেও আসলে সে তার হত্যাকারী নয়। হত্যাকারী হচ্ছে তারা যারা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমান ও মুসলমানের বিরুদ্ধে হিন্দুকে উত্তেজিত করছে।'

কিন্তু বিপ্লবীদের রণকৌশল অন্যরকম। সেখানে হিন্দু-মুসলমান নেই, শুধু মুক্তিকামী আর মুক্তিরোধীর দল। সেখানে কোনো

ভাগবাঁটোয়ারার প্রশ্ন নেই, সেখানে শুধু সর্বকালের সর্বজনের স্বাধীনতা।

কাকোরি ডাকাতি সম্পর্কে তল্লাসি চালাতে গিয়ে পুলিশ এল দক্ষিণেশ্বরে, বাচস্পতিপাড়া লেনে। পুকুরপাড়ে একটা জীর্ণ দোতলা বাড়িতে গিয়ে হানা দিল। বাড়িতে ঢুকে দেখে এ যে দেখি রীতিমত একটা কারখানা। বারুদ, গুলি, ছররা, বোতলভর্তি নাইট্রিক আর সালফিউরিক এসিড, কাঁচের নল, ব্যাটারি—কিছুরই তো অভাব নেই! আরে এ যে দেখি ছ-ঘরি ওয়েলবি রিভলভার, আর এ যে একটা জ্যান্ত বোমা।

ধরা পড়ল অনন্তহরি মিত্র, বীরেন্দ্রকুমার ব্যানার্জি, নিখিলবন্ধু ব্যানার্জি, হরিনারায়ণ চন্দ্র ও আরো কজন।

সেখান থেকে পুলিশ গেল চার নম্বর শোভাবাজার স্ট্রিটে। সেখানেও পাওয়া গেল অনেক কার্তুজ আর বেলজিয়ামের তৈরি পাঁচ ঘরি রিভলভার।

সে বাড়িতে ধরা পড়ল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরি আর অনন্ত চক্রবর্তী। সূর্য সেনও ছিল, কিন্তু পুলিশ বাড়িতে চড়াও হবার সঙ্গেসঙ্গেই সে যথারীতি হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে অনন্তহরি মিত্রের দশ বছর জেল হল, আর সকলের ভিন্ন-ভিন্ন মেয়াদে। আলাদা বিচারে প্রমোদ চৌধুরির জেল হল পাঁচ বছর।

এ হল অবতরণিকা। এবার আসল নাটক।

ধরপাকড় হল বিচার হল শাস্তি হল—শুধু এতেই পুলিশের তৃপ্তি নেই। তাদের তৃপ্তি যদি কোনো স্বীকারোক্তি আদায় করতে পারে, যদি কাউকে দাঁড় করাতে পারে রাজসাক্ষী করে। কিন্তু এ সব আসামী ফাঁসি যাবে তবু কিছু ফাঁস করবে না।

আই-বির জাঁদরেল অফিসর রায়বাহাদুর ভূপেন চাটুজ্জে কয়েদিদের গা শুঁকে শুঁকে বেড়ায় যদি এখনো কোনো গোপন

সংবাদ বার করতে পারে। তোমরা গেছই, তোমাদের তো কোনো ভবিষ্যৎ নেই, কিন্তু আমাকে যদি কিছু খবরাখবর দিতে পারো, আমার চাকরিতে উন্নতি হয়, আমার সামনে এখনো বিপুল ভবিষ্যৎ।

জেলখানার মধ্যে স্টেট ইয়ার্ডে রোজ আসে ভূপেন, আর কয়েদিদের প্রাণ অতিষ্ঠ করে ছাড়ে। নানা প্রলোভনের জাল পাতে, নানা ভাবে আলাপ-আলোচনায় বিস্তারিত হতে চায়। কয়েদিরা ভাবে একে একেবারে খতম না করতে পারলে শান্তি নেই, কিন্তু জোঁক ছাড়াবার মত পর্যাপ্ত নুন কই?

কয়েদিদের একজন বললে, যদি বোঝো একেবারে শেষ করে দিতে পারবে তাহলে এগোও, নচেৎ আধমরা করে ছেড়ে দিলে ওরো যন্ত্রণা, আমাদেরো যন্ত্রণা।

ভূপেন স্টেট ইয়ার্ডে ঢুকেছে, দোতলার সেল থেকে নিখিল ব্যানার্জি ওয়ার্ডারকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, শিগগির দরজা খুলে দাও, আমার ধুতিটা নিচে উঠোনে পড়ে গিয়েছে।

সরল বিশ্বাসে ওয়ার্ডার দরজা খুলে দিল।

ধুতি কুড়িয়ে আনতে নিচে ছুটল নিখিল। নিচে পৌঁছেই ভূপেনের সামনে পড়ে গেল, আর বলে উঠল, 'নমস্কার।'

প্রত্যভিবাদনের জন্যে যেই ভূপেন দুহাত তুলেছে অমনি নিখিল তার মুখের উপর মারল এক প্রচণ্ড ঘুষি আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তার মাথায় প্রমোদ মারল এক শাবলের ঘা। সেই এক ঘায়েই শেষ হয়ে গেল।

সেপাইটা এদিকে ঝুঁকেছিল কিন্তু প্রমোদ শাবল নিয়ে তাড়া করতেই সে ছুট দিল। তার হাত থেকে বেটনটা কেড়ে নিল অনন্তহরি।

শাবলটা কোত্থেকে জোগাড় হয়েছিল ভূপেনের সাঙ্গোপাঙ্গেরা হদিস করতে পারল না। ওজন নিয়ে দেখা গেল পনেরো সের। লম্বায় বেশি নয়, মাত্র দেড় হাত।

ভূপেনের হত্যার জন্যে নতুন করে মামলা বসল। নিদারুণ মামলা। জেলের মধ্যে খুন, তাও কিনা পুলিশের বড় কর্তাকে। এ যে নতুন করে সেই কানাইলালের কীর্তি।

এ মামলার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী মোটে দুজন। এক, ওয়ার্ডার, দুই, এক যাবজ্জীবনের কয়েদি, খুন-সহ ডাকাতি মামলার আসামী, নাম মতি। কিন্তু যাই বলো, মতি সাক্ষী হতে রাজি নয়। স্বদেশী বাবুদের সে দেবতা বলে ভক্তি করে, তাদের সে কিছুতে ফাঁসাতে পারবে না। আমি তো যাবজ্জীবনের জন্যেই দাগা-মারা, আমার আবার আশাভরসা কী। আমাকে মিছিমিছি প্রলোভন দেখাচ্ছ, আমি বাবুদের কাউকে সনাক্ত করতে পারব না। না, পারব না সাক্ষ্য দিতে। আমি কিছু দেখিনি।

এমন জায়গায় ঘটনাটা ঘটেছে বাইরে থেকে দেখা সম্ভব নয়। তবু ব্রিটিশের পুলিশের অসাধ্য কিছু নেই। গোটা কয় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কয়েদি সাক্ষী জোগাড় হল। তারা নয়কে হয় করে দিল। হ্যাঁ, স্যার, দেখেছি, স্বচক্ষে দেখেছি। সে কী মার! মাথার খুলি চৌচির হয়ে গেল, একটা চোখ বেরিয়ে গেল ছিটকে।

মিথ্যা সাক্ষী না সাজিয়ে পুলিশের উপায় কী। কয়েদিদের কেউ স্বীকারোক্তি করবে না, কেউ রাজসাক্ষী হবে না, না, কেউ দন্তস্ফুট করবে না। যা করতে হয় তোমরা করো। যেমন তোমাদের অভিরুচি।

পুলিশ তাই একরাশ মিথ্যা জড়ো করল। বিচারে প্রমোদ আর অনন্তহরির ফাঁসি হল। অনন্ত চক্রবর্তী, ধ্রুবেশ চট্টোপাধ্যায় ও রাখালের দ্বীপান্তর। বীরেনের ফাঁসির হুকুম হলেও আপিলে ছাড়া পেল। নিখিলও বেকসুর খালাস।

অনন্তহরি আর প্রমোদের শেষ ইচ্ছা ছিল পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে তাদের ফাঁসি হয়। কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ হবার নয়, জেল-কোডে তার বিধান নেই। তখন দু বন্ধুর মধ্যে প্রার্থনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা

সুরু হল—আমার ফাঁসিটা আগে হোক, আমার ফাঁসিটা আগে। এ যেন মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের ক্রিকেট খেলা দেখার জন্যে টিকিটের প্রার্থনা।

সমস্ত পর্বটা সুভাষ মান্দালয়ে। তাকে বাইরে নিয়ে আসার পথ কোথায়?

বাংলার কংগ্রেস একটা পথ বার করল। নভেম্বরে নতুন ইলেকশান হচ্ছে, সত্যেন মিত্র আর সুভাষকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করাও। সত্যেনকে ভারতীয় এসেম্বলিতে, দিল্লিতে, আর সুভাষকে বঙ্গীয় কাউন্সিলে, কলকাতায়। দুজনেই রাজি হল প্রস্তাবে। সত্যেনের বিরুদ্ধে কেউ লড়তে এল না, কিন্তু সুভাষের বিরুদ্ধে দাঁড়াল জে. এন বসু।

দাঁড়ালে কী হবে, বিপুল ভোটাধিক্যে সুভাষ জয়ী হল।

তার মানে দেশবাসী নির্ভুল উচ্চকণ্ঠে জানাল, সুভাষকে আমরা আমাদের প্রতিনিধিরূপে চাই। সে যখন জিতেছে তখন তাকে বাইরে আসতে দেওয়া হোক। সে তো বিনাবিচারে বন্দী। দেশের লোকের বিচারে সে তো জয়ী, সে তো বরবরেণ্য। তার আর এখন জেলে থাকা চলে কী করে?

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বয়ে গিয়েছে দেশবাসীর কথা শোনে!

কিন্তু শীতের দিকে সুভাষের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ল। নিমোনিয়া সেরে গেলেও ঘুষঘুষে জ্বর আর যেতে চাইল না। ওজনও কমতে লাগল।

রেঙ্গুনে মেডিকেল বোর্ডের সামনে উপস্থিত হতে হল সুভাষকে। বোর্ড সুপারিশ করল, বন্দীকে জেলের মধ্যে রাখাটা স্বাস্থ্যসম্মত হবে না।

গভর্নমেন্টের থেকে নিশ্চয়ই একটা অনুকূল আদেশ আসবে, তারই প্রতীক্ষা করছে সুভাষ, নতুন জেল-সুপারের সঙ্গে তার একটা বচসা হয়ে গেল। ফলে সুভাষকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ইনসিন

জেলে। নতুন জেল-সুপারের নাম ফ্লাওয়ারডিউ, কিন্তু সে আসলে না ফুল না শিশির।

'তোমার চেহারা কী ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে!' ব্যথিত বিস্ময়ে ইনসিনের জেল-সুপার বলে উঠল : 'তবু তোমাকে এরা ছাড়েনি?'

সুভাষ তাকিয়ে দেখল এ সেই মেজর ফিণ্ডলে!

'দেখ তুমি ছাড়াতে পারো কিনা।'

ফিণ্ডলে জোর-কলমে লিখল গভর্নমেণ্টকে। বন্দীর স্বাস্থ্যের যা অবস্থা তাকে জেলের মধ্যে পুরে রাখাটা বাঞ্ছনীয় হবে না।

গভর্নমেণ্ট লিখলে, বন্দীকে জিজ্ঞেস করে জানাও সে নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে রাজি আছে কিনা। যদি রাজি থাকে, তবে যাবার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে যেতে হবে রেঙ্গুন থেকে জাহাজ ধরে, অন্য কোনো বন্দর থেকে নয়, না, কলকাতা তো নয়ই।

ও সব সর্তে বদ্ধ হয়ে যাব না। তা ছাড়া যাবার আগে কলকাতা দেখব না, আত্মীয়বন্ধুদের দেখব না, এ হয় কী করে? তারপরে কত দিন থাকতে হবে বিদেশে তারও ঠিকঠিকানা নেই। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল সুভাষ।

তারপর আদেশ এল, বন্দীকে আলমোরায় স্থানান্তরিত করো।

চুপিচুপি স্থানান্তর করার ব্যবস্থা হল। রেঙ্গুন থেকে জাহাজে চড়িয়ে সুভাষকে নিয়ে আসা হল ডায়মণ্ডহারবার। কলকাতা পৌঁছুবার আগেই জাহাজে লোম্যান এসে আবির্ভূত হল। বললে, 'তোমাকে এখানে নামতে হবে।'

সুভাষ ভাবল লোম্যান বুঝি তাকে লুকিয়ে পাচার করে দেবার মতলবেই জাহাজে উঠেছে। 'না, আমি এখানে নামব কেন? কোথায় নামব?'

লোম্যান হাসল। বললে, 'তোমার জন্যে গভর্নর লঞ্চ পাঠিয়ে দিয়েছে। সেই লঞ্চে নামবে।'

'না, লঞ্চে নামব কেন?'

'সেই লঞ্চে মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারেরা আছেন। তাঁরা তোমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে গভর্নরের কাছে রিপোর্ট করবে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে হয় আলমোরা নয় বাড়িফেরা।'

'বোর্ডের ডাক্তার কারা?'

'স্যার নীলরতন সরকার, বিধানচন্দ্র রায়, লেফটেনেণ্ট কর্নেল স্যাণ্ডস আর মেজর হিংসটন।'

তখন সুভাষ আশ্বস্ত হয়ে নামল জাহাজ থেকে।

বোর্ড পরীক্ষা করে তার সিদ্ধান্ত গভর্নরকে টেলিগ্রাম করে দার্জিলিংঙে পাঠিয়ে দিল।

উত্তরের জন্যে এক দিন গভর্নরের লঞ্চে অপেক্ষা করল সুভাষ। পরদিন ১৯২৭-এর ১৬ই মে লোম্যান গভর্নরের উত্তর নিয়ে এল: তুমি খালাস।

কী রকম যেন একটু নতুন-নতুন লাগছে না? তা লাগছে। গভর্নরের বদল হয়েছে যে ইতিমধ্যে। এখন আর লর্ড লিটন নেই, এখন স্ট্যানলি জ্যাকসন। এতদিন পুলিশ কমিশনারই বাংলার লাট ছিল, জ্যাকসন বললে, এখন থেকে আমিই শাসন করব ভাবছি।

এই জ্যাকসনকে লক্ষ্য করেই কলকাতা সেনেট হলে গুলি ছুঁড়ল বীণা দাস—সুভাষের হেডমাস্টার বেণীমাধব দাসের মেয়ে। গুলি ছোঁড়া জ্যাকসনকে নয়, ব্রিটিশ শাসনের দম্ভকে, নির্যাতনকে, নিষ্ঠুরতাকে। গুলি লাগল কি না লাগল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা গুলিটা যে ছুঁড়েছিল, ছুঁড়তে পেরেছিল। বড় কথা হচ্ছে একটি স্বদেশব্রতধারিণী বাঙালি মেয়ে যে তীব্রভাবে অনুভব করেছিল দাসত্বের যন্ত্রণা, চেয়েছিল অগ্নির অক্ষরে তার হাহাকারকে মূর্ত করতে। বড় কথা হচ্ছে তার দুঃসাহসী উৎসাহ, বড় কথা হচ্ছে তার দৃপ্ততার দীপ্তি।

'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্তটিকা।
ধূ ধূ জ্বলে ওঠ ধূমায়িত অগ্নি
জাগো মাতা, কন্যা, বধূ, জায়া, ভগ্নি।
পতিতোদ্ধারিণী স্বর্গস্খলিতা
জাহ্নবী সম বেগে জাগো পদদলিতা,
মেঘে আনো বালা বজ্রের জ্বালা
চিরবিজয়িনী জাগো জয়ন্তিকা॥'

ড্যালহৌসি স্কোয়ারের রাস্তায় টেগার্টকে লক্ষ্য করে বোমা ছোঁড়া হয়েছিল, এবারও সে বোমা ভ্রষ্ট হল, বিদীর্ণ হল ভয়াবহ ব্যর্থতায়। টেগার্টকে একটি ফুলকিও স্পর্শ করল না, মাঝখান থেকে নিজের হাতে বোমা ফাটিয়ে মারা পড়ল অনুজা সেন আর ধরা পড়ল দীনেশ মজুমদার।

দীনেশ অবশ্য পরে পালিয়ে গিয়েছিল জেল থেকে, কিন্তু সে কথা পরে।

বীণা তার বিপ্লবী দলের এক বন্ধুকে বললে, 'আমাকে একটা রিভলভার জোগাড় করে দিতে পারো?'

'পারি। কী করবে?'

'দেখিনা কী করতে পারি।'

মান্দালয় জেল থেকে বেরিয়ে এসে সুভাষ তার মাস্টারমশাইয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছে।

'ওমা, আমার এত ভাগ্য!' পাশের ঘর থেকে আনন্দে বলে উঠলেন বীণার মা।

কথায়-কথায় বীণা সুভাষচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনার মতে দেশ কী ভাবে স্বাধীন হবে, হিংসার পথে না অহিংসার পথে?'

সুভাষ বললে, 'আসল কথা হচ্ছে একটা কিছু পাবার জন্যে

আগে পাগল হয়ে উঠতে হয়। স্বাধীনতার জন্যে আমাদেরও সারা দেশটাকে তেমনি পাগল করে তুলতে হবে। তখন হিংসা-অহিংসার প্রশ্ন আর বড় হয়ে উঠবে না।'

'শিকল-দেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি।
ঝড়ের মাতন, বিজয়-কেতন নেড়ে
অট্টহাস্যে আকাশখানা ফেড়ে
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো সব আন রে বাছা-বাছা।
আয় প্রমত্ত, আয় রে আমার কাঁচা।'

কিন্তু রিভলভার হাতে নিলেই কি ছুঁড়তে পারবে টিপ করে ? বীণা জিজ্ঞেস করলে বন্ধুকে, 'একবারটি প্র্যাকটিস করে নিলে ভালো হত না ?'

কোথায় যাবে প্র্যাকটিস করতে, কোন নির্জনে ? তার আর সময়ই বা কোথায় ? দুদিন পরে কনভোকেশন। গভর্নর আসবে ভাষণ দিতে।

'প্র্যাকটিস লাগবে না।' বন্ধু আশ্বাস দিল : 'বিনয় বোসও প্র্যাকটিস না করেই পেরেছিল মারতে।'

বীণা সেনেট হলে ঢুকবে কোন অধিকারে ? সে স্নাতক। সে যাবে তার বি-এর ডিপ্লোমা আনতে। প্রথম সারির ছাত্রীদের মধ্যে সে আসন নেবে।

জ্যাকসন লিখিত ভাষণ পড়ছে, তার চোখ হাতে-ধরা কাগজের উপর ন্যস্ত, সমস্ত ভক্ত জনমণ্ডলী শ্রবণতন্ময়। বীণা আস্তে-আস্তে সরতে-সরতে মঞ্চের বেশ খানিকটা কাছে এসে দাঁড়াল।

একটা তীক্ষ্ণতম তুঙ্গতম মুহূর্ত। বীণা হাতে-ধরা পাঁচ-ঘরা রিভলভার থেকে জ্যাকসনের উদ্দেশে গুলি ছুঁড়ল। গুলি

জ্যাকসনের কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। একচুলের জন্যে বেঁচে গেল জ্যাকসন।

আর বীণা? সে বাঁচবার, পালিয়ে যাবার পথ তৈরি করে আসেনি। সে জেনে-শুনে ঝড়ের মধ্যে পড়ে জীবনকে আস্বাদ করতে এসেছে—হ্যাঁ, সে ডুবে যেতেও প্রস্তুত।

'তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে
টুকরো করে কাছি
ডুবতে রাজি আছি আমি ডুবতে রাজি আছি।
ঝড়কে আমি করব মিতে
ডরব না তার ভ্রূকুটিতে
দাও ছেড়ে দাও ওগো আমি
তুফান পেলে বাঁচি ॥'

ভাইস-চ্যান্সেলার কর্নেল শারওয়ার্দি বীণার গলা টিপে ধরল। তার হাত থেকে গুলি চলল এলোমেলো কিন্তু কেউই মারাত্মক আহত হল না।

তারপর বিদ্যুৎব্রততী নম্রতায় স্নিগ্ধকান্ত হয়ে দাঁড়াল। দেশ-প্রেমের উচ্ছলিত প্রতিচ্ছবি।

ধরা পড়ার পর বীণাকে আই-বি অফিসে নিয়ে যাওয়া হল। বেণীমাধব এলেন দেখা করতে।

আই-বি অফিসর বেণীমাধবকে বললে, 'ওকে শুধু রিভলভারের সিক্রেটটা বলে দিতে বলুন, তাহলেই ওকে আমরা ছেড়ে দেব।'

বীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: 'আমার বাবাকে আপনারা চেনেন না। আমার বাবা তাঁর মেয়েকে কখনো বিশ্বাসঘাতক হতে শেখান না।'

কন্যাস্নেহে বাবা কাঁদছেন, মা কাঁদছেন, কন্যার মনও না কোন দ্রবীভূত হয়েছে, তবু কন্যার যা কাজ তাই সে সারা জীবন ধরে সম্পন্ন করে যাবে, তা তার 'সর্বাধিক লাজ' হয়েও 'সর্বোত্তম গর্ব' হয়ে থাকবে।

জেল থেকে মা-বাবাকে কবিতায় চিঠি লিখল বীণা :

'মোরে ডাকিও না হেথা একা রব পড়ি
দুটি ক্ষীণ হস্তে মোর আঁকড়িয়া ধরি
সর্বোত্তম গর্ব মোর সর্বাধিক লাজ
মোর সারা জীবনের কাজ।'

ভুলই তো জীবনে ফুল ফোটায়। ভুল আর সত্য তো এক পথেরই সহচর। ভুলকে ঠেকাতে গেলে যে সত্যকেও ঠেকানো হবে। 'ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।' সত্য হোক, ভুল হোক, আসল কথা হচ্ছে অপরিমাণরূপে বাঁচো। ভুলের দুঃখের মধ্যেই সত্যের আনন্দ-জাগরণ। ভুলের উপলখণ্ডের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে সত্যের ধীরস্রোত।

বারো

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের শুধু টালবাহানা, শুধু কালক্ষয়। ভারতবর্ষের ন্যূনতম আকাঙ্ক্ষা ডোমিনিয়ন স্টেটাসটুকুও যাতে দিতে না হয় তার জন্যে যতদূর সাধ্য ঠেকিয়ে রাখা।

সেই উদ্দেশ্যে উনিশশো সাতাশের নভেম্বরে সাইমন কমিশনের ঘোষণা করল পার্লামেণ্ট।

মহাত্মা গান্ধি তখন মাঙ্গালোরে, দিল্লির থেকে হাজার মাইল দূরে। বড় লাট লর্ড আরউইন তাঁকে জরুরি নিমন্ত্রণ পাঠাল। শিগগির আসুন, সুখবর আছে।

মহাত্মা তাঁর ভ্রমণপঞ্জি বাতিল করে দিয়ে দিল্লি ছুটলেন।

কী সুখবর?

আরউইন সাইমন-কমিশনের নিয়োগপত্রটা দেখাল।

'শুধু এই? এর জন্যে ডাকা?' মহাত্মা নির্মম উদাসীন হয়ে গেলেন।

'হ্যাঁ, আমি কী করব, আমি শুধু আমার কর্তব্য করছি।'

আরউইনের কর্তব্য সাইমন কমিশনের পক্ষে ভারতীয় নেতাদের সহানুভূতি সংগ্রহ করা।

মহাত্মা বিনীত স্বরে বললেন, 'এ তো এক-আনার খামেই আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারতেন। মাঙ্গালোর থেকে ডেকে আনবার প্রয়োজন ছিলনা।'

আরউইন বুঝল ভারতীয় নেতাদের সমর্থন পাওয়া সুদূরপরাহত।

শুধু কংগ্রেস নয় ভারতবর্ষের সমগ্র জনসাধারণ সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। যে ভারতবর্ষের এখন স্বাধীনতার

ক্ষুধা, তাকে কিনা বলা হচ্ছে কী খাদ্যের তুমি উপযুক্ত, দেখি বিশদ বিচার করে। এখনো কিনা উপযুক্ততার বিচার! আর বিচারক-মণ্ডলীর মধ্যে একজনও ভারতীয় নয়। এ আঘাতের উপর আবার অপমান। পোড়ার উপর পোড়া, এ অপমান অসহ্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হল, সাইমন কমিশন বয়কট করো। অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলও একই ধুয়ো তুলল, বয়কট করো। শুধু আনসারি নয়, জিন্নাও, শুধু বেশান্ত নয়, তেজবাহাদুর সাপ্রুও। সাইমন কমিশনের নিয়োগ তাই একদিক থেকে দেশের পক্ষে মঙ্গলের হাওয়া নিয়ে এল। কেননা এর আগে সমস্ত দল একসূত্রে এমন করে বাঁধা পড়েনি, এক মন্ত্রে মেলায়নি কণ্ঠস্বর।

সাতজন ইংরেজকে নিয়ে সাইমন কমিশন, তাই তার আরেক নাম সাইমন সেভেন বা সাত সাইমন। কিংবা বলতে পারো, সাত ছাইমন অর্থাৎ সাত মণ ছাই, সাত মণ পণ্ডশ্রম।

উনিশশো আটাশের তেসরা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে নামল আর সেদিন সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হল হরতাল। সর্বত্র এক নিশান এক ইস্তাহার এক প্রচারপত্র, সাইমন ফিরে যাও, ফিরে যাও সাইমন। কোথাও-কোথাও কালো কাগজের ঘুড়ি উড়ল, কোথাও বা কালো রঙের বেলুন, তাতেও ঐ বুলি, ঐ নির্দেশ—সাইমন ফিরে যাও, ভারতবর্ষ শুধু ভারতবাসীর জন্যে। আমাদের ভারত ছাড়া কথা নেই। দয়া করে তোমরা শুধু ভারত ছাড়ো।

হরতালের দিন কলকাতায় ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ হল, মাদ্রাজে গুলি চলল, লখনৌয়ে জহরলাল নেহরু লাঠির বাড়ি খেল। কিন্তু লাহোরে লাজপত রায়ের উপর মারই ভয়াবহ হয়ে দাঁড়াল। মারের ফলে লাজপত রায় মারা গেলেন।

শান্ত শোভাযাত্রা যাচ্ছিল রাজপথ দিয়ে, সঙ্গে ছিলেন লালা লাজপত রায়, সত্যপাল ও অন্যান্য দেশনেতা। পুলিশের হঠাৎ কী

উল্লাস হল, লাঠি চালাতে সুরু করল। ভাবখানা দেখাল যেন এলোপাথাড়ি মারছে, কিন্তু বেশ হিসেব করে কয়েক ঘা বসাল লালাজির উপরে, এবং হিসেব করে, ঠিক বুকের উপরে। লালাজি পড়ে গেলেন, বিছানা নিলেন এবং কিছুকাল পরে চোখ বুজলেন।

পুলিশ-ইনস্পেক্টর স্কটই লালাজির বুকে লাঠি চালিয়েছিল। হিন্দুস্থান সোশিয়্যালিস্ট রিপাবলিকান পার্টির কাউন্সিল ঠিক করল স্কটকে হত্যা করতে হবে।

সেই কাউন্সিলের সদস্য সর্দার ভগৎ সিং, শুকদেব, রাজগুরু আর চন্দ্রশেখর আজাদ।

দাঁড়াও, সুযোগ আসুক। এর মধ্যে দলকে সংহত করো উদ্যত করো মন্ত্রপূত করো।

এদিকে ছাত্র-আন্দোলন জমাট বাঁধল। তার পুরোধা এক দিকে জহরলাল, আরেক দিকে সুভাষচন্দ্র।

এর আগে ছাত্রদের কোনো সঙ্ঘ ছিল না সংগঠন ছিল না। কমিশনবর্জন আন্দোলনে ছাত্ররা যোগ দিচ্ছিল বলে নিয়মভঙ্গের অপরাধে তাদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ আঘাত হানছিলেন, তার বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ জানাবার মত ছাত্রদের কোনো সংস্থান ছিল না। এবার ছাত্রদল গঠন করো।

'আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল,
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড়বাদল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল
বক্ষে ভরা বাক,
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন
নিত্য কালের ডাক,

আমরা তাজা খুনে লাল করেছি
সরস্বতীর শ্বেত-কমল।
আমরা ছাত্রদল॥'

পুনায় মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মিলনে সভাপতিত্ব করল সুভাষ। তার প্রধান বক্তব্য হল কংগ্রেসকে এখন দুটি নতুন শক্তিকে সঙ্ঘবদ্ধ করার আন্দোলন করা উচিত—এক যুবশক্তি, আরেক শ্রমশক্তি। আর মেয়েরাও নিজেদের নিয়ে রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তুলুক। যেখানে যত শক্তি যত সম্ভাবনা বর্তমানে সুপ্ত বা স্তিমিত আছে, সমস্তকে বহুবিচিত্রশিখায় উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে স্তূপীভূত দাসত্বের আবর্জনাকে দগ্ধ-নষ্ট করবার জন্যে।

সবরমতি আশ্রমে মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে গেল সুভাষ। বললে, 'আপনি চলুন, চালান আবার দেশকে। সাইমন কমিশনের বর্জন উপলক্ষে সমস্ত দেশ বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র—'

গান্ধির শান্ত কণ্ঠে বিষাদের সুর বেজে উঠল: 'আমি কোথাও আলো দেখতে পাচ্ছি না।'

'সে কী! আপনার চোখের সামনে বারদোলি নো-ট্যাক্স আন্দোলনে প্রস্তুত হয়েছে, বিক্ষোভের ঢেউ তুলেছে—এটা কি আলো নয়?'

এই বারদোলি আন্দোলনই উনিশ শো বাইশ সালে মহাত্মা প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু এবছর নতুন সেটলমেণ্টে বারদোলি মহকুমার খাজনা প্রায় শতকরা পঁচিশ টাকা হারে বেড়ে গেল। আমরা বাড়তি খাজনা দেব না—করপীড়িত জনগণের প্রতিভূ হয়ে ঘোষণা করলেন বল্লভভাই।

স্বরাজের জন্যে নয়, অত সুদূর ও দুরূহ কথা বোঝে না চাষীরা—আন্দোলন বাড়তি খাজনা বরবাদ করার জন্যে, ভারমোচনের উপশমের জন্যে। এক কথায়, অতি সহজে, সকলে জোট বাঁধল, প্রতিজ্ঞায় ঘনীভূত হল। দেব না খাজনা।

যথারীতি লেলিয়ে দেওয়া হল পুলিশকে। খাজনা দেবে না তো অস্থাবর মালামাল ক্রোক করো। মালামাল না পাও তো গরু-মোষ ধরো।

একজন নিরীহ হিন্দু চাষীকে পুলিশ পরোয়ানা দেখাল। বললে, 'খাজনা দাও।'

'নতুন খাজনা দেব না। যদি পুরোনো হারে নিতে চাও তো দিতে পারি।'

'না, নতুন খাজনা দিতে হবে।'

'দেব না।'

'না দিলে তোমার সমস্ত গরু-বাছুর ক্রোক করে নেব।'

'নাও গে। তবু নতুন হারে খাজনা দেব না।'

ভেবেছিল লোকটা বুঝি ভীতু, পুলিশ দেখে ঘাবড়ে যাবে, গরু-বাছুর ধরে নিয়ে যেতে দেখলে কেঁদে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু লোকটা অনমনীয় স্থির হয়ে রইল।

পুলিশ তখন গেল এক মুসলমান রায়তের বাড়িতে।

'তুমি নিশ্চয়ই গোলমাল করবেনা, ভালোয়-ভালোয় নতুন খাজনা দিয়ে দেবে।'

'মাফ করুন, নতুন খাজনা দিতে পারবনা।'

'সে কী! ওসব গোলমাল তো হিন্দুরা করবে। তুমি মুসলমান, ভালো মানুষ, তুমি কেন ওসবের মধ্যে যাও?'

গরিব রায়ত হাসল। বললে, 'খিদের মধ্যে খাজনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নেই।'

না, এতটুকুও বিচলিত হল না। গরু-বাছুর ধরে নিয়ে গেলেও না।

পুলিশ দিয়ে হবে না, পাঠান নিয়ে এস।

কোনো ক্রোক-নিলামে বাধা দিচ্ছে না প্রজারা। আশাতীতরূপে তারা অহিংস থেকেছে। তবু পাঠান সৈন্য আমদানি করবার হেতু কী? শুধু বিমর্দন করবার জন্যে।

এসেম্বলির প্রেসিডেন্ট বিঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে লিখল এরকম অত্যাচার চললে তিনি পদত্যাগ করবেন।

সমস্ত বোম্বাই প্রদেশ জুড়ে সুরু হল অহিংস সংগ্রাম। গভর্নমেণ্ট বুঝল, আগুন আর বাড়তে দেওয়া উচিত হবে না, যেহেতু খাজনা বৃদ্ধির পিছনে যুক্তির জোর নেই। সুতরাং গভর্নমেণ্ট পিছন ফিরল, বারদোলির বাড়তি খাজনা মকুব করে দিল।

গভর্নমেণ্ট হার স্বীকার করে নিতেই উত্তেজনা জুড়িয়ে গেল। কংগ্রেস ঝড়ের হাওয়াটাকে নিজের পতাকার সঙ্গে বেঁধে নিতে পারল না।

তবু অন্য দিকে উত্তেজনা ছিল, ছিল রণোদ্যম। নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন হল কলকাতায়, সভাপতি জহরলাল। খড়্গপুরে রেলকর্মচারীরা ধর্মঘট করলে। তারপর ধর্মঘট হল জামশেদপুরে, লোহা-ইস্পাত কারখানায়, বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলে, লিলুয়ায় রেল-ওয়ার্কশপে, বজবজে পেট্রোল ডিপোতে। ট্রেড-ইউনিয়ন আন্দোলন দৃঢ় হতে দৃঢ়তর হতে লাগল, ছড়িয়ে পড়তে লাগল কমিউনিস্ট-ভাবনা।

তবু গান্ধি তাঁর দণ্ডী অভিযান সুরু করতে দু'বছর দেরি করে ফেললেন। তাঁর ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখলেন, এ অভিযান দু'বছর আগে উনিশশো আটাশ সালেই আরম্ভ করা ঠিক ছিল। দেশ অকারণে দু'বছর পিছিয়ে গিয়েছে।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে কলকাতায় কংগ্রেস হচ্ছে, এগারোই ডিসেম্বর লাহোরে ইংরেজ পুলিশ ইনস্পেক্টর স্যাণ্ডার্স খুন হল।

ক্ষুদিরামের মতই বুঝি ভুল হল রাজগুরুর। স্কট ভেবে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করল। কিন্তু এই ভুল ব্যক্তিগত হিসেবে বিশেষ মারাত্মক নয়, যেহেতু স্কট আর স্যাণ্ডার্স এক পালকের পাখি। দুজনেই পুলিশের উদ্ধত ধ্বজস্তম্ভ।

পুলিশ সুপারইণ্টেণ্ডেণ্টের অফিস থেকে যথারীতি বেরিয়ে তার

মোটরবাইকে উঠতে যাচ্ছে স্যাণ্ডার্স, রাজগুরু ছুটে এসে রিভলভার উঁচিয়ে তার মাথায় গুলি মারল। গুলি খেয়েই স্যাণ্ডার্স মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। ছুটে এল ভগৎ সিং। সেও তার রিভলভার থেকে কটা গুলি স্যাণ্ডার্সকে উপহার দিল।

তারপর দুজনে প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে এমন উদাসীন ভাবে চলে গেল যেন তারা বিকেলবেলা এমনি বেড়াতে বেরিয়েছে।

না, একটা সাহেব সার্জেন্ট তাদের পিছু নিয়েছে। পিছু নিয়েছে স্যাণ্ডার্সের গার্ড, চন্নন সিং। বিপ্লবীরা ডি-এ-ভি কলেজের বোর্ডিঙের দিকে এগিয়ে চলল। একজন ফিরে দাঁড়িয়ে সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। গুলি লাগল না। সার্জেন্টও বিরত হল না অনুসরণ থেকে। কিন্তু এমনি দুর্দৈব, পা পিছলে পড়ে গেল সার্জেন্ট —আর পড় তো পড়, তার হাত ভেঙে গেল।

চন্দ্রশেখর আজাদ কাছেই ছিল ঘাপটি মেরে, সে চন্নন সিঙের তলপেটে গুলি বেঁধাল। চন্নন সিংকে আর উঠতে হল না।

বিপ্লবীরা বোর্ডিঙে ঢুকে পিছনের দেয়াল টপকে বেরিয়ে গেল। সেখানে তাদের সাইকেলগুলো মজুত ছিল, সেগুলোকে সহায় করে কতদূর এগিয়ে গিয়ে একটা প্রতীক্ষমান মোটরগাড়িতে চড়ে বসল, তার পরই হাওয়া।

রাভি নদীর পারে সমস্ত বন চষে ফেলল পুলিশ কিন্তু পরিত্যক্ত সাইকেল কটা ছাড়া আর কিছুই ধরতে পারল না।

যথারীতি পুলিশ দয়ানন্দ-য়্যাংলো-বেদিক কলেজের একগাদা ছাত্র গ্রেপ্তার করলে। কিন্তু দিন দশেক পরে লাহোরের দেয়ালে-দেয়ালে হাতে-লেখা পোস্টার পড়ল : 'আমার রক্তের তৃষ্ণা এখনো নিবৃত্ত হয়নি। আমি আরো পাঁচ দিন লাহোরে আছি। যে পারো ধরো আমাকে। আমাকে ধরবার জন্যে সরকার যা পুরস্কার দেবে তার উপরে আরো পাঁচশো টাকা আমি দেব। চন্নন সিংকে খুন করার আমার ইচ্ছে ছিল না, তবে যে কেউ পথের প্রতিবন্ধক হত

সেই গুলি খেত।' পোস্টারে স্বাক্ষর পড়ল : 'ভারতীয় বিপ্লববাহিনীর প্রধান সেনাপতি।'

পুলিশ এলোপাথাড়ি গ্রেপ্তার করতে লাগল। পুলিশ যতই দুর্দান্তপনা করে ততই দেয়ালে-দেয়ালে জ্বলন্ত ভাষায় পোস্টার পড়ে। পুলিশ উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে উঠল। শেষে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে বিবেচনা করে দেখল বেশির ভাগ পোস্টারই পুলিশ-খ্যাপানো কৌতুক। কিন্তু প্রথম পোস্টারটা? কে সে প্রধান সেনাপতি?

এদিকে উনিশশো আটাশের ডিসেম্বরে কলকাতায় পার্ক-সার্কাসে কংগ্রেস বসল। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু সভাপতি আর সুভাষ বিরাট ভলানটিয়ার-বাহিনীর প্রধান অধিনায়ক, জেনারেল অফিসর কম্যাণ্ডিং।

'ভলানটিয়ার্স, ফল ইন।' সুভাষের মেঘগম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর চারদিকে একটা শৃঙ্খলা ও শক্তির সামরিক আবহাওয়া নিয়ে এল।

কে জানত এই হচ্ছে ভবিষ্যৎ মহানাটকের স্টেজ-রিহার্সেল।

ভলানটিয়রদের পোশাকের জন্যে একটা মোটা টাকা অভ্যর্থনা সমিতির থেকে মঞ্জুর করিয়ে নিল সুভাষ। কারু কারু কাছে বা এটা বাড়াবাড়ি মনে হল, সামান্য পোশাকের জন্যে এত খরচ!

'পোশাককে কে সামান্য বলে? পোশাকই চরিত্র গঠন করে, যা মানুষ হতে চায় পোশাকই সেই দিকে তাকে এগিয়ে দেয়। যে সৈন্য যুদ্ধ করবে তার ইউনিফর্ম থাকবে না?' বললে সুভাষ, 'হ্যাঁ, সৈন্য বৈ কি। আমার ভলানটিয়াররা সৈন্য আর এই কংগ্রেস-অঙ্গনই যুদ্ধক্ষেত্র।'

প্রতিপক্ষ কে, সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা নেই আশা করি। প্রতিপক্ষ ঐ বলদর্পী ব্রিটিশ শাসন।

দেখ দেখ কী সুসম্বদ্ধ শৃঙ্খলাছন্দিত এই 'বেঙ্গল ভলানটিয়াস'! দেখ এর মাস-প্যারেড, এর মার্চ-পাস্ট, এর রুট-মার্চ। সজ্জায়-

সমারোহে স্পন্দনে-স্ফুরণে দীপ্তিতে-দৃঢ়তায় এ যেন এক নতুন জীবনের জয়গান। আর এই গানের গায়ক-গাথক সুভাষচন্দ্র। আর তার প্রধান সঙ্গতকার সত্য গুপ্ত। আর যতীন দাস।

এ তো হল বাইরের রূপসজ্জা। কিন্তু ভিতরে, কংগ্রেসের মূল অধিবেশনে কী হল? সেখানে কোথায় সামরিকতা? সেখানে সেই পুরোনো গড়িমসি, সেই পুরোনো দাঁড়ি পাল্লার ওজন নেবার পরিহাস। সরকারকে আবার সেই সময় দেবার প্রহসন। উনিশ শো উনত্রিশের একত্রিশে ডিসম্বরের মধ্যে যদি ডোমিনিয়ন স্টেটাস বা ঐ জাতীয় কনস্টিটিউশান না দাও তবে আমরা ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন করব। যেন এখুনি-এখুনি আন্দোলন সুরু করে দেবার সময় আসেনি। এখনো যেন শৈথিল্যে আলস্যে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে নেবার সময় আছে। সুভাষের সমস্ত মন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এরই জন্যে আয়োজন করেছিল সে সভাপতির শোভাযাত্রা, যার জুড়ি এর আগে আর কখনো দেখেনি কংগ্রেস! এরই জন্যে এই বি-ভি, সমরপিপাসী সেচ্ছাসেবকের দল!

না, পূর্ণ স্বাধীনতার কমে কিছুতেই তুষ্ট হবে না কংগ্রেস—কিছুতেই না—এই মর্মে সংশোধনী প্রস্তাব তুলল সুভাষ। জহরলাল তাকে সমর্থন করল।

তবু সংশোধন প্রস্তাব পাশ হল না।

ডোমিনিয়ন স্টেটাস? এখনো ডিমিনিয়ন স্টেটাস! যেন এক বছর বসে চুপচাপ চরকা কাটলেই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট সেধে ভারতবর্ষের হাতে ঐ খইয়ের মোয়া উপহার দেবে। প্রখরনখর সংগ্রাম ছাড়া সূচ্যগ্র ভূমিও দেবে না।

প্রায় দশহাজার শ্রমিক বিরাট শোভাযাত্রা করে কংগ্রেস মণ্ডপে এসে উপস্থিত হল। জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন জানাল আর সমস্বরে ঘোষণা করে গেল শ্রমিকদের লক্ষ্যও পূর্ণাবয়ব স্বাধীনতা। শুধু শাসনের থেকে মুক্তি নয়, শোষণের থেকেও মুক্তি।

এই শ্রমশক্তির জাগরণেও কংগ্রেস আলোকের আভাস খুঁজে পেল না? ভাবল এখনো আলস্য করার সময় আছে?

ইনকিলাব জিন্দাবাদ।

উনিশশো উনত্রিশের আটুই এপ্রিল দিল্লির এসেম্বলিতে দু-দুটো বোমা ফাটল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল আওয়াজ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বর দত্তের কণ্ঠেই এ মন্ত্রের প্রথম উচ্চারণ।

তখন বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছে, গভর্নমেণ্ট ট্রেডস ডিস-পিউটস বিল পাশ করতে চাইছে, এ নিয়ে প্রেসিডেণ্ট বিঠলভাই প্যাটেল তাঁর রুলিং দিচ্ছেন, গ্যালারির থেকে দ্রুত নেমে এসে দুটি যুবক বোমা ছুঁড়ে মারল। কোনো মানুষকে লক্ষ্য করে নয়, শুধু উচ্চনাদ প্রতিবাদ জানাবার অভিলাষে।

সার্জেণ্টরা ছুটে এল চারদিক থেকে। যুবক দুটি বিনা আড়ম্বরেই ধরা দিল।

একজনের বয়েস চব্বিশ, নাম ভগৎ সিং, আরেকজনের বয়েস বাইশ, নাম বটুকেশ্বর দত্ত। ভগৎ সিং পাঞ্জাবি, বটুকেশ্বর পাঞ্জাবে মানুষ হলেও বাংলার ছেলে।

'আমরা আমাদের কাজ করেছি।'

'কী কাজ?'

'দেশের কাজ।'

'দেশের কাজ! এই বোমা ফাটানো!'

'হ্যাঁ, এই বোমা ফাটানো। দেখলেন না, আমরা কোনো মানুষকে আঘাত করিনি, আমরা আঘাত করেছি প্রতিষ্ঠানকে, এই অসার এসেম্বলিকে। শুধু অসার নয়, অপমানজনক। এই এসেম্বলিই যত কদর্য আইন পাশ করে আমাদের দেশকে পৃথিবীর চোখে হেয় করছে, এই এসেম্বলিই ব্রিটিশ শাসনের কায়েমি দুর্গ, এর বিরুদ্ধেই আমাদের এই প্রতিবাদ। হ্যাঁ, বধিরকে শোনাবার জন্যেই এই

বোমার শব্দ, নিদ্রিতকে জাগিয়ে দেবার জন্যে। আর যে ভাবছ আরামে আছ সে এর থেকে দেখে নাও বিপদের সঙ্কেত।'

নিম্ন আদালত ভগৎ সিংকে জিজ্ঞেস করল: 'বিপ্লব বলতে তুমি কী বোঝ?'

'এক কথায় বুঝি জন-জাগরণ। ব্যক্তির হত্যা নয়, সমাজের পরিবর্তন। যে অবিচার ও অসাম্যের উপর বর্তমান সমাজের প্রতিষ্ঠা তারই উৎসাদন আমাদের বিপ্লব। যে ফল শ্রমিকেরা উৎপাদন করে দিচ্ছে তার উপযুক্ত অংশ থেকে তারা বঞ্চিত হবে, আর মালিক সিংহের ভাগ আদায় করে নিয়ে অপচয়ের তুবড়ি ছোটাবে—না, এ কিছুতে হতে পারবে না। যাতে তা না হয় তারই জন্যে আমাদের এই মাস-য়্যাকশনের চেষ্টা।'

প্রথম মামলা বোমা-বারুদ রাখবার অপরাধে। হত্যা করবার চেষ্টার অপরাধে।

বিচার আরম্ভ হবার দিন কোর্টে আসামীদের আনতেই উঠল আবার সেই জয়ধ্বনি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক, তারপর বিচার শেষে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ শুনেও সেই জয়নিনাদ, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

একটা মামলাতেই শেষ হল না। গভর্নমেণ্ট সুরু করল দ্বিতীয় মামলা স্যাণ্ডার্সের হত্যাকে কেন্দ্র করে—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা, তাতে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর ছাড়াও জড়ানো হল আরো বারো জনকে। তাদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ দাস, রঘুনাথ বা শিবরাম রাজগুরু, শুকদেব, অজয় ঘোষ, চন্দ্রশেখর আজাদ আর ভগবতীচরণ। এদের মধ্যে চন্দ্রশেখর আর ভগবতীচরণ পলাতক।

আমরা সাধারণ কয়েদি নই, আমরা রাজনৈতিক কয়েদি, আমাদের প্রতি জেলের আচরণ একটু ভদ্র হওয়া উচিত—এই দাবিতে আসামীরা অনশন করতে চাইল।

'তুমিও অনশন করছ তো?' যতীনকে জিজ্ঞেস করল কেউ-কেউ।

'ভাবছি করা ঠিক হবে কিনা।'

'ভাবছ। ঠিক হবে কিনা!'

'হ্যাঁ, কেননা এ এক ভীষণ খেলা।'

'ভীষণ খেলাই তো খেলতে চলেছি আমরা। তুমি আমাদের দলে আসবেনা? দল-ছুট হয়ে থাকবে?'

'সেই তো আবার ভাবনা। দলছাড়া হই কী করে? কিন্তু শোনো,' যতীনের হাসিমুখ গম্ভীর হয়ে উঠল: 'যদি এ খেলা একবার আরম্ভ করি শেষ পর্যন্ত খেলে যাব।'

'শেষ পর্যন্ত!'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ না দাবি স্বীকৃত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত। তার আগে যদি মৃত্যু ঘটে মৃত্যু পর্যন্ত।'

সুরু হল অনশন।

আর যে যাই ভাবুক, যতীন শুধু ভাবছে মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। সে সুভাষের ভলানটিয়ার বাহিনীর মেজর, সে প্রগাঢ়-প্রতিজ্ঞ।

ভগৎ সিং আর বটুকেশ্বরের পক্ষে অনশন তো জেল-আইন-ভঙ্গের শামিল। তারা তো সাজা-পাওয়া কয়েদি। সুতরাং অনশনের অপরাধে তাদের হাতে পায়ে বেড়ি পরাও। দুর্বলতার জন্যে হাঁটতে-চলতে না পারে স্ট্রেচারে করে কোর্টে নিয়ে চলো। দেখি কত দিন থাকতে পারে না খেয়ে।

স্ট্রেচারে করে আনা হয়েছে কোর্টে, দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, তবু ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গে ভগৎ সিং চেঁচিয়ে উঠেছে: ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আর বটুকেশ্বর চেঁচিয়ে উঠেছে: সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক।

কিছুতেই যে নত হয় না বিপ্লবীরা। তখন সুর হল ফোর্সড ফিডিং—জোর করে খাওয়ানো। পাঁচজন জোয়ান জেলখাটা ওয়ার্ডার আর একজন ডাক্তার প্রত্যেক সেলে এসে ঢোকে, আসামীকে মেঝের উপর পেড়ে ফেলে দুজন দুটো হাত দুজন দুটো

পা আর একজন মাথাটা চেপে ধরে। আসামীর দাঁতে দাঁত লাগানো, তাই মুখ দিয়ে কিছু খাবার পাঠানো অসম্ভব। তাই ডাক্তার তার নাকের মধ্যে দিয়ে নল চালিয়ে পাকস্থলীতে দুধ পাঠায়। পেটে দুধ কিছুটা পৌঁছে দিতে পারলে আসামীকে রাখা যাবে চাঙ্গা করে। আর দুধ যাতে যেতে না পারে তারই জন্যে আসামীর ঝটাপটি। ছ-ছটা ডাকাতের বিরুদ্ধে একজন উপবাসীর লড়াই, তাই ধস্তাধস্তিটাও নিদারুণ ক্লেশকর। ওয়ার্ডাররা সামলাতে না পারে, পাঠান সৈন্য তলব করো। শুধু মার খাওয়াও না, মেরে খাওয়াও।

ভগৎ সিং কোর্টে এসে দেখাল কী রকম নৃশংস প্রহার করেছে পাঠানেরা, এই দেখুন সে সব চিহ্ন।

মহিমার্ণব আদালত দেখেও কিছু দেখল না। ভাবখানা এই, আহার খেলে কে আর প্রহার খায়!

কিন্তু বটুকেশ্বর কই?

মারের চোটে বটুকেশ্বর অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

আসামীদের সেলে কলসীতে জল নেই, কী সদাশয় ব্যবস্থা, কলসীতে দুধ! পয়োমুখ নয়, সত্যিসত্যিই পয়ঃকুম্ভ। অর্থাৎ তেষ্টা পেলে জলের অভাবে আসামীরা যাতে দুধ খেতে বাধ্য হয়। জান্তে অজান্তে ভ্রান্তে আসামী দুধ খেলেই তো কর্তৃপক্ষের আনন্দ, আরো ভোগান্তি বাড়ানো যাবে ওদের। কিন্তু দুধ কে ছোঁবে! দুধের স্বাদ ঘোলে মিটলেও জলের স্বাদ দুধে মেটে না।

আসামী অজয় ঘোষ জলের আশায় কলসী গড়াতে গিয়ে দেখল, দুধ।

পাগল হয়ে যাবার মত হল। এমন তেষ্টা পেয়েছে, মনে হল খানিকটা দুধই না শেষ পর্যন্ত খেয়ে ফেলে।

দরজার প্রহরীকে ডাকল অজয়। বললে, 'একটু জল দিতে পারো? অন্তত কয়েক ফোঁটা জল। এই দেখ জিভ কেমন ফুলে

গিয়েছে, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে, হাত-পা জ্বলছে—অন্তত কয়েক ফোঁটা জল—'

প্রহরী বললে, 'হুকুম নেই।'

'হুকুম নেই! জলের বদলে দুধ দেওয়ার হুকুম?' খেপে গেল অজয়। দুধের কলসীটা দু হাতে তুলে ধরে সবলে ছুঁড়ে মারল। দুধে স্নান করে উঠল প্রহরী।

অনশনীদের সহানুভূতিতে সারা দেশ আন্দোলিত হয়ে উঠল। বন্দীদের দাবি ন্যায়সঙ্গত, সুতরাং সে সামান্য দাবি মেনে নিয়ে সরকার এ সব অমূল্য জীবন নির্বিঘ্ন করুক।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। জোর ছাড়া চোরও ধর্মশাস্ত্রে কান দেয় না।

একটা অসভ্য দেশের সরকারও বোধকরি এত বর্বর হয় না।

যতীন দাসকে জেল-হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার অবস্থা দিন-কে-দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ওষুধের সঙ্গে জল মেশানো হয়েছে বলে ওষুধও সে খাবে না।

তখন সরকারের বিবেকে বুঝি একটু মোচড় লাগল। আদেশ জারি করল, ডাক্তারি কারণে আসামীকে বিশেষ আহার্যের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

ডাক্তারি কারণ! আসামীরা এ অনুগ্রহ নিতে রাজি হল না। তাদের ডাক্তারি কারণ নয়, মানবিক কারণ। শুধু মনুষ্যত্বের ন্যূনতম মর্যাদার দাবিতে তাদের এই অনশন।

ডাক্তার রিপোর্ট দিলে যতীনকে জোর করে খাওয়াবার আর অবস্থা নেই। তার প্রবল জ্বর হয়েছে, দেখা দিয়েছে নিমোনিয়া।

তবু সরকারের পাথুরে বিবেকে দংশন ফুটল না। বরং অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়ে নিল, আসামী যদি স্বকৃত কর্মের ফলে কোর্টে অনুপস্থিত থাকে তবে তাকে ছাড়াই বিচার চালিয়ে যাওয়া যাবে।

কার বিচার করবে? যে অনুপস্থিত তার বিচার? কিন্তু যে

শত ডাকেও ফিরবে না, ভূরিভোজে নিমন্ত্রণ করলেও আসবে না, তার বিচার কে করবে, কোথায় করবে ?

গভর্নমেণ্ট একটা জেল-অনুসন্ধান কমিটি বসাল যে দেখবে বিচারপ্রার্থী বন্দীদের কী সুবিধে পাওয়া উচিত, আর যারা সাজা-পাওয়া বন্দী তারাই বা কতটুকুর হকদার ! এর ফলে দোসরা সেপ্টেম্বর লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার অন্যান্য বিপ্লবীরা তাদের অনশন ভঙ্গ করলে কিন্তু যতীন ফিরল না, সে যথোক্তবাদী, যা বলেছিল তাই করল। দাবি অপূর্ণ থাকলেও সে পূর্ণ হয়ে চলে গেল।

তেষট্টি দিন অনশনের পর উনিশ শো উনত্রিশের তেরোই সেপ্টেম্বর সে মহাপ্রয়াণ করলে।

আয়ার্ল্যাণ্ডের টেরেন্স ম্যাকস্যুইনিও ইংরেজের জেলে এমনি অনশনে প্রাণ দিয়েছিল। তার স্ত্রী মেরি ভারতবর্ষে টেলিগ্রাম পাঠাল : 'যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুতে শোকে ও গর্বে স্বদেশপ্রেমী ভারতীয়দের সঙ্গে টেরেন্স ম্যাকস্যুইনির পরিবার একত্ববদ্ধ। স্বাধীনতা আসবেই আসবে।'

শহিদ যতীন দাসের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ আলোড়িত হয়ে উঠল। তার মৃতদেহ লাহোর থেকে নিয়ে আসা হল কলকাতায়। বীরকে বরণ, বন্দন ও বহন করে নিয়ে যাবার জন্যে সে যে কী বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল তার তুলনা শুধু সে নিজেই। বেদনার আকারে যেন এক বৃহৎ বন্দনা মহাসৌন্দর্যে প্রকাশিত হয়েছে। বিপুল লোকসঙ্ঘ, কিন্তু কেউ কারু অনাত্মীয় নয়, এক মহৎ শোক সকলকে একই ব্রতমন্ত্রে গ্রথিত করে নিয়েছে—বন্দে মাতরম, বিপ্লব অমর হোক।

এই শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক সুভাষ। প্রাণোৎসর্গকে জীবনোৎ-সবে নিয়ে যেতে হবে সেই যজ্ঞের পুরোধাও সুভাষ।

স্বাধীনতার ক্ষুধিত শিখা আরো প্রবল হয়ে জ্বলুক, ভস্ম করে দিক সমস্ত ভীরুতা, সমস্ত লোলুপতা, সমস্ত জাড্য আলস্য মালিন্য

আবিল্য। ভস্ম করে দিক সমস্ত পরশাসনের পীড়ননিষ্ঠুরতা। ভস্ম হয়ে যাক সমস্ত অন্ধকারের কালিমা, অরুণগগনে নতুন সূর্যের অভ্যুদয় হোক, সুরু হোক প্রাণের গানের প্রেমের হোলিখেলা।

মহাত্মা ভগৎ সিংকে সর্দার উপাধি দিলেন কিন্তু যতীন দাসের বেলায় চুপ করে থাকলেন কেন? বললেন, ইচ্ছে করেই চুপ করে আছি। যদি কিছু বলতে হত হয়তো তা মনঃপূত হত না।

কিন্তু লাহোর-বন্দীদের প্রায়োপবেশনের মধ্যেই এগারোই অগাস্ট কলকাতায় বন্দী-দিবস পালিত হল। বিরাট সভা হল টাউনহলে। সভাপতি দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সভার প্রাক্কালে হাজরা পার্ক থেকে বেরুল শোভাযাত্রা। যাত্রীদের মধ্যে সুভাষ, কিরণশঙ্কর রায়, ডাক্তার জে. এম. দাসগুপ্ত, সত্য গুপ্ত, ধীরেন মুখার্জি, সর্দার বলবন্ত সিং, প্রেম সিং ও আরো অনেকে। ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মুক্তি অথবা মৃত্যু, বেজে উঠল গানের সুর: বীরগণ জননীরে, রক্ততিলক ললাটে পরালো পঞ্চনদীর তীরে। আর কথা নেই, পুলিশ এসে সবাইকে গ্রেপ্তার করল। অভিযোগ কী? অভিযোগ সেই সনাতন, ষড়যন্ত্র আর রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহ? হ্যাঁ, যে মুহূর্তে মুক্তি বা স্বাধীনতা শব্দ উচ্চারণ করেছ সেই মুহূর্ত থেকেই তুমি রাজদ্রোহী।

আলিপুরের স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট কে. এল. মুখার্জির কোর্টে নিয়ে যাওয়া হল সবাইকে। ম্যাজিস্ট্রেটের কী সুমতি হল, সবাইকে জামিন দিলে।

জামিনে বেরিয়ে এসেও সুভাষ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারল না, সে চলল লাহোরে, পাঞ্জাব ছাত্রসম্মিলনে সভাপতিত্ব করতে।

সূর্যের তন্দ্রা নেই, সুভাষেরও বিশ্রাম নেই।

তেরো

যতীন দাসের আত্মবলিদানের পরে বন্দীদের শ্রেণীবিভগ হল এটাই বড় কথা নয়, দেশময় জাগল যুব-আন্দোলন, ছাত্র-আন্দোলন। না, আমরা প্রভুত্ব চাইনে রাজত্ব চাইনে, সোনা নয় মাটি নয় ইট-কাঠ-পাথর নয়, ক্ষমতার মোহ আমাদের কাছে প্রলোভনের বস্তু নয়, আমরা শুধু অমৃতে আলোকে আনন্দে ভালোবাসায় বাঁচার মত বাঁচতে চাই।

পুনায় মহারাষ্ট্র যুবসম্মিলনে সভাপতিত্ব করল জহরলাল, আহমেদাবাদে কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতৃবধূ, আর লাহোরে নাগপুরে অমরাবতীতে সুভাষ।

লাহোরে সুভাষের সহযাত্রী কিরণ দাস, শহিদ যতীনের ছোট ভাই। অমৃতসরে পৌছতেই কিচলু তাদের অভ্যর্থনা করে নিল। মোটরে করে পৌঁছুল শহর। ধরমবীরের বাড়ি যাবার পথে বিরাট শোভাযাত্রা তৈরি হল। সবাই বললে, এ লোকসজ্ঘ এড়িয়ে অন্য রাস্তা দিয়ে চলে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

আগে হৃদয় পরে বুদ্ধি। এসব লোক তো আমার দেশের লোক, আমার মিত্র, আমার সুহৃৎ। এরা তো প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী আর পরোক্ষে কার্যহন্তারক নয়। এরা আমার সগোত্র। আমাদের এক লক্ষ্য এক অভিনিবেশ—আমি মোটরে আর ওরা রাজপথে, তা নয়, আমরা সকলেই এক পথে।

জনতা সুভাষকে হৃদয়ে করে নিয়ে গেল সভাস্থলে, ব্র্যাডল হলএ। হলএ পৌঁছে সুভাষ দেখল অনেক পুলিশও রয়েছে ভিড়ের মধ্যে। সুভাষ মর্যাদাগম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'প্রবেশপত্রের অধিকারে

জনতা এ সভায় সমবেত হয়েছে। যাদের প্রবেশপত্র নেই তাদের জন্যে এ সভা নয়, তারা দয়া করে এ সভাস্থল ত্যাগ করলেই আমি সুখী হব।'

'আমরা পুলিশ।'

'পুলিশই হোন আর যিনিই হোন যাঁর কার্ড বা প্রবেশপত্র নেই তাঁর এ সভায় স্থান নেই। তিনি ধীরে চলে যান। না গেলে—'

পুলিশের দল ঘাড় ফেরাল।

'না গেলে আমরা অহিংস উপায়ে তাদের বহিষ্কার করে দেব।'

সে দৃপ্ত অথচ সৌজন্যসুন্দর ঘোষণায় আশ্চর্য ফল ফলল। পুলিশের দল ল্যাজ গুটিয়ে সুধীরে প্রস্থান করল।

সেই সভায় সুভাষ যতীন দাসের নতুন নামকরণ করল। নতুন নাম যুবক দধীচি। যার বক্ষের পঞ্জর দিয়ে বজ্র নির্মিত হয়েছে। যে বজ্রে ধ্বংস হবে বৃত্রাসুর।

সভাশেষে সুভাষ লাহোর কোর্টে গিয়ে উপস্থিত হল। আদেশ হল, কোর্টে বসতে পারো, দেখতে পারো বিচার, কিন্তু ডকের আসামীদের সঙ্গে কথা বলতে পারবে না।

বলব না কথা, আর, তোমাদের বিচার কে দেখে, দেখব শূরবীর বিপ্লবী যোদ্ধাদের। আমাদের এক লক্ষ্য এক অভিনিবেশ এক অভ্যুত্থান।

কয়েদিদের শ্রেণীবিভাগ করেছে কিন্তু সেখানেও ইংরেজের কারসাজি। সেখানেও ডিভাইড য়্যাণ্ড রুল, ভিন্ন করে খিন্ন করো। সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে এক শ্রেণীতে, একই সুবিধের অধিকারী করে রাখল না, একত্র করে রাখলেই যে ওদের একত্ব হবে— শুধু জীবনধারণের মাত্রা মেপে মেপে ওদের তিন ক্লাশে ঠেলে দাও, এ-ক্লাশ, বি-ক্লাশ, সি-ক্লাশ, অভিজাত মধ্যবিত্ত আর সাধারণ। তুমি রাজনৈতিক বন্দী বলেই আর অভিজাত নও, তুমি যদি গরিবগুরবো লোক হয়ে দেশের সেবায় কারাগারে এসে থাকো, চলে যাও

সাধারণে। ব্রিটিশ পাটোয়ারি তোমাকে বরেণ্য বলে ভাবতে দেবে না।

তবু যেটুকু সংগ্রহ করা গেছে সেটুকু যতীন দাসেরই তপস্যার ফল। সংগ্রহ করা গেছে আরেক বৃহত্তর বিত্তের উত্তরাধিকার। 'মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে আবার বজ্রানল।'

জলন্ধর লুধিয়ানা হয়ে সুভাষ পৌঁছুল মিরাটে। কোর্টে গিয়ে দেখল ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের। সঙ্গে অস্ত্র নিয়ে যাচ্ছে সন্দেহে পুলিশ আম্বালায় তাকে সার্চ করলে, বিনম্র প্রসন্নতা ছাড়া সুভাষের কাছ থেকে আর কিছুই পেল না। দিল্লিতে এসে ডাক্তার আনসারির আতিথ্য নিলে। বিঠলভাই প্যাটেল তাকে খেতে নেমন্তন্ন করে পাঠালেন।

দিল্লিতে আরো অনেক আহ্বান-নিমন্ত্রণ, কিন্তু হঠাৎ একদিন কলকাতা থেকে কিরণশঙ্করের টেলিগ্রাম এসে হাজির: শিগগির চলে এস। ম্যাজিস্ট্রেট আর মুলতুবি দিতে রাজি নয়।

দিল্লির সব কাজ ফেলে সুভাষ চলল কলকাতায়।

কলকাতায় এসে দেখল বাংলা কংগ্রেসে বিভেদ দেখা দিয়েছে। এক দলের নেতা সুভাষ আরেক দলের নেতা যতীন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত। সেনগুপ্ত দক্ষিণপন্থী, মহাত্মার অনুবর্তী, সুভাষ বামপন্থী, কখনো-কখনো মহাত্মার বিপক্ষ। নেতৃত্বের জন্যে সংগ্রামে শেষ-পর্যন্ত সুভাষই জয়ী হল।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ফরোয়ার্ড পত্রিকার বিরুদ্ধে মানহানির মোকদ্দমা করল। একটা ট্রেন-দুর্ঘটনার সংবাদ দিতে গিয়ে হতাহতের সংখ্যা নিয়ে অতিরঞ্জন করেছে তারই জন্যে নালিশ। কোর্ট রেলওয়েকে প্রার্থিত ডিক্রি দিলে, ক্ষতিপূরণ অল্পসল্প নয়, দেড়লাখ টাকা। সবাই ভাবল ফরোয়ার্ড এবার উঠে যাবে। এত টাকা খেসারত দিতে গেলে তার কঙ্কালও থাকবে না।

ফরোয়ার্ড উঠে গেল না, ফরোয়ার্ড লিবার্টি হয়ে গেল।

কিংবা বলতে পারো ফরোয়ার্ড উঠে গিয়ে লিবার্টি নামে এক নতুন কাগজ বেরুল। কিছুদিন ফরোয়ার্ড চললেই লিবার্টিতে পৌঁছুনো যায়।

কিন্তু এবার কংগ্রেসে সভাপতি হবে কে ?

প্রায় সব প্রাদেশিক কমিটিই গান্ধির নাম করে পাঠাল, কিন্তু মহাত্মা রাজি হতে চাইলেন না। তা হলে বল্লভভাই প্যাটেল হোক না, তাও না, মহাত্মা জহরলালকে মনোনীত করলেন।

উনিশ শো সাতাশের ডিসেম্বরে ইউরোপ থেকে ফিরে জহরলাল নিজেকে সমাজতন্ত্রী বলেছিল, মহাত্মার ডাইনে না থেকে বাঁ ঘেঁসে চলছিল, মহাত্মার কিছু কিছু কাজ সমর্থন করতে পারছিল না, কিন্তু লাহোর কংগ্রেসে তাকে সভাপতিত্ব দিয়ে গান্ধি যেন তাকে নিজের কাছেই টেনে নিতে চাইলেন। কংগ্রেসী বামপন্থীদের সঙ্গে সমস্বরে জহরলালও পূর্ণ স্বাধীনতার কথাই বলে এসেছে। তা বলুক, তবু জহরলালকে হাতে আনতে পারলে বামপন্থীরা প্রাধান্য বিস্তার করতে পারবে না। মহাত্মার এ বিচক্ষণতা পুরস্কৃত হল। আর সেই থেকে জহরলাল মহাত্মার নিঃসর্ত সমর্থক হয়ে দাঁড়াল।

তবু জহরলালের সভাপতিত্বে লাহোর কংগ্রেসেই সক্রিয় পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হল। বলা হল, ট্যাক্স দেব না। মহাত্মা গান্ধি সম্মতি দিলেন। বললেন, যদি একত্রিশে ডিসেম্বরের মধ্যে গভর্নমেণ্ট থেকে সাড়া না পাওয়া যায়, আমি উনিশশো ত্রিশের পয়লা জানুয়ারি থেকে 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্সওয়ালা' হয়ে যাব।

কিন্তু সুভাষ ও তার দল এত অল্পে তৃপ্ত নয়। শুধু করব নয়, এখুনি কিছু করে ফেলি, গড়ে তুলি। পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতার কথা অনেক আগেই বলা হয়েছে, কিন্তু তেমন কিছুই করা হয়নি, শুধু কালহরণ ছাড়া। এ কালক্ষয়ের কোনো কৈফিয়ত নেই।

'কিন্তু তুমি এখুনি-এখুনি কী গড়ে তুলতে চাও ?' জিজ্ঞেস করলেন মহাত্মা।

'প্যারালেল বা সমান্তরূপ গভর্নমেন্ট গড়ে তুলতে চাই।' বললে সুভাষ, 'যেমন আয়র্ল্যাণ্ডে সিন ফিনেরা গড়ে তুলেছিল।'

মহাত্মা খুশি হলেন না। বললেন, 'ও সব কাগজে কলমে খুব সুন্দর কথা কিন্তু বাস্তবে নয়। আমাদের মধ্যে সেই শৃঙ্খলাবোধ কোথায়, কই সেই সংগঠন, সেই চালনাশক্তি ?'

এত নৈরাশ্যের হেতু কী? কেন এই দৌর্বল্য, এই আত্ম-অবিশ্বাস? বিরাট এক সেবকবাহিনী যদি গড়ে তুলতে পারি. কেন সফল হব না?

সুভাষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হল।

শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ওয়ার্কিংকমিটি থেকে তার নাম খারিজ হয়ে গেল। মহাত্মাই কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলেন। বললেন, যারা এক মতের মানুষ তাদেরই ওয়ার্কিং কমিটিতে আসা উচিত। জহরলালেরও সেই কথা। তা কেন, যারা মাইনরিটি তাদেরও প্রতিনিধি থাকা দরকার। সুভাষের নাম প্রস্তাব করা হল। ভোটাভুটিতে টিকলনা প্রস্তাব—মহাত্মার ইচ্ছাই প্রবল হল। সুভাষ তার দলের বাষট্টি জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেল সভা থেকে।

বেরিয়ে এসে সুভাষ কংগ্রেস ডেমোক্রেটিক পার্টি গঠন করল।

মাতার আশীর্বাদ চেয়ে বাসন্তী দেবীকে টেলিগ্রাম করল সুভাষ: 'অধিকসংখ্যকদের অত্যাচার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা আমাদের আলাদা দল গড়তে বাধ্য করল, যেমন একদিন করেছিল গয়ায়। দেশবন্ধুর আত্মা আমাদের পথ দেখাক আর আপনার আশীর্বাদ আমাদের অনুপ্রাণিত করুক—এই প্রার্থনা।'

একত্রিশে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রি গত হলেই, নববর্ষের প্রথম মুহূর্তে কংগ্রেসের সভাপতি জহরলাল নেহরু স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করল। হাড়কাঁপানো দুঃসহ শীত, তবু লক্ষ লোকের সমাবেশ হল। আর সে পতাকা যখন ঊর্ধ্বে উড্ডীন হল, লক্ষ শরীরে জাগল এক নতুন রোমাঞ্চ, শৃঙ্খলমোচনের রোমাঞ্চ।

নতুন বছর না জানি কী নতুন পরিচ্ছেদ খুলে ধরে।

উনিশ শো তিরিশের দোসরা জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটির সভায় ঠিক হল ছাব্বিশে জানুয়ারি সমগ্র ভারতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে।

একটা ঘোষণাপত্র তৈরি করা হল। সন্দেহ নেই মহাত্মা গান্ধিই এর রচয়িতা। ঠিক হল গ্রামে-গ্রামে শহরে-শহরে অসংখ্য সভামঞ্চ থেকে এই ঘোষণাপত্র পড়া হবে।

'আমরা বিশ্বাস করি এ ভারতবাসীদের অবিচ্ছেদ্য অধিকার যে তারা স্বাধীন থাকবে ও তাদের শ্রমের উপস্বত্ব তারা নিজেরা ভোগ করবে। পাবে তাদের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় বস্তু, যাতে করে পূর্ণতর বিকাশবর্ধনের সুযোগ আসবে। আমরা বিশ্বাস করি, যদি কোনো গভর্নমেণ্ট জনসাধারণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে ও তাদের নিপীড়নে নিযুক্ত হয়, তা হলে সেই গভর্নমেণ্টকে পরিবর্তন করা বা সর্বাংশে ধ্বংস করার আরো এক অধিকার তারা পেয়ে বসে। ব্রিটিশ সরকার ভারতের অধিবাসীদের মূল অধিকার থেকে শুধু বঞ্চিতই করেনি, তাদেরকে অর্থে, রাজনীতিতে, সংস্কৃতিতে, আত্মিক সম্পদে, সর্বব্যাপারেই সর্বস্বান্ত করেছে। তাই আমরা বিশ্বাস করি ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা সার্বিক স্বাধীনতা অর্জন আমাদের একমাত্র কর্তব্য।'

ঘোষণার শেষ অনুচ্ছেদে বলা হল :

'যে শাসনপদ্ধতি আমাদের দেশে ধ্বংস নিয়ে এসেছে তার কাছে বশ্যতা স্বীকার করা আমরা মানুষের ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে গণনা করি। আমরা অবশ্য এ কথা স্বীকার করি যে হিংসার পথে আমাদের স্বাধীনতা আসবে না। আমরা তাই ব্রিটিশ সংস্পর্শ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়ে যাব আর ট্যাক্স না দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে আইন অমান্য করতে উদ্যোগী হব। আমরা এ বিশ্বাসে নিশ্চিত যে যদি আমরা অহিংসার পথে থেকে ব্রিটিশ সংস্পর্শ ছিন্ন

করতে পারি ও ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে দিই, তা হলে এই অমানুষিক শাসনের অবসান অবধারিত।'

লাহোরে সেই শীতের রাত্রেই অনুভব করা গেল কংগ্রেসের শত আলস্যে-শৈথিল্যেও জনগণের সংগ্রামস্পৃহার এতটুকুও ক্ষয় হয় নি। শুধু অবসাদের ছাই এসে জমেছিল, একটা নাড়াচাড়া পড়তেই ভস্মস্তূপ থেকে উঁকি মেরেছে বৈশ্বানর। অত্যাচারের বেড়াজালের মধ্যে থেকেও দেখা দিচ্ছে সর্বস্বপণ নির্ভীকতা, স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপ্তি ও আত্মবিসর্জনের প্রচণ্ড উৎসাহ। আর্তনাদকে রুদ্ধ করে রাখলে কী হবে, যন্ত্রণা ঠিকই আছে।

আর যন্ত্রণা থেকেই সমস্ত বিপ্লবের উত্তেজনা।

কিন্তু তেইশে জানুয়ারি কে. এল. মুখার্জির বিচারে সুভাষের এক বছর জেলের হুকুম হল। তার অপরাধ সে রাজপথে শোভাযাত্রা চালনা করেছিল যার মুখে একটি মাত্র ধ্বনি ছিল : স্বাধীনতা।

লাহোরে স্বাধীনতাঘোষণার পর প্রথম ভারতবাসী যে স্বাধীনতা উচ্চারণ করবার জন্যে জেলে গেল সে আর কেউই নয়, সে সুভাষ-চন্দ্র। আর তার কারাবরণের তারিখটাও লক্ষণীয়। তেইশে জানুয়ারি। সুভাষের জন্মদিন। সে পুণ্যদিনে জাতিও নতুন করে জন্মগ্রহণ করল।

কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল সুভাষকে অভিবাদন করে টেলিগ্রাম করল : লাহোর ঘোষণার পর তুমিই প্রথম বলি, আমার অভিনন্দন নাও।

মহাত্মা গান্ধি স্থির করলেন, তিনিই নিজে সর্বপ্রথম আইন ভঙ্গ করবেন।

সকলে জিজ্ঞাসু হয়ে উঠল : কী উপায়ে?

বলছি। যে সত্যাগ্রহী সে কিছুই গোপন করে না। সত্যই স্বচ্ছতম বস্তু, আর যে সেই সত্যকে আশ্রয় করে থাকে সেও সারল্যের প্রতিমূর্তি।

লর্ড কিচনার বা ভন হিণ্ডেনবার্গ তাদের সমরকৌশল প্রচ্ছন্ন রাখে কিন্তু মহাত্মা রাখেন না এবং তিনি জানেন সাড়া দেশ জুড়ে এবার যে আন্দোলন সুরু হবে তা গত মহাযুদ্ধের চেয়ে কম গুরুতর হবে না।

কী করবেন তিনি? তিনি লবণ-আইন ভঙ্গ করবেন। যেখানে সমুদ্র থেকে এক আঁজলা জল তুলে নিলেই নুন পাওয়া যায় সেখানেও নুন খেতে ট্যাক্স দিতে হয়। এই বর্বর আইন তিনি মানবেন না। তিনি তাঁর সহচরদের নিয়ে সমুদ্রতীরবর্তী কোনো লবণ-পল্লীতে যাবেন আর তিনি নিজেই নুন সংগ্রহ করে নেবেন জল থেকে। হ্যাঁ, নুনের ডিপোগুলোও দখল করে নেবেন। নুন জীবনধারণের প্রধান উপাদান। এ নুন আমাদের। এ আমাদেরই জল থেকে পাওয়া। এর জন্যে আবার ট্যাক্স কিসের? এ আমরা যখন-তখন তৈরি করে নেব।

গান্ধিজি আর বারুদ-ফুরোনো গুলি নন, তিনি এখন একেবারে তাজা গুলি, তাঁর বুলিও এখন প্রায় গুলির মত।

বলছেন, 'আমি পদযাত্রায় নামলেই হয়তো ইংরেজ সরকার আমাকে গ্রেপ্তার করবে কিন্তু এবার আমি কোনো অবস্থাতেই উনিশ-শো বাইশ সালের মত আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেব না। আমি আমার আশ্রমবাসীদের নিয়ে এ আন্দোলন সুরু করব, যারা অহিংসায় ও নীতিনিষ্ঠায় শিক্ষিত, আমাদের দিক থেকে কোনো ভয়ের কারণ নেই। কিন্তু আন্দোলন যখন বহুবিস্তৃত হয়ে পড়বে, তখন যদিও হিংস্রতাকে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ করতে হবে, তবুও এ কথা পরিষ্কার হয়ে থাক যে এবার আর কোনো অবস্থাতেই ফিরে যাওয়া নেই, এবং যতক্ষণ একটি মাত্র অহিংস যোদ্ধা জীবিত থাকবে ততক্ষণ এ আন্দোলনও মরবে না।'

দেশের লোকের বুক সাহসে ভরে উঠল। এবার চৌরিচৌরা ঘটলেও আর পিছু হটা নয়।

গান্ধিজি একা যাবেন। না, বল্লভভাই প্যাটেলকেও সঙ্গে নেবেন না। আর সকলে কি তবে অলস হয়ে বসে থাকবে? বিশ্রাম করবে? মহাত্মা হাসলেন: 'হ্যাঁ, অলস থাকবে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে। ক্লান্ত হবার জন্যেই বিশ্রাম।'

এবার হয় আমরা জিতব নয় আমরা শেষ হয়ে যাব।

আন্দোলনে নামবার আগে মহাত্মা লর্ড আরউইনকে চিঠি লিখলেন:

প্রিয় বন্ধু,

আইন-অমান্য আন্দোলনে নামবার আগে আমি আপনাকে লিখে দেখছি অন্য কোনো পথ আছে কিনা।

আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অত্যন্ত স্বচ্ছ। মানুষ তো দূরের কথা, জীবিত কোনো প্রাণীকে স্বেচ্ছায় আঘাত দিতে আমি অক্ষম, যদিও সেই প্রাণী ও মানুষ আমার ও আমার পরিজনদের বৃহত্তম ক্ষতিসাধনে তৎপর। তাই যদিও আমি ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ বলে মনে করি, আমি কোনো ইংরেজের বা ভারতবর্ষে তার ন্যায়ার্জিত স্বার্থের অনিষ্ট করতে একেবারেই ইচ্ছুক নই।

ব্রিটিশ শাসন অভিশাপ হলেও ইংরেজমাত্রকেই আমি অভিসম্পাতের যোগ্য বলে মনে করি না। পৃথিবীর আর কোনো লোকের মতই ইংরেজ ভালো বা মন্দ, ব্যক্তিগত বিচারে আমি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমার প্রিয়তম বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই ইংরেজ। আর ব্রিটিশ শাসন যে অভিশাপ সে তো সরল ও সাহসী ইংরেজ লেখকদের বই থেকেই আমি শিখেছি।

ব্রিটিশ শাসনকে অভিশাপ মনে করি কেন তার কারণ কি বিশদ করে বলতে হবে?

একটা ব্যয়বহুল শাসনভার চাপিয়ে লক্ষ লক্ষ মূক মানুষের রক্তরস সমস্ত শুষে নেওয়া হচ্ছে। একটা জাতিকে দাস-জাতিতে পরিণত করা হচ্ছে। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি উৎখাত

করে দিয়েছে। আমাদের নিরস্ত্র করে রাখতে-রাখতে সহায়হীন কাপুরুষ করে তুলেছে। বলুন এ আর কতদিন সহ্য করব?

আমার অসংখ্য দেশবাসীর সঙ্গে আমি আশা করেছিলাম ব্রিটিশ ক্যাবিনেট বুঝি কিছুটা উদার হবে। অল্প মাত্রায় হলেও অন্তত ডোমিনিয়ন স্টেটাসটা দেবে, কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই স্পষ্টতর হচ্ছে সংগ্রাম ছাড়া ব্রিটিশ সরকার কিছুই দেবে না, কিছুই ছাড়বে না। আরো যত দ্রুত সম্ভব দেশের বাকি রক্তটুকুও শুষে নেবে।

আপনার নিজের মাইনেটাই ধরুন না। আপনার মাস-মাইনে একুশ হাজার টাকারও কিছু বেশি। তা ছাড়া আরো কিছু পরোক্ষ আদায় আছে। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর মাইনে বছরে পাঁচ হাজার পাউণ্ড, টাকার হিসেবে মাসে পাঁচ হাজার চারশো টাকা। আপনার দৈনিক আয় দিনে সাত শো টাকা যেখানে একজন ভারতবাসীর গড় পড়তা রোজগার দিনে দু আনা। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর দৈনিক আয় একশো আশি টাকা যেখানে একজন ইংরেজের গড় পড়তা আয় দিনে দু টাকা। তার মানে আপনি ভারতবাসীর গড় পড়তা আয়ের পাঁচহাজার গুণেরও বেশি টাকা পাচ্ছেন আর ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পাচ্ছে ইংরেজের গড় পড়তা আয়ের মোটে নব্বুই গুণ। তফাৎটা একবার দেখুন। আমি আপনাকে কোনরকম দুঃখ দেবার জন্যে এই ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুলছি না, হয়তো যত টাকা আপনি পাচ্ছেন তত আপনার প্রয়োজন নেই, হয়তো আপনার রোজগারের বেশির ভাগই দানে-ধ্যানে ব্যয় হয়, তবু নতজানু হয়ে বলছি, বৈসাদৃশ্যটা একবার বিবেচনা করে দেখুন। যে বিধি-পদ্ধতিতে এ ব্যবস্থা সম্ভব হতে পারে আপনাব কি মনে হয় না তার বিলোপ হওয়া বাঞ্ছনীয়?

যাই হোক, আমার আবেদন যদি আপনার হৃদয় স্পর্শ করতে অক্ষম হয়, যদি কোনো অন্যায়ের প্রতিকারের ব্যবস্থা না করেন, তবে আপনাকে জানিয়ে রাখছি, আগামী ১১ই মার্চ আমি লবণ-

আইন অমান্য করব। দরিদ্র দেশবাসীর দিক থেকে দেখতে গেলে এ আইন সম্পূর্ণ বেআইনি। এ আইন কেন যে আমরা এত দিন বজায় থাকতে দিয়েছি ভাবলে বিস্ময় লাগে। আমি জানি আমাকে গ্রেপ্তার করে ফেলে আমার পরিকল্পনাকে আপনি বানচাল করে দিতে পারেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস আমার পিছনে হাজার হাজার লোক এগিয়ে আসবে, আইন ভাঙার শাস্তি হাসিমুখে বরণ করে নিতে তাদের এতটুকুও বাধবে না।'

লর্ড আরউইন গান্ধিকে আমলেই আনল না, এক কথায় জবাব পাঠাল। 'যাতে শান্তির ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা এমন কোনো কাজে প্রবৃত্ত হওয়া দুঃখের কথা।'

'আমি নতজানু হয়ে রুটি চেয়েছিলাম,' গান্ধিজি আবার লিখলেন আরউইনকে: 'পাথর পেলাম। ইংরেজ কেবল বলের কাছেই নতিস্বীকার করে এ আমি জানি বলেই আপনার উত্তরে বিস্মিত হইনি। শান্তির কথা বলছেন? সে শান্তি তো কারাগারের শান্তি। ভারতবর্ষই এক বিশাল কারাগার। আমি আপনার আইন অস্বীকার করি আর যে দুর্বহ শান্তির শোকাবহ একঘেয়েমি সমস্ত দেশের শ্বাসরোধ করে আছে তাকে ভেঙে ফেলাই আমার পবিত্র কর্তব্য।'

বারোই মার্চ গান্ধি তাঁর পদযাত্রা সুরু করলেন, সবরমতি থেকে দণ্ডি, সঙ্গে উনাশি জন অনুচর। রিক্ত গাত্র, নগ্ন পা, হাতে একটা লাঠি—ভারতবর্ষের ইতিহাসপুরুষ বেরুলেন স্বাধীনতালক্ষ্মীকে সমুদ্র-গর্ভ থেকে উদ্ধার করে আনতে।

ব্রিটিশ সরকার জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে হাসল। এও আবার একটা আন্দোলন নাকি? য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেটসম্যান পরিহাস করে লিখল, যতদিন ডোমিনিয়ন স্টেটাস না পায় গান্ধি শুধু সমুদ্র-জল গরম করুক।

কিন্তু পলকে সমস্ত দেশ তপ্ত সমুদ্রজলের মতই উত্তাল হয়ে উঠল।

গুজরাটের সমুদ্রকূলে ছোট একটি গ্রাম দণ্ডি, সবরমতি থেকে দুশো মাইল, গান্ধি যাবেন পায়ে হেঁটে। সেই বিরাট মহাপ্রস্থানে হাজার-হাজার লোক এসে যোগ দিচ্ছে—এ শুধু পথযাত্রা নয়, এ আমাদের তীর্থযাত্রা—আমাদের কেউ ডাকেনি, আমরা নিজের থেকে এসেছি নিজের ডাকে।

যদি কেউ না-ও আস আমি একলা যাব। কবিগুরুর 'একলা চলো রে' গানটি যে আমার জীবনের সাধনবীজ।

'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণ তলে একলা দলো রে॥'

পায়ে-পায়ে দেশানুরাগের রক্ত গোলাপ ফুটিয়ে-ফুটিয়ে চলেছেন গান্ধি। চলেছেন মনুষ্যত্বের অভ্রভেদী মহিমায়, সমস্ত মৃত্যুকে ভয়কে অস্থিরতাকে অতিক্রম করে।

চারদিকে সুরু হয়ে গেল আইন-ভাঙার মহোৎসব।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট চোখ কচলাল। উঠে বসল। এ যে দেখছি লঘু কোনো খামখেয়াল নয়, এ যে দেখছি আর উপেক্ষা করে থাকা চলে না।

গ্রামে-গ্রামে, পথে-পথে যেখান দিয়ে মহাত্মা যাচ্ছেন, শুধু তার আশে-পাশেই নয়, দেশের সর্বত্র, শহরে-গঞ্জে, বন্দরে-বাজারে পড়ে গেল আইন-অমান্যের হিড়িক। মহাত্মার দণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছুবার আগেই লেগে গেল অহিংসার আগুন। বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেপ্তার হলেন, তাঁর চারমাস জেল হয়ে গেল। তিনি বলে উঠলেন, 'বারদোলাইজ্ দি কানট্রি।' সমস্ত দেশকে বারদোলি করে তোলো।

নির্বিচলে মহাত্মা এগিয়ে চলেছেন। কোনো সমরবিজয়ে নয়, বাণিজ্যবিস্তারে নয়, শুধু সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে। সত্যই স্বাধীন। যে সত্যে আগ্রহী সে স্বাধীনতায় প্রতিশ্রুত। স্বাধীনতাই তার চোখের আলো, মুখের ভাষা, বুকের নিশ্বাস, সর্বদেহের রক্তচলাচল।

চারদিকে শুধু এক বাণী, এক ধ্বনি—গান্ধিকি জয়। আর এক প্রতিনিনাদ : 'যাত্রা করো, যাত্রা করো, যাত্রীদল। উঠেছে আদেশ —বন্দরের কাল হল শেষ।'

'আমি আগে 'গড সেভ দি কিং' গেয়েছি, অন্যকেও গাইতে শিখিয়েছি।' বলছেন মহাত্মা : 'আমি আবেদন-নিবেদন আপোস-মীমাংসায় বিশ্বাসী ছিলাম। কিন্তু সে সমস্ত এখন গোল্লায় গিয়েছে। আমি জেনেছি এই গভর্নমেণ্টকে সজুত করার পক্ষে এ সব কোনো উপায়ই উপায় নয়। রাজদ্রোহ—রাজদ্রোহই এখন আমার ধর্ম হয়ে উঠেছে। হ্যাঁ, আমাদের সংগ্রাম অহিংস। আমরা কাউকে হত্যা করবার জন্যে বেরোইনি, আমরা আমাদের ধর্মপালন করতে বেরিয়েছি—আর জেনো এই গভর্নমেণ্টের অভিশাপকে চিরদিনের মত মুছে ফেলাই আমাদের একমাত্র ধর্ম।'

কলকাতায় মেয়র জে. এম. সেনগুপ্ত ইচ্ছাপূর্বক আইন ভাঙলেন, পার্কে দাঁড়িয়ে পড়লেন রাজদ্রোহী রচনা—আর সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করল। জেগে উঠল কলকাতা, জেগে উঠল বাংলা দেশ। সুরু হয়ে গেল জেল ভরতি করার ঢেউ। 'বাঁচি আর মরি, বাহিয়া চলিতে হবে তরী, এসেছে আদেশ—বন্দরের কাল হল শেষ।'

মহাত্মার কানে পৌঁছুল খবর, প্যাটেল আর সেনগুপ্ত আইন-ভঙ্গের জন্যে গ্রেপ্তার হয়েছেন। মহাত্মা বললেন, ভয় নেই, জয় হবে অহিংসার। যদি নুনের ট্যাক্স উঠে যায়, যদি মদ রদ হয়, তা হলে তো অহিংসারই জয় হল। তা হলে স্বরাজ পেতে ভারতকে বাধা দিতে পারে এমন কোনো শক্তির কল্পনা করতে পারিনা। তেমন শক্তি যদি কোথাও থাকে, আমি তাকে একবার দেখতে

চাই। হয় আমার অভিলষিত বস্তু নিয়ে আমি ফিরব নয় আমার মৃতদেহ সমুদ্রে ভাসবে।'

মৃত্যুভয় সুভাষেরও নেই। জেল-সুপার মেজর সোমদত্তের গুলি-করার আদেশের সামনে সুভাষ বুক মেলে দাঁড়িয়েছে।

চব্বিশ দিনের পদযাত্রা শেষ করে পাঁচুই এপ্রিল মহাত্মা দণ্ডিতে এসে পৌঁছুলেন। ছয়ুই এপ্রিল সবাইকে নিয়ে সমুদ্রে পুণ্য স্নান করলেন। তারপর সমুদ্রের পারে যে নুন পড়ে ছিল তা কুড়িয়ে নিয়ে লবণ-আইন ভঙ্গ করলেন।

কত সহজলভ্য নুন, কত সহজসাধ্য আইন-ভঙ্গ।

ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হকচকিয়ে গেল। সমুদ্রের জল যে এত নোনতা তা আগে বুঝতে পারেনি। বুঝতে পারেনি গান্ধির আন্দোলনের কত শক্তি, কত মাহাত্ম্য। তারা যথারীতি লাঠি চালাল, গুলি চালাল। রুটির বদলে পাথর নয়, এ একেবারে নুনের বদলে গুলি।

করাচি, রত্নগিরি, পাটনা, পেশোয়ার, কলকাতা, মেদিনীপুর, কোলাপুর, মাদ্রাজ, আরো অনেক জায়গায় ব্রিটিশ গুণ্ডামি উদ্দাম হয়ে উঠল। গুলি চালাল করাচিতে, পেশোয়ারে, মেদিনীপুরে, মাদ্রাজে। সুরু হল অসভ্য অকথ্য নির্যাতন।

'কালো রাজত্ব' নাম দিয়ে গান্ধি প্রবন্ধ লিখলেন: 'হয় গ্রেপ্তার করো নয় লবণ-আইন তুলে দাও। যদি এ দুটোর একটাও না করো তা হলে জনতা হাসিমুখে বরং গুলি খাবে তবু নির্যাতন বরণ করবে না।'

আর কত জেলে পুরবে? সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ষাট হাজার লোক এরই মধ্যে জেলে ঢুকেছে। জেলে আর জায়গা কই? এখন মারধোর বা অসভ্যতা করা ছাড়া গভর্নমেণ্টের পথ কী।

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলেও সত্যাগ্রহীদের দুর্দান্ত ভিড়। 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে তুমিই ধন্য ধন্য হে।' কিন্তু সত্যাগ্রহীদের নিয়ে মেজর সোমদত্তের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। ওরা চোর গাঁটকাটাদের

সঙ্গে একত্র সি-ক্লাশে থাকতে চায় না, ওরা জাঙ্গিয়া পড়তে নারাজ। ওরা এমন কী গুণবন্ত যে একেবারে মাথায় করে তুলে রাখতে হবে!

নতুন একদল সত্যাগ্রহী এসেছে, তারা তো গোড়া থেকেই ঘাড় বাঁকাল। আমরা ওসব অখাদ্য খাব না, পরব না অসভ্য বেশ।

কী, কথা শুনবে না? সোমদত্ত ডাণ্ডাবাজির অর্ডার দিল।

ওয়ার্ডাররা লাঠি চালাল, শিখ বন্দী বলবন্ত আর প্রেমসিংকে মারতে নিয়ে এল পাঠান প্রহরীদের। য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানগুলোকে ছেড়ে দেওয়া হল, তারা সরকারের দলে গিয়ে সত্যাগ্রহীদের ঢিল ছুঁড়তে লাগল।

সকাল নটা, মেজর সোমদত্ত পাগলা ঘন্টি বাজাবার হুকুম করে বসল।

'সা ঘণ্টা পাতু নো দেবি—' সত্যাগ্রহীর দল সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল : বন্দেমাতরম।

সুভাষ, যতীন্দ্রমোহন, কিরণশঙ্কর, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্য গুপ্ত, পূর্ণ দাস, ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত ও আরো অনেকে বেরিয়ে এল। কী ব্যাপার? কেন এই উন্মাদ নিনাদ?

কেন নেই, ঘন্টি যখন বেজেছে, তখন বাক্যব্যয় না করে যে যার ঘরে ঢুকে পড়ো। পাগলা ঘন্টি বাজামাত্রই কয়েদিদের ঘর-বন্দী হতে হবে এই আইন। আইন যা আছে তাই আছে। কয়েদিদের আবার প্রশ্ন কী! জেলের বাইরে আইন ভাঙতে পারো, জেলের মধ্যে ভাঙা চলবে না। কামরায় ঢোকো এই মুহূর্তে।

বন্দুকধারী সেপাইয়েরা এসে পড়েছে, এক পল্টন সেপাই। যে যার বিবরে লেজ গুটিয়ে সরে পড়ো।

বেরিয়ে এসেছে সোমদত্ত। এখন একেবারে যমদত্ত বা যম-প্রেরিতের মত চেহারা। আই-এম-এস ডাক্তার, গোড়ায় বেশ সুশোভন মুখোশ পরেছিল, এখন সে মুখোশ খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ব্রিটিশপালিত হিংস্রতা।

'জোর করে ঢোকাও।' গর্জে উঠল সোমদত্ত।

সুরু হল ধাকাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। ঠেলে গুঁতিয়ে ঘুসি মেরে লাথি মেরে লাঠি মেরে যে করে পারো অবাধ্যদের ঢুকিয়ে দাও।

কিন্তু সুভাষকে সরায় সুভাষকে নড়ায় কার সাধ্য!

সোমদত্ত হুঙ্কার করে উঠল: 'গুলি করো।'

'বেশ, তাই। গুলি করো।' সুভাষ বুক পেতে দিল।

প্রাণ দুর্মূল্য জানি, প্রাণকে অমূল্য করে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করে দেব। বিপদের কঠোর পরীক্ষায় মনুষ্যত্বকে সম্পূর্ণ সপ্রমাণ করবার যে তেজ সেই তেজে মহিমান্বিত সুভাষ। এই জ্যোতির্ময় অপরাজেয় মূর্তি যে দেখেছে সেই কৃতার্থ হয়ে গিয়েছে।

'গুলি করো।' জমাদার যমনা সিংকে লক্ষ্য করে আবার গর্জাল সোমদত্ত।

যমনা সিং বললে, 'রিটন অর্ডার দিন। লিখিত অর্ডার না পেলে গুলি করতে পারব না।'

সোমদত্ত থমকে দাঁড়াল। লিখিত অর্ডার দেবার মত তার কলজে নেই। হতবুদ্ধির মত বাঁশি বাজিয়ে দিল। ঢুকে পড়ল আরো একদল সান্ত্রিসেপাই। যে করে হোক ওদের সেলে নিয়ে গিয়ে বন্ধ করো।

চেলাচামুণ্ডারা তখন লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সুভাষ অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। অল্প বিস্তর সবাই আহত হয়েছে, তার মধ্যে সেনগুপ্ত আর সুভাষই বেশি।

সোমদত্তের এমন ব্যবস্থা যে সুভাষকে ফার্স্ট এইড পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। ডাক্তার জে. এম. দাশগুপ্ত খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখছে কী করা যায়।

এ দিকে সারা শহরে রাষ্ট্র হয়ে গেল জেলে সুভাষ ও সেনগুপ্তকে প্রহার করে মেরে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার লোক জেল গেটে সমবেত হল।

'বল রে বন্য হিংস্র বীর
দুঃশাসনের চাই রুধির।
অত্যাচারী সে দুঃশাসন
চাই খুন তার চাই শাসন।
হাঁটু গেড়ে তার বুকে বসি
ঘাড় ভেঙে তার খুন শোষি।
আয় ভীম আয় হিংস্র বীর
কর আকণ্ঠ পান রুধির।
চাই রুধির রক্ত চাই
ঘোষো দিকে দিকে এই কথাই।
দুঃশাসনের রক্ত চাই॥'

না, বিপরীত কিছু ঘটেনি, সুভাষ ও সেনগুপ্ত সুস্থ আছে। সোমদত্তের সম্পর্কে তদন্ত কমিটি বসেছে। সে সরবে এখান থেকে।

সুভাষ কিরণশঙ্কর পূর্ণ দাস ও আরো কেউ কেউ অনশন সুরু করল। তাদের সামান্যতম সন্ত্রান্ততম দাবি মিটিয়ে ফেলল কর্তৃপক্ষ। বাসন্তী দেবীর হাতে ফলের রস খেয়ে অনশন ভাঙলে ছেলেরা।

সোমদত্ত বদলি হয়ে গেল।

বিপ্লবীরা কী করে সব খবর পেয়েছে, ঠিক করলে সোমদত্তকে সাবড়ে দেবে। বিপ্লবী বীরেন ঘোষকে এ কাজের ভার দেওয়া হল। কী দিয়ে মারবে? সম্প্রতি রিভলভার মজুত নেই, বোমা ফেলেই কাজ হাসিল করবে। বোমার শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখা উচিত। নিশ্চয়ই উচিত। নইলে অস্ত্র যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে কিংবা আশাভঙ্গ ঘটায়, তার চেয়ে তা ব্যবহার না করাই ভালো।

শক্তি পরীক্ষা করবার জন্যে দু-দুটো বোমা গভীর রাতে ধানবাদের রেল-লাইনের উপর ছোঁড়া হল। একটা আধখানা ফাটলেও আরেকটা একটু শব্দও করল না।

সোমদত্ত বেঁচে গেল।

চোদ্দ

আইন-অমান্য আন্দোলন দিকে-দিকে জাগরণের আলো জ্বালাল —তার মধ্যে সব চেয়ে বড় আলো নারী-জাগরণ। দলে-দলে মেয়েরা বেরিয়ে এল কংগ্রেসের পতাকা নিয়ে, সমস্ত অবরোধের প্রাচীর ডিঙিয়ে। কোনো কৃত্রিম সম্ভ্রান্ততার চেতনা তাদের পারলে না আড়ষ্ট করে রাখতে। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা, এ ভারত বুঝি জাগেনা জাগেনা।' আর বুঝি স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখা গেল না। দুর্বৃত্তবৃত্তশমনী এবার স্বয়ং যুদ্ধে নেমেছেন।

মেয়েদের উদ্দেশ করে গান্ধি বললেন, 'শুধু বিলিতি কাপড় বর্জন করিয়ে ষাট কোটি টাকা বাঁচানো যায় আর মদ খাওয়া বন্ধ করিয়ে পঁচিশ কোটি। আপনারা শুধু ঐ দুজাতীয় দোকানে পিকেটিং সুরু করে ওদের শোষণবাণিজ্য অচল করে দিন। এ কাজে দুঃসাহসের কোনো রোমাঞ্চ নেই বলে পিছিয়ে থাকবেন না, একমাত্র আন্তরিক হওয়ার মধ্যেই রোমাঞ্চ, আর আন্তরিকতাই সাফল্যের অগ্রদূত। আর, প্রস্তুত থাকুন, ওরা আপনাদের জেলে ধরে নিয়ে যাবে, আর, চাই কি, শারীরিক আঘাত করবে, অপমান করবে। ঐ আঘাত আর অপমান সহ্য করা গর্বের জিনিস বলে মনে করবেন। আর আপনাদের যন্ত্রণাভোগই তো স্বাধীনতার পদক্ষেপকে দ্রুততর করবে।'

গভর্নমেণ্ট প্রথম আঘাত হানল প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করে। সমস্ত দৈনিক পত্রিকাকে সরকারের পর্যবেক্ষণের অধীনে আনা হল। কংগ্রেসকে বেআইনি ঘোষণা করা হল। জেলের পর জেল সত্যাগ্রহীতে উপচে গেল। নতুন জেল তৈরি হল, তাতেও তিল-ধারণের স্থান নেই।

গান্ধিজি বললেন, 'তবু এ তো আন্দোলনের পঞ্চম সপ্তাহ মাত্র।'

ব্রিটিশ সরকার জানে একটা মুক্ত মানুষের থেকে একটা বন্দী মানুষের শক্তি বেশি, তবু জেনে শুনে গান্ধিকে তারা পাঁচুই মে গ্রেপ্তার করল। রাত একটার সময় তাঁকে একটা লরিতে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হল কোন এক রেলস্টেশনে, সেখান থেকে বোম্বাইয়ের কাছে বরিভলি-তে, সেখান থেকে মোটরে করে এরবাদা জেলে।

এর কদিন আগে গান্ধি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন আরউইনকে: 'এর পর লবণ আইন ভাঙতে আমি দর্শনায় যাচ্ছি। সেখানকার নুনের কারখানা নাকি বড়লাটের বাড়ির মতই সুরক্ষিত। বিনানুমতিতে নাকি এক চিমটি নুনও কেউ নিয়ে যেতে পারেনা। সেইখানেই এবার আমার অহিংস আক্রমণ চালাব ভেবেছি।

এই আক্রমণ আপনি তিন উপায়ে বন্ধ করতে পারেন। প্রথম উপায়, লবণ-ট্যাক্স রহিত করে। দ্বিতীয় উপায়, আমাকে ও আমার দলকে গ্রেপ্তার করে, যদি না অবশ্য আমাদের বদলা খাটতে লোক পাওয়া যায়। আর তৃতীয় উপায়, আপনার গুণ্ডাশক্তিকে লেলিয়ে দিয়ে, যদি না অবশ্য ভাঙা মাথার বদলে আস্ত মাথা এগিয়ে আসে।'

হ্যাঁ, গুণ্ডাশক্তি ছাড়া কী! কী করেছে পেশোয়ারে, করাচিতে, মাদ্রাজে, মেদিনীপুরে!

পেশোয়ারে শাহিবাগে একটা সভার পর ন জন স্থানীয় নেতাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। একটা লরিতে চাপিয়ে থানায় নিয়ে যাবার পথে লরি বিকল হয়ে পড়ে। নেতারা বললে, আমরা হেঁটেই থানায় যাচ্ছি। তখন তাদের নিয়ে জনগণের একটা মিছিল বেরোয়। কাবুলিগেট থানায় এসে দেখে থানা বন্ধ। ঘোড়ায় চড়ে এক পুলিশ কর্মচারীর উদয় হয়, তাকে দেখে জনতা জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে ওঠে। কী, এতদূর স্পর্ধা! তখন পুলিশপুঙ্গব খেপে গিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি তলব করে। একখানা নয়, দু খানা নয়, তিনখানা। পূর্ণ-শক্তিতে ঐ তিনটে গাড়ি জনতার মধ্য দিয়ে পথ কেটে এগিয়ে

যায়, কটা লোক চাপা পড়ে তক্ষুনি মারা যায়, কটা বিধ্বস্ত হয়। তখন অহিংসা চিন্তারও বাইরে, জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে সাঁজোয়া গাড়িতে আগুন লাগায়। পুলিশের ডেপুটি কমিশনারকেও মার দেয়।

আর কথা নেই। মুষলধারে গুলিবৃষ্টি সুরু হল। ক শ লোক কয়েক মিনিটের মধ্যে খতম হয়ে গেল।

ক দিন পরে গঙ্গা শিং কম্বোজ টাঙ্গায় করে যাচ্ছে, সঙ্গে স্ত্রী, ন-দশ বছরের মেয়ে হরপাল কাউর আর দেড় বছরের ছেলে বচিতার সিং, হঠাৎ কাবুলিগেটের কাছে এক ব্রিটিশ লান্স করপোরাল গুলি করে বসল। সে অনেক পাখি মেরেছে, ভাবল মানুষের বাচ্চা মারতে না জানি আরো কত রোমাঞ্চ, আর ভাবতে ভাবতেই দিল গুলি ছুঁড়ে। দুটো পাখির মতই হরপাল আর বচিতার পড়ে গেল মাটিতে, ওদের মা তেজা কাউরও গুলিবিদ্ধ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

হাজার হাজার লোক শিশুদুটোকে নিয়ে শোভাযাত্রা করে নিয়ে চলছে শ্মশানে, তখন সতর্ক না করেই মিলিটারির লোক আবার গুলি ছুঁড়ল। বাচ্চা দুটো আবার পড়ে গেল মাটিতে।

আবার জনতা এসে ওদের কুড়িয়ে নিয়ে চলল। আবার গুলি।

গভর্নমেন্টের হিসেবমত সংখ্যা তেমন কিছু মারাত্মক নয়, ন জন হত, আঠারো জন আহত।

এ বর্বরতার নজির ব্রিটিশ শাসন ছাড়া পৃথিবীতে আর কোথায় পাওয়া যাবে?

মরুভূমিতে একটি ওয়েসিস পাওয়া গেল। গাড়োয়ালি সৈন্যরাও আদেশ অমান্য করেছে। নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি চালাতে তারা রাজি হয়নি। যারা কোনো হিংসাত্মক কাজে উদ্যত নয়, নিরুপদ্রব, তাদের কোন বিবেকে হত্যা করব?

ফল কী হল?

ফল হল, সৈন্যবাহিনীকে অস্ত্রশূন্য করা হল, বসানো হল, কোর্টমার্শাল, বিচারে প্রত্যেকটি সৈন্যের দীর্ঘ কারাবাসের হুকুম হল।

মাদ্রাজে মিশনারি সাহেব রেভারেণ্ড প্যাটন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পিকেটিং দেখছিল, দেখছিল লাঠি-চার্জ কী রকম অমানুষিক হতে পারে, তারপরে, তার আরও অপরাধ, তার গায়ে খদ্দরের পোশাক —তাকেও ধরে পুলিশ পিটুনি দিলে। বোম্বাইয়ে কলবাদেবী রোডে পুলিশসাহায্যে লরি করে বিলিতি কাপড় সরাচ্ছিল, বারো বছরের ছেলে বাবু গনু লরির সামনে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করতে আসছে, অমনি তাকে চাপা দিয়ে মেরে রেখে লরি বীরবিক্রমে বেরিয়ে গেল। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনারকে বদলি করানো হল যেহেতু তার লাঠি পিকেটারদের গায়ে পড়ছে, পিঠে পড়ছে, মাথায় পড়ছেনা—তাকে বদলি করে আনা হল উইলসনকে, লাঠি-বাজিতে ডি-লিট পাওয়া, কেননা তার লাঠি সব সময়েই মাথার উপর তাক করা—মাথা ফাটিয়ে রক্ত ছুটিয়ে না দিলে ব্রিটিশের হাতে লাঠির মাহাত্ম্য কী!

মাথায় গান্ধি টুপি দেখলেই মারো, হাতে জাতীয় পতাকা দেখলেই ছিনিয়ে নাও, আর যদি মাটিতে বসে পড়ে ১৪৪ ধারা অমান্য করে, তা হলে তাদের উপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দাও। ধরে নিয়ে গিয়ে এমন জায়গায় ছেড়ে দিয়ে এস যেখান থেকে আসতে ট্রেন লাগে ও ট্যাঁকে যেন ট্রেনভাড়া না থাকে। আহতদের হাসপাতালে নেবে কী, টেনে হিঁচড়ে কাঁটাঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে এস। মারবার আগে উলঙ্গ করে নাও। হাতে পায়ে সর্বাঙ্গে পিন ফোটাও। শরীরের এমন সমস্ত স্থান মুঠো করে চেপে ধরো যাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অকথ্য অসভ্যতা। এ সব বিধান কেন? না, ওরা নিরুপদ্রবে আইন ভঙ্গ করছে। কর্নাটক থেকে মেদিনীপুর ট্যাক্স দিচ্ছে না। বন-আইন ভেঙে গাছ কেটে ফেলছে। মদ খেতে দিচ্ছে না। বন্দরে-স্টেশনে বিলিতি কাপড়ের গাঁট খালাস হচ্ছে না। সবাই শাদা খদ্দর পরছে। পেশোয়ারে আবার লালশার্ট —তারা খোদাই-খিদমদগার বা ঈশ্বরের সেবক হয়েছে—তাদের মধ্যেও এসেছে আরেক গান্ধি—সীমান্ত গান্ধি।

সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতাকে কঠিন হাতে দমন করো। নির্ভয়ে, নির্বিবাদে, নিরঙ্কুশ হয়ে। ইংরেজ শাসন দুর্জয়, দুর্বার। তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই ভারতবর্ষে।

ওরা কী করবে? ওদের হাতে কি অস্ত্র আছে?

কে উত্তর দেবে?

উত্তর দিল চট্টগ্রাম। উত্তর দিল ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি। উনিশ শো তিরিশের আঠারোই এপ্রিল ব্রিটিশের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে।

অস্ত্রাগার দুটো, একটা পুলিশ-আর্মারি, আরেকটা রেলোয়ে-আর্মারি। তৃতীয় আক্রমণের স্থল টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জ। আরো দুটো কাজ হবে ধুম স্টেশনে রেলোয়ে লাইন তুলে দেওয়া আর শহরে যত সাহেব আছে তাদের কোতল করা।

পুলিশ-আর্মারির ভার দেওয়া হল অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষকে, রেলোয়ে-আর্মারির ভার নির্মল সেন আর লোকনাথ বলের উপর। আর অম্বিকা চক্রবর্তী যাবে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন এক্সচেঞ্জে। কেউ-কেউ যাবে ধুমে, চল্লিশ মাইল দূরে, ফিস-প্লেট তুলতে। আর সাহেবগুলোকে মারতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, তারা অমনি পালাবে।

জাতীয় সেনাবাহিনীতে বাষট্টি জন ফৌজ, তার মধ্যে বেশির ভাগই কিশোর, স্কুল-কলেজের ছাত্র। সম্বল কটা পিস্তল আর বন্দুক আর বোমা। সম্বল সাহস শৌর্য মন্ত্রগুপ্তি আর বিপ্লবে বিশ্বাস। সম্বল অনুরাগ আর আনুগত্য।

এই অভিযানের সর্বাধিনায়ক সূর্য সেন। মাস্টার-দা।

স্কুলে অঙ্কের মাস্টারি করে বলে মাস্টার-দা। মাস্টারকে লোকে ভয় করে, না হয় ভক্তিও করে, কিন্তু কী গুণে সকলের কাছে দাদার ভালোবাসা পায় সেটার সঠিক অনুমানের মধ্যেই এই নেতৃত্বের ব্যাখ্যা। সূর্য সেন স্বাধীনতার বিদ্যালয়েও এক নির্ভুল অঙ্কের মাস্টার।

নিজামপল্টনে সূর্য সেনের হেডকোয়ার্টার। সেখান থেকে তিন দল যাবে তিন জায়গায় তিনটে মোটরে করে। পিছনে থাকবে পদাতিক-বাহিনী। অগ্রগামীদের সঙ্কেত পেলে তারা এগোবে সাহায্য করতে। তারপর যার যার কাজ সমাধা করে ফিরবে হেডকোয়ার্টারে, রিপোর্ট করবে।

রাত্রি সাড়ে-আটটায় এই মহা-আক্রমণের লগ্ন নির্ধারিত হল।

সেনাপতি ও সৈন্য সকলেই সমীচীন পোশাকে সজ্জিত। তৃপ্ত চোখে সবাইকে দেখলেন সূর্য সেন। সবাই আগুন হয়ে জ্বলছে, আবেগে-উৎসাহে ফুটছে, সকলেই মহৎ সংকল্পে দৃঢ়বদ্ধ।

কিন্তু মোটরগাড়ি যে তিনখানা চাই।

তৎক্ষণাৎ বেরুল দুজন। ট্যাক্সি-ড্রাইভার নাজির আহমেদকে খুন করে তৃতীয় ট্যাক্সি জোগাড় হল।

তাই অপারেশান সুরু হতে দু ঘণ্টা দেরি হয়ে গেল। কখনো-না-র থেকে দেরিও ভালো।

পুলিশ-আর্মারির সান্ত্রি 'হু-কামস' বলে বন্দুক তাক করবার আগেই গুলি খেয়ে মাটিতে পড়ল। আর সব পাহারাদার হাওয়া হয়ে গেল নিমেষে। বিপ্লবীরা অস্ত্রশস্ত্র যা পেল লুঠ করে নিল। ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে নিয়ে উড়িয়ে দিল জাতীয় পতাকা।

রেলোয়ে-আর্মারির সান্ত্রিও এক গুলিতে শেষ হয়ে গেল। সার্জেন্ট মেজর ফ্যারেল এসেছিল এগিয়ে, সেও বাঁচল না। দরজার তালাটা খোলা যাচ্ছে না দেখে একটা মোটা দড়ি বেঁধে আরেক প্রান্ত গাড়ির ল্যাজের সঙ্গে বেঁধে উলটো দিকে গাড়ি চালাল। হেঁচকা টানে ছিটকে গেল তালা। তারপর যত পারো কুড়িয়ে নাও গোলাগুলি, বন্দুক-রিভলভার।

তারপর দুটো আর্মারিতেই পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনের শিখারই ধ্বনি-রূপ বন্দেমাতরম।

সমস্ত একেবারে যুদ্ধের আঙ্গিকে সাজানো।

ধুমের কাছে রেল-লাইনও অপসারিত করা হল আর একটা মালগাড়ি বেলাইন হয়ে পড়ে রাস্তা জুড়ে রইল।

টেলিগ্রাফ টেলিফোনের লাইনও কাটা হল। কিন্তু ইউরোপিয়ান ক্লাবে একটাও লালমুখ মিলল না।

কেন, রাত তো বেশি হয়নি, ওরা পালাল কোথায়?

আজ ইস্টার তো, তাই মদ খেতে আসেনি বোধহয়।

ঠিকই তো, ইস্টার বলেই তো এ দিনটাকে নির্বাচিত করা হয়েছে। আইরিশদেরও তো এই ইস্টার-বিদ্রোহ। সে বিপ্লব-চিহ্নিত দিনটিই তো শুভময়।

কিন্তু সাহেবগুলো কোথায় গা ঢাকা দিল?

বলতে-বলতেই সামনে এসে পড়ল ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট উইল-কিনসনের গাড়ি। চক্ষের পলকে গুলি ছুঁড়ল বিপ্লবীরা। ড্রাইভার মরল, বডিগার্ড জখম হয়ে মাটি নিল। ম্যাজিস্ট্রেটও মাটিতে শুয়ে পড়ে মরার ভাব করল। মরল না।

নিজামপল্টনের হেডকোয়ার্টারে তিন দলের বিপ্লবীরা ফিরে এসে সূর্য সেনের কাছে রিপোর্ট করলে। সমস্ত কিছুই ঠিক-ঠিক হয়েছে, তবে দুঃখ সাহেবগুলোকে মারা গেল না। খবর এল তারা কর্ণফুলি নদী ধরে পালিয়ে গিয়েছে শহর ছেড়ে।

কিন্তু সারা গায়ে আগুন এ কে ছুটে আসছে এদিকে?

আরে, এ যে দলের লোক, হিমাংশু সেন—আর্মারিতে আগুন লাগাতে গিয়ে নিজের গায়েও লাগিয়ে বসেছে।

মাটিতে ঠেসে ধরে ধরে হিমাংশুর আগুন নেবানো হল। অনন্ত সিং আর গণেশ ঘোষ তাকে মোটরে করে রেখে আসতে গেল কোনো নিরাপদ আস্তানায়—বাইরের কেউ জানতে না পায় অথচ তার চিকিৎসা হয়।

হঠাৎ ওয়াটার-ওয়ার্কসের ওদিক থেকে শত্রুপক্ষ মেশিনগান চালাতে সুরু করল। তবে কি অন্য কোনো পথে ব্রিটিশের সৈন্য-

রসদ' এসে গেল নাকি ? কুছ পরোয়া নেই, পাল্টা জবাব দাও। পাল্টা জবাব শুনে স্তব্ধ হল মেশিন-গান।

ততঃ কিম ?

পরের অবস্থাটার বোধহয় অঙ্ক কষা ছিল না। কখনো-কখনো এক জায়গায় এসে মাস্টারদেরও বুঝি অঙ্ক ভুল হয়। অসহযোগ আন্দোলনে ব্রিটিশ সরকারকে নিশ্চল করব, ততঃ কিম ? তারপর কী। কী করে সে নিশ্চলকে সাগর পার করব ? হায়, সে অঙ্কটাই কষা নেই। সূর্য সেন আদেশ করল, যত পারো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে পাহাড়ের দিকে চলে যাও। আত্মগোপন করো।

'কিন্তু অনন্ত সিংরা তো ফেরেনি।'

'আর কত অপেক্ষা করা যাবে ওদের জন্যে ? কে জানে ওরা হয়তো ধরা পড়ে গেছে।'

বিপ্লবীরা প্রথমে গেল শুলুকবাহার পাহাড়ে, তারপর ফতেয়াবাদ পাহাড়ে, শেষে জালালবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নিল।

তিনটি পুরো দিন চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের করতলে। ট্রেন আসছে না, ট্রেন ছাড়ছে না, টেলিগ্রাফে টেলিফোনে সংবাদের দেওয়া-নেওয়া নেই, পথে-ঘাটে গাড়ি-ঘোড়া নেই—ইংরেজ সরকারের নিশ্চিত পতন ঘটেছে। আর বিপ্লবীরা আহার-নিদ্রা ভুলে দারুণ নির্দয়কে জীবনে প্রিয় হতে প্রিয়তর জেনে এ-পাহাড় থেকে ও-পাহাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। যারা ভীরুতায় আরামে-স্বাচ্ছন্দ্যে সংকুচিত হয়ে থাকতে আসে নি, যারা আত্মবিসর্জনেই উজ্জ্বল হয়ে থাকতে চায়, যারা দুঃখ বিপদ ভয় ও মৃত্যুকেই ভগবান বলে মানে, তারাই আজ মহাজীবন-নাটকের মহিমায় নায়করূপে দেখা দিল। বধে বা বন্ধনে কিছুতেই যাদের কুণ্ঠা নেই, অপরাজিত আত্মার মহত্ত্বে যারা দীপ্যমান, তারাই আজ জালালবাদ যুদ্ধের বিজয়ী বীর।

বাইশে এপ্রিল ইংরেজের সৈন্য ঘিরেছে জালালবাদ। বিকেল পাঁচটায় যুদ্ধ সুরু হল। এক দিকে দেড়হাজার গুর্খা সৈন্য নিয়ে

ইংরেজের ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফলস ও সুর্মা ভ্যালি লাইট হর্স বাহিনী, আরেক দিকে মুষ্টিমেয় কটি বাঙালি বিপ্লবী। এক দিকে শাসন-ত্রাসণের মহাগ্রাস, আরেক দিকে উদ্যত চেষ্টা, জাগ্রত শক্তি, অপরাভূয় সংকল্প।

বিশ্বাস করতে পবিত্রতম রোমাঞ্চ হয় সে-যুদ্ধে ইংরেজ হেরে গেল। তারা উপলব্ধি করলে বিপ্লবীদের পরাস্ত করতে হলে আরো সৈন্য দরকার, দরকার আরো আধুনিক রণসম্ভার।

বিপ্লবীদের সংখ্যা তখন বড়জোর পঞ্চাশ আর তাদের মধ্যে বেশি সংখ্যকেরই বয়েস পনেরো-ষোলোর মধ্যে। আর তাও তারা তিন দিন প্রায় অভুক্ত ও অপীত, পথশ্রমে দারুণ অবসন্ন। কিন্তু ওদের প্রতিজ্ঞায় অবসাদ নেই, প্রচেষ্টায় অবসাদ নেই, যেমন আগুনের অবসাদ নেই উত্তাপে আর দীপ্তিতে।

ভারতবর্ষে এমন যুদ্ধ অনেক দিন দেখেনি ইংরেজ। তাই না-পালিয়ে তাদের পথ কোথায় ?

কিন্তু বারোটি মহাপ্রাণ তারা শেষ করে দিয়ে গেল।

যুদ্ধে প্রথম শহিদ হরিগোপাল বল, লোকনাথের ছোট ভাই, ডাক-নাম টেগরা। শেষ নিশ্বাস ফেলবার আগে লোকনাথকে বললে, দাদা, কিছুতেই থেমোনা, শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাও।

দ্বিতীয় শহিদ ত্রিপুরা সেনগুপ্ত, ঢাকার ছেলে। হরিগোপালের পরনে ধুতি-শার্ট কিন্তু ত্রিপুরা পুরোদস্তুর সৈনিক। খাকি প্যাণ্ট-কোটে জুতোয়-মোজায় সুসজ্জিত। বললে, 'চললাম, দুঃখ কোরো না। আবার আমাদের দেখা হবে, আবার আমরা যুদ্ধ করব।'

তৃতীয় শহিদ নির্মল লালা, দলে সব চেয়ে কনিষ্ঠ। কোনো আত্মীয়স্বজনই তাকে সনাক্ত করতে এল না। তারও মুখে ঐ কথা : আমাদের যুদ্ধ সবে সুরু হয়েছে। আমাদের আরো অনেক মরতে হবে। পেরোতে হবে অনেক জয়তোরণ।

একে একে শহিদ হল বিধুভূষণ ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, প্রভাস

বল, জিতেন দাশগুপ্ত পুলিনবিকাশ ঘোষ, শশাঙ্ক দত্ত, অর্ধেন্দু দস্তিদার, মধুসূদন দত্ত আর মতিলাল কানুনগো। সূর্য সেন বললে, এদের সকলকে গার্ড অব অনার দাও। তাই হল, মুক্ত আকাশের নিচে পাহাড়ের চূড়ায় সবাই মৃত বীরসুন্দরদের অভিবাদন জানাল। পরে আবার আদেশ হল, অন্যত্র চলো, দুঃসাধ্যসাধনের পথে, আরো দূরে, চিরন্তন মুক্তির অমৃতের প্রার্থনা নিয়ে।

এগিয়ে চলো।

অম্বিকা চক্রবর্তী অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ চোখ চেয়ে দেখল ঘন রাত, কেউ কোথাও নেই ধারে-কাছে। কেউ কোথাও নেই। সে একা—একেবারে একা। অম্বিকা একাকীই পথ চলতে লাগল। সৃষ্টির আগে বিধাতাও তো একা ছিলেন। একা থেকেই অম্বিকা নতুনের সৃষ্টি করবে।

তেইশে এপ্রিলের ভোরবেলা আরো অনেক সৈন্যসামন্ত এনে ফেলল ইংরেজ। বুঝল বিপ্লবীরা জালালবাদ ছেড়ে চলে গেছে। চলো পাহাড় গিয়ে দখল করি, চষে ফেলি বেয়নেট দিয়ে।

গিয়ে দেখল—প্রকাণ্ড আবিষ্কার—বারোটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

লক্ষ্য করে দেখল, দুজনের মধ্যে এখনো জীবনের চিহ্ন আছে। একজন একেবারে যায়-যায়, আরেকজন খানিক্ষণ বুঝি বা লড়তে পারবে মৃত্যুর বিরুদ্ধে।

মতিলাল কানুনগোকে মিলিটারির কর্তা জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার নাম কী?'

'হরিবোল।' বলে, বলার সঙ্গে-সঙ্গে মতিলাল চোখ বুজল।

অর্ধেন্দু দস্তিদারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তার তলপেটে ও ডানবাহুতে গুলি লেগেছে। প্রাণপণ চেষ্টা করা হোক তাকে বাচানো যায় কিনা।

কিন্তু সদর এস-ডি-ওর শুধু লোভ মুমূর্ষুর কাছ থেকে একটা

স্বীকারোক্তি আদায় করা যায় কিনা। শোনা যায় সে নাকি মৃতের থেকেও স্বীকারোক্তি আদায় করে নিতে পারে।

ডাক্তার আর নার্স, যারা ভাবছে সব সময়েই রোগীর কাছে থাকা দরকার, তারাও এস-ডি-ওর চক্ষুশূল হল। আপনারা একটু সরে যান না, আমি রোগীর সঙ্গে একটু আলাপ করি।

একটা আহত অজ্ঞান রোগী কটা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে সংগ্রাম করছে, তার সঙ্গে নিরালায় বসে মহামান্য এস-ডি-ও কী করবেন, ইংরেজ সরকারই বলতে পারে।

দীর্ঘ এক স্বীকারোক্তি তৈরি করে ফেলল এস-ডি-ও। পৃথিবীকে বিশ্বাস করতে বলল, অর্ধেন্দু সজ্ঞানে স্ব-ইচ্ছায় কারু দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে এই স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

অর্ধেন্দুর জ্ঞান এল তেইশের মধ্যরাত্রির কিছু পরে। শুধু একবার কথা কয়ে উঠল—শেষবার। বললে, 'মাস্টারদা, আমি ভুলি নি। মুক্তি নয় মৃত্যু। মৃত্যু নয় মুক্তি।'

সমস্ত দেশে, শুধু দেশে নয়, সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল এই বিপ্লববার্তা।

খবর শুনে গান্ধি বিমর্ষ হলেন। তাঁর কাছে স্বাধীনতার চেয়েও অহিংসা বড়। কিন্তু সুভাষ? মনে-মনে মালাচন্দন দিয়ে বন্দনা করল বিপ্লবীদের। যে কোনো উপায়েই হোক স্বাধীনতা অর্জন করা নিয়ে কথা। ছলে বলে কৌশলে যে কোনো উপায়েই হোক ঈশ্বরকে লাভ করা নিয়ে কথা। ভক্তিতে বিরক্তিতে সমর্পণে বিদ্রোহে—যে কোনো উপায়ে। দ্রুততম উপায়ে।

গান্ধিজির কাছে বুঝি প্রাপ্তির চেয়েও পদ্ধতি বড়। আর সুভাষের কাছে সর্বকালে প্রাপ্তিই মহত্তম।

পনেরো

সুভাষ উনিশশো তিরিশের সেপ্টেম্বরে জেল থেকে বেরুল। সেনগুপ্তের মুক্তির দিনও সেই তারিখ। গত এপ্রিলের নির্বাচনে সেনগুপ্ত মেয়র হয়েছিল কিন্তু ছ মাসের মধ্যে শপথ নিতে পারেনি বলে সে নির্বাচন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আবার নতুন করে নির্বাচন হল। সুভাষ দাঁড়াল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। সুভাষই জিতে গেল।

সুভাষই এখন কলকাতার মেয়র।

এর মধ্যে দেশ আর কতদূর এগোল? চলছে এখনো শুধু টালবাহানা, হরেক রকম দরকষাকষি। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়েছে—যা সব সুপারিশ করেছে তা কহতব্য নয়, রাঘববোয়াল দূরের কথা, চুনোপুঁটিও নয়। লিবারেলরাও পর্যন্ত চটে গেছে, আইনসভা পর্যন্ত তা প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে। বেরিয়ে পড়েছে বিদেশী দূতেরা, যদি কোনোমতে একটা মীমাংসায় পৌছুনো যায়। উঠেছে রাউণ্ড টেবল কনফারেন্সের কথা। নি-কেজোদের কাজ বেশি, ঘন ঘন জেলে যাচ্ছে গান্ধির সঙ্গে দেখা করতে। কী আপনার সর্ত বলুন, কী হলে এই আইন-অমান্য আন্দোলন আপনি তুলে নিতে পারেন।

ওদিকে কংগ্রেস-আফিসের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে পুলিশে, সব খাতা-পত্র ব্যাজ-পতাকা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, চলেছে উদ্দাম লাঠি-বাজি। কথায়-কথায় একশো চুয়াল্লিশ জারি হচ্ছে, সভা ভেঙে দিচ্ছে গায়ের জোরে। ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করে নিচ্ছে। খবরের কাগজকে সত্য কথা বলতে দিচ্ছে না। সবচেয়ে বেশি অত্যাচার বাংলায়, তার মেদিনীপুরে। কাঁথিতে বেআইনি লবণ তৈরি দেখছে জনতা, পুলিশ গুলি চালিয়ে জনতার মধ্যে থেকে পঁচিশজনকে ঘায়েল

করলে। জনতা যখন ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে যাচ্ছে তখনই তো তাদের গুলি করতে আনন্দ—চেচনাতে এমনি অবস্থায় গুলি চালিয়ে পুলিশ আঠারো জনকে জখম করলে আর ছজন খুন। তমলুকে চাষীদের খেত-খামার পুড়িয়ে দিলে, সত্যাগ্রহী শুধু নয়, সত্যাগ্রহে যাদের সমর্থন আছে, তাদেরও বাড়িঘর আস্ত রাখল না। অত্যাচার বহু জায়গায় ধর্ষণের চেহারা নিল। মাত্রার ধার ধারল না কোথাও।

ওঁরা গোল টেবিলের স্বপ্ন দেখুন, সর্ত নিয়ে তর্ক করুন, আমরা মেদিনীপুরের ছেলে, মেদিনীপুরের মেদিনী শত্রুরক্তে রঞ্জিত করে বোঝাই আমাদের মেদ-মজ্জা বীরত্বের কোন ধাতু দিয়ে তৈরি। দেখাই কী করে নিতে হয় প্রতিশোধ।

মেদিনীপুরের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট জেমস পেডি নিমন্ত্রিত হয়ে কলেজিয়েট স্কুলে এসেছে কী এক শিক্ষা-প্রদর্শনী দেখতে—প্রথম ঘরটাতে ঢুকতেই তার উপরে গুলি। দুটি কিশোর ছেলেও বুঝি এসেছিল প্রদর্শনীতে, কিন্তু তারা দেখল প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় আলেখ্য অত্যাচারী ইংরেজরাজত্বের প্রতিভূ এই ম্যাজিস্ট্রেট। পেডি কে, পেডিকে তারা চেনে না, তারা গুলি করছে রাজপুরুষকে। সাত-আটটা গুলি দুদিক থেকে একসঙ্গে ঝরে পড়ল পেডির উপর, পেডি ছুটে বেরিয়ে গেল সামনের দিকে, কিন্তু কদ্দুর গিয়েই পড়ল মুখ থুবড়ে। রক্তে মাটি ভেসে গেল। একটা ঘোড়ার গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল, কলকাতা থেকে চলে এল ডাক্তার আর নার্স, কিন্তু পেডিকে বাঁচানো গেল না।

আততায়ীরা গেল কোথায়? চোখের পলকে তারা কর্পূরের মত উবে গিয়েছে।

পেডির চেয়ারে এসে বসেছে ডগলাস।

কিন্তু ডগলাসের প্রাণে সুখ নেই! রাজামুন্দ্রি কলেজের অধ্যক্ষ তার ভাই, তাকে চিঠি লিখছে ডগলাস: 'আমি ভয়াবহ বিপদের মধ্যে বাস করছি।'

'প্রাণের বদলে প্রাণ চাই।' মেদিনীপুরের ব্রিটিশ উচ্ছেদ সমিতি বেনামী চিঠি পাঠিয়েছে ডগলাসকে : 'নির্যাতন থামাও বলছি, নয়তো নিজেই যন্ত্রণায় পড়বে।'

উপায় কী, ডগলাসকে তো তার কর্তব্য করে যেতে হবে।

পদাধিকারবলে ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান, বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করতে এসেছে ডগলাস, টেবিলের উপর মাথা নামিয়ে কী সব কাগজপত্র দস্তখৎ করছে, হঠাৎ গুলির শব্দ হল। একাদিক্রমে ছটা শব্দ। কী সর্বনাশ! কাকে মারল?

আর কাকে! ডগলাস রক্তাপ্লুত হয়ে ঢলে পড়ল চেয়ারে।

পেডিকে যেমন মেরেছে, তেমনি। দু দুটি ছেলে দু পাশে এসে দাঁড়িয়েছে এবং কালহরণ না করেই ঘোড়া টিপেছে। এরা কারা, বেচারি কর্মচারী না আর কেউ, বডিগার্ডদের তটস্থ হতে না দিয়েই কর্মারম্ভ ও কর্মশেষ।

কিন্তু এবার দুজনেই হাওয়া হয়ে যেতে পারল না। প্রদ্যোত ধরা পড়ল।

ধরা পড়ল অনেকদূর ছুটে গিয়ে, একটা কাঁটাঝোপের মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়বার পর।

'বলো তোমার সঙ্গীর নাম কী?'

'বলব না।'

বলবে না? অকথ্য শুধু নয়, অভব্য অত্যাচার হল প্রদ্যোতের উপর। এখনো বলো দলের আরেকজনের নাম কী?

যন্ত্রণা আর সহ্য করতে না পেরে প্রদ্যোত বললে, 'শীতাংশু বসু।'

পুলিশের স্ফূর্তি তখন দেখে কে! নাম বার করতে পেরেছি। ধরতে পারলে পাঁচশো টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে—টাকাটা কার ভাগ্যে না জানি নাচছে—সবাই ব্যস্ত-ব্যগ্র হয়ে উঠল।

কিন্তু বহু খোঁজাখুঁজি করেও শীতাংশুর পাত্তা পাওয়া গেল না। সন্দেহ রইল না, প্রদ্যোত পুলিশকে ধোঁকা দিয়েছে।

আর কী করা যাবে, প্রদ্যোত এখন চলে গিয়েছে জেল-জিম্মায়, ওর উপর আর পুলিশের থাবা বসানো যাবে না। শুধু ফাঁসির দড়িটাকেই পাকানো যাবে বসে।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল প্রদ্যোতের ফাঁসির হুকুম দিল। হাইকোর্ট রায় বহাল রাখলে।

ওজন বেড়ে গিয়েছে প্রদ্যোতের। হাসতে-হাসতে মঞ্চে গিয়ে দাঁড়াল। ফাঁসির দড়িটাকে সস্নেহে স্পর্শ করল—যেন উপর থেকে কে এক বন্ধু তার দিকে সোহার্দ্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

তৃতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বার্জকে খুন করা হল খেলার মাঠে। যতদূর সম্ভব বার্জ তার বাংলোতেই আফিস করে কিন্তু তার খেলাধুলায় খুব ঝোঁক, বিশেষত ফুটবলে। এমনিতে তাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, বাইরে কোনো সভা-সমিতিতে যদি বা যায়, চার দিকে প্রহরীর দেয়াল দিয়ে এমন আবৃত থাকে, সাধ্য নেই কেউ একটা চোখের দৃষ্টি পাঠায়। কিন্তু খবর পাওয়া গেল কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের সঙ্গে মেদিনীপুর টাউন ক্লাবের যে ম্যাচ হচ্ছে তাতে টাউন ক্লাবের হয়ে বার্জ খেলবে। বার্জ যে টাউনক্লাবের প্রেসিডেন্ট।

এবার বুঝি বদান্য মহাকাল স্বর্ণ সুযোগ পাঠিয়ে দিল।

দেশলক্ষ্মীর সমস্ত ভাণ্ডার যারা শতচ্ছিদ্র করে শুষে নিচ্ছে, রেখে যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের মরুভূমি, তাদেরকে দেবতা আর ক্ষমা করবে না।

এ শুধু অত্যাচারের প্রতিশোধ নয়, বিপ্লবের পথে স্বাধীনতাকেই এগিয়ে নিয়ে আসা।

মৃগেন্দ্র কুমার দত্ত, অনাথবন্ধু পাঁজা, নির্মলজীবন ঘোষ, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী। আরো কত জন হাত-লাগানো বন্ধু। রথের দড়ি তো বাইরে নয়, রথের দড়ি অদৃশ্য হাতে-হাতে প্রচ্ছন্ন প্রাণে-প্রাণে।

কত চেষ্টায় রিভলভার সংগ্রহ করা হয়েছে, কত যত্নে খড়্গাপুরে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রাখা হয়েছে, কত কৌশলে শিখেছে গুলি

ছোঁড়া, তারপরে সাইকেলে করে এনেছে মেদিনীপুর, রেখেছে অন্তঃপুরের অন্তরালে। এর পিছনে কত সংগঠন-চাতুর্য, কত মন্ত্রগুপ্তি, কত সাহস, কত সহিষ্ণুতা, মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার মত কী বলিষ্ঠ যোগসাধন! এদের কে ডাকল কে শেখাল কে পাঠাল! বিপদবেষ্টিত জীবন কে এদের কাছে রমণীয় করে তুলল! কে এদের ঝোঝাল ফাঁসির কাষ্ঠফলকেই রাজকীয় সমারোহ!

মাঠের চারদিক পুলিশ-গার্ডে ছেয়ে আছে, রিজার্ভ পুলিশের সাহেব ইনস্পেক্টর রেফারি। এখনো বাঁশি বাজেনি, ছুদলের খেলোয়াড়রা নেমেছে প্র্যাকটিস করতে। বল এদিক-ওদিক চলে গেলে দর্শকেরাও না কোন মাঠে নেমে ছু-একটা শট মারছে। মৃগেন আর অনাথ আরো একটু বেশি এগিয়েছে, তারা খেলোয়াড় সেজে মহমেডান স্পোর্টিংএর দলের মধ্যে মিশে গিয়েছে। রেফারির বাঁশির পর ছু দল লাইন-আপ করে দাঁড়াবার পরই তো শুধু বোঝা যাবে, তারা ছুজন অবান্তর। এখন এই গোল-প্র্যাকটিসের সময় খেলোয়াড়দের এলোমেলো অবস্থায় তাদেরকে কে চিহ্নিত করতে যাচ্ছে? মহমেডান স্পোর্টিং ভাবতে পারে তারা বুঝি বা টাউন ক্লাবের লোক।

এই যে এদিকে, আমাকে দে, আমাকে। এমনি বলতে-বলতে মৃগেন আর অনাথ বল নিয়ে পরস্পরকে পাশ দিতে-দিতে এগিয়ে চলেছে। চলেছে টাউন ক্লাবের দিকে। চলেছে যেখানে বার্জ রয়েছে ফরোয়ার্ড লাইনে। বল তার পায়ের কাছে এসে পড়তেই ক্ষণকালের জন্যে বার্জ বোধ হয় অন্যমনস্ক হয়েছে, আর চার-পাঁচ হাত দূর থেকেই ছুই বন্ধু সমস্বরে গুলি করে বসেছে। মৃগেনের হাতে রিভলভার আর অনাথের হাতে অটোম্যাটিক পিস্তল।

এত-রণসজ্জা এত রক্ষাসজ্জা—সমস্ত ব্যর্থ করে দিয়ে বার্জ চক্ষের নিমেষে শেষ হয়ে গেল।

এমন এদের বল-পাশের কায়দা মৃগেন চলে গিয়েছে বার্জের

পিছনে, অনাথ রয়েছে সামনে। পিছন থেকে পাঁচ রাউণ্ড আর সামনে থেকে তিন—বার্জ আর সশরীরে হাসপাতালে যেতে পেল না।

মাঠে যারা সশস্ত্র পুলিশ-অফিসার ছিল তারা মৃগেনকে তাড়া করল। সহকারী পুলিশ সুপার লাফিয়ে পড়ল মৃগেনের উপর। গুলি যা ছুঁড়ল মৃগেন, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বার্জের পুলিশ-রক্ষীরাই তাকে গুলি করল।

আর রেফারি নিজেই গুলি করল অনাথকে।

অনাথ মাঠেই মারা গেল আর মৃগেন মারা গেল হাসপাতালে।

ধরা পড়ল নির্মলজীবন, ব্রজ, রামকৃষ্ণ ও আরো চারজন। স্পেশাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে প্রথম তিনজনের ফাঁসি হল আর শেষের চারজনের দ্বীপান্তর।

ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়ল সাহেব মহলে। ইংলণ্ডে রব উঠল বাঙালিদের আরো পীড়ন করো। রসাতলে পাঠাও। সমস্ত বাংলাদেশটাকেই ফাঁসিকাঠে লটকে দাও।

সর্বভারতীয় ভূমিকায় ইংরেজের সঙ্গে দাবা খেলায় কোথায় কে কিস্তি দেবে দুপক্ষ তারই সুযোগ খুঁজছে। একদিকে গান্ধি আরেক দিকে আরউইন।

গান্ধিজি বললেন, তিন সর্তে আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নিতে পারি। প্রথমত গোলটেবিল বৈঠকের কর্মসূচীর মধ্যে ভারতকে স্বাধীনতার সারবস্তু দেবার কথাটা সর্বাগ্রে রাখতে হবে। লবণ আইন তুলে দিতে হবে এবং মাদকদ্রব্য ও বিদেশী বস্ত্রবর্জনের দাবিকে দাবানো চলবে না। আর আন্দোলন তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দিতে হবে সমস্ত আটক বন্দীদের।

আরউইনও ধূর্ত, দুমুখো। সে মুখে বলছে, জাগ্রত ভারতবর্ষের জাতীয় অধিকারের দাবি আর আমরা অস্বীকার করতে পারব না, করতে গেলে ভুল হবে—অথচ কাজে অর্ডিন্যান্সের উপর অর্ডিন্যান্স

জারি করছে, কথায়, লেখায়, চলায়, একত্র হওয়ায়, এমনকি প্ররোচনায়ও অর্ডিন্যান্স। আর গোলটেবিল বৈঠকও যদি বসাল, ছিয়াশি জন সদস্যের মধ্যে একজনও কংগ্রেসের নয়।

একেই বলে না আছে নেই আয়োজন, পাড়া ভরে নিমন্ত্রণ।

এ শুধু কংগ্রেসকে অপমান নয়, ব্রিটেনের নিজের গালে চুনকালি লাগানো। জগৎকে বোঝানো আমরা ভণ্ডের শিরোমণি, আমাদের সমস্ত আশ্বাস অন্তঃসারশূন্য।

পিঁপড়ের বলও বল, কাঠবিড়ালির সাহায্যও সাহায্য। এখনো অগণন লোক জেলের বাইরে আছে, এখনো ব্রিটিশ নির্যাতন আকাশছোঁয়া হয়নি, সুতরাং আন্দোলন আরো জোরদার করো। আগামী ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা-দিবস পূর্ণ আড়ম্বরে প্রতিপালন করো। আর পতাকার নিচে দাঁড়িয়ে আবার শপথ নাও, স্বাধীনতা অর্জন না করা পর্যন্ত দুর্বার সংগ্রাম করে যাব, অকুতোভয়ে ও অপ্রতিহত গতিতে।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর মধ্যরাত্রির আগেই গভর্নমেণ্ট গান্ধিজি সহ ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মুক্তি দিয়ে দিল।

আরউইন বললে, এস এবার তোমাদের সঙ্গে কথা বলি। তোমাদের ছাড়া কিছুই হবে না এ বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

আবার স্তোক, আবার ধোঁকা। শুধু কথায় মন ভেজানো। কিন্তু শত মেঘ করুক, শুধু মেঘেই মাটি ভেজে না।

কিন্তু ছাব্বিশে জানুয়ারি সুভাষ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, স্বাধীনতা-দিবস উদযাপন করবেই। সারা কলকাতায় একশো চুয়াল্লিশ, তাতে কী, স্বাধীনতা একশো চুয়াল্লিশের চেয়েও বেশি। গত বছর ষোলই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু-দিবস পালন করতে দেয়নি গভর্নমেণ্ট, ঐ একশো চুয়াল্লিশের জোরে। তখন সুভাষ জেলে। কিন্তু আজ?

আসুক বাধা, বাধাই বিধাতার যথার্থ বিধান। বাধা না থাকলে আমাদের শক্তি উদ্বোধিত হবে না। আসুক আঘাত, আঘাতই

আমাদের বিদ্রোহরুদ্র করে তুলবে। জগতে জড়কে সচেতন করে তোলবার একমাত্র উপায় আঘাত। আঘাতই তো আমাদের আবদ্ধ শক্তিকে শৃঙ্খলমুক্ত করবে। সুতরাং এই দুর্যোগকেই মহাসুযোগ বলে মেনে নেব।

রাস্তায় শোভাযাত্রা নিয়ে বেরুলে পুলিশ তো গ্রেপ্তার করবেই, তার আগে না বাড়ির মধ্যেই আটক করে রাখে!

পুলিশেরও সেই অভিসন্ধি। রাত থাকতেই তারা ঘিরেছে উডবার্ন পার্কের বাড়ি, ঘিরেছে কিরণশঙ্করের বাড়ি, পুলিন দাসের বাড়ি। কিরণশঙ্কর ও পুলিন দাসকে আটকেছে, কিন্তু সুভাষ— সুভাষ কোথায়? সুভাষ বাড়িতে নেই।

তুমি ফের ডালে ডালে আমি ফিরি পাতায়-পাতায়। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছে সুভাষ। ধুলো দিয়ে রাত কাটিয়েছে কর্পোরেশানের দালানে। সুভাষ কর্পোরেশানের মেয়র, মেয়রের যোগ্য শোভাযাত্রাই তো তাকে বের করতে হবে। কর্পোরেশানের মধ্যেই তার কর্মচারীদের পুলিশ আটক করে কী করে?

বাড়িতে না পেয়ে পুলিশ ঠিক করল রাস্তাতেই যা করবার করবে। পুলিশের মধ্যে আছে পুলিন চ্যাটার্জি, ভূপেন ব্যানার্জি আর রবার্টসন।

বিরাট শোভাযাত্রার অগ্রনায়ক কে এ তেজোনিলয় দিব্যদীপ্ত পুরুষ চলেছে নগ্নপদে। কে এ লোকেশলোকগুরু। সর্বত্র আলো আর আশা, সাহস আর শক্তি বিকীর্ণ করতে করতে চলেছে, পবিত্রের পবিত্র, মঙ্গলের মঙ্গল, মিত্রের আশ্রয়, শত্রুর শতঘ্নী, সূর্যবীর্যসমুদ্ভব, হাতে জাতীয় পতাকা, ঐ তো সুভাষ। পারিবারিক কারণে অশৌচ পালন করার জন্যেই হয়তো গায়ে উত্তরীয়। পাশে দুই সহচর, কর্পোরেশানের ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় আর শৈলেন ঘোষাল। আর পিছনে? পিছনে অগণিত জনসঙ্ঘ। ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রবাহ।

আর সকলকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পিছনে থাকবার মানুষ নয় সুভাষ। যদি লাঠি পড়ে আমার মাথার উপরেই আগে পড়ুক।

ওদিক জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলি বেরিয়ে এসেছে মেয়েদের শোভাযাত্রা নিয়ে।

আর এগোবেন না। ব্রিটিশ পুলিশের আস্ফালিত লাঠি উল্লসিত হতে চাইল।

এ বলা বৃথা। আমরা কোনোদিন থামি না, পেছোই না, চিরকাল আমরা এগিয়ে চলি। আমাদের সংকল্প বৃথা নয়, নিষ্ঠা ক্ষীণদুর্বল নয়। মারতে হয় মারো, কিন্তু আমাদের বুকের ধনকে কেড়ে নিতে পারবে না। না, কিছুতে না।

সুভাষের হাত থেকে জাতীয় পতাকা কেড়ে নিতে চাইল পুলিশ। না, কখনো না। দুই হাতে দৃঢ় করে পতাকা ধরে রইল সুভাষ।

তখন পুলিশ উদ্দাম হাতে সুভাষের উপর লাঠি চালাল।

মার ডালো। লালমুখো ফিরিঙ্গি পুলিশের তখন কী উদগ্র বন্যতা।

'মেরো না ওঁকে।' দুঃসাহসের দীপ্তি নিয়ে এগিয়ে এল জ্যোতির্ময়ী। বললে, 'উনি কলকাতার মেয়র।'

আমরা আমাদের মন্ত্র ভুলব না, বন্দেমাতরম। আমরা আমাদের বিত্ত ছাড়ব না, আমাদের জাতীয় পতাকা, স্বাধীনতার পতাকা। যতক্ষণ না অজ্ঞান হয়ে লুটিয়ে পড়ি, ভুলব না, ছাড়ব না, ফিরে যাব না।

লাঠির ঘায়ে সুভাষ অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

পরদিন তাকে সুস্থ করে নিয়ে এল কোর্টে।

চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট রক্সবার্গ জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কী বলবার আছে?'

সম্ভ্রান্ত ও সরল, বিনয়ী ও সুদৃঢ়—সুভাষ বললে, 'মামলা সম্পর্কে আমার কিছু বলবার নেই। আমি অসহযোগী, আমি মামলায়

কোনো অংশ নিই না। কিন্তু লালাবাজার লক-আপে পুলিশি বর্বরতার বিষয়ে কিছু বলতে চাই।

রক্ষবার্গ নির্লিপ্ত মুখে বললে, 'যা বলবার দরখাস্তে লিখে দিন।'

'আমার হাতে ব্যথা, লিখতে পারব না।'

রক্ষবার্গ তাকিয়ে দেখল আসামীর ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। তখন সে নিরুপায় হয়ে বললে, 'আচ্ছা, আমি নোট করে নেব।'

কী নোট করলে, সুভাষের হাতের জখম, না, পুলিশের নির্দয়তা —কিছু বোঝা গেল না। নোট করল, আইনভঙ্গের অপরাধে সুভাষ দোষী আর তার শাস্তি ছয়মাস সশ্রম কারাবাস।

ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যেরা ছাড়া পেয়ে সমবেত হয়েছে এলাহাবাদে, মতিলাল নেহরুর গৃহে, স্বরাজভবনে। মতিলাল তাঁর আনন্দভবন কংগ্রেসকে দান করেছেন। আনন্দভবনই স্বরাজভবন। অসুস্থতার জন্যে তাঁকে জেল থেকে আগেই ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু কিছু পরে, সাতুই ফেব্রুয়ারি, তিনি তাঁর মরদেহই ছেড়ে গেলেন। যাবার আগে মহাত্মাজিকে বললেন, 'ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ এইখানে, এই স্বরাজভবনে, আমারই উপস্থিতিতে, নির্ণয় করুন। আমার দেশমাতার ভাগ্যনিরূপণের সসম্মান মীমাংসায় আমিও পক্ষভুক্ত হই। যদি মরতেই হয়, যেন স্বাধীন ভারতের কোলে শুয়েই মরি। আমাকে আমার শেষ ঘুম পরাধীনতার মধ্যে নয়, স্বাধীনতার মধ্যে ঘুমুতে দাও।'

মতিলালের মৃত্যুতে দেশ আবার নতুন করে শোকাচ্ছন্ন হল। কিন্তু সংগ্রাম শোক-দুঃখ মানে না, সংগ্রাম শুধু অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে।

আরউইন বোধহয় চাইছিল গান্ধির কাছ থেকে কোনো ইঙ্গিত আসুক। সত্যাগ্রহীর কোনো অভিমান নেই, গান্ধি আরউইনের সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে চিঠি লিখলেন, আরউইন তড়িঘড়ি ডেকে পাঠাল গান্ধিকে।

তারপর সুরু হল কথা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা—দিনের পর দিন। দেখা গেল আরউইন যেন সত্যিই কিছু দিয়ে-থুয়ে কংগ্রেসকে শান্ত করতে চায়।

আইন-অমান্য আন্দোলন যেন ক্রমশই জাঁকিয়ে উঠেছে। গুজরাটে উত্তরপ্রদেশে বাংলায় কোনে কোনো অঞ্চলে ট্যাক্স-বন্ধ প্রায় সম্পুর্ণ হয়েছে। বাংলায় তার উপরে চলেছে সশস্ত্র বিপ্লব। বিলিতি কাপড় শুধু নয়, বিদেশী দ্রব্যই চলে যাচ্ছে বাজার থেকে। সবচেয়ে বড়ো কথা, দলে-দলে মেয়েরা নেমে পড়েছে, অত্যাচারে-অপমানেও ঘরে ফিরে যাচ্ছে না। সীমান্ত প্রদেশও টলমল।

আরউইন ভাবলে, যদি খানিকটা কাট-ছাঁট করে মিটিয়ে নেওয়া যায় তো মন্দ কী।

সতেরোই ফেব্রুয়ারি থেকে সুরু করে ত্রুসপ্তাহ কথা চলল, তারপর পাঁচুই মার্চ গান্ধি-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

দেশের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনা হতাশ হয়ে গেল। সমস্ত বিপ্লববুদ্ধি বিমূঢ় হয়ে থমকে দাঁড়াল। যেন ধূমায়মান পর্বত মূষিক প্রসব করল। বন্দরের কাছাকাছি এসে তলিয়ে গেল জাহাজ।

ভারতের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে একটা গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসকে ডাকা হবে শুধু তার বিনিময়ে কংগ্রেস সমস্ত আইন-অমান্য আন্দোলন তুলে নিল।

খুচরো কটা উপশমের ব্যবস্থা হল বটে, যেমন বন্দীদের ছেড়ে দেবে, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবে, অর্ডিন্যান্সগুলি তুলে নেবে, সমুদ্র থেকে খানিকটা জায়গা পর্যন্ত নুন তৈরি করতে পারবে বা মদ-গাঁজার দোকানে করতে পারবে পিকেটিং। কিন্তু এ সব খোলামকুচি দিয়ে কী হবে, আসল হীরে কই, কোহিনূর কই? আসল ঘরে মশাল নেই ঢেঁকিশালে চাঁদোয়া। এ যে অতিমেঘে অনাবৃষ্টি!

চুক্তির সর্তানুসারে সুভাষ বেরিয়ে এল জেল থেকে। কিন্তু কই স্বাধীনতা কই?

দেশ আবার কাজ ফেলে কথার অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল; কথার বেপারি বণিক ইংরেজকে কথা দিয়ে ভোলানো যাবে এ কথা কে বিশ্বাস করে?

বিক্ষত বাংলা আরো বেশি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

সুভাষ যেদিন বেরুল সেদিনই গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই ছুটল। এই কি গান্ধীবাদ?

ষোলো

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায় বেরুল উনিশশো তিরিশের সাতুই অক্টোবর। ভগৎ সিং, রাজগুরু আর শুকদেবের ফাঁসির হুকুম হল আর বাকি আটজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

আপিল হল প্রিভি কাউন্সিলে। উনিশশো একত্রিশের এগারোই ফেব্রুয়ারি সে আপিল অগ্রাহ্য হল।

গান্ধিজি আরউইনকে অনুরোধ করলেন ঐ তিনটি জীবন বাঁচিয়ে দেওয়া হোক। ফাঁসির বদলে দ্বীপান্তরের আদেশ হলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না, বরং দেশবাসী ইংরেজের বদান্যতায় প্রসন্ন হবে। দেশবাসীর প্রসন্নতার দাম অনেক।

আরউইন এমন একখানা ভাব দেখাল যে বিষয়টি সে গভীরভাবে বিবেচনা করছে। সকলের মনে আশা জাগল, ফাঁসি বোধহয় রদ হল।

বোম্বাই থেকে দিল্লি সুভাষ মহাত্মার সঙ্গে এক ট্রেনে এক কামরায় এল। কিন্তু দিল্লিতে এসে সংবাদ শুনে সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেল—আরউইন নাকি ফাঁসি দেওয়াই স্থির করেছে।

সুভাষ গান্ধিকে বললে, 'আপনি আপনার চুক্তি ভেঙে দিন। আক্ষরিক অর্থে না হোক আন্তরিক অর্থে এই ফাঁসি দিল্লি-চুক্তির বিরুদ্ধে।'

গান্ধিজি চুপ করে রইলেন। সহিংস বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে তিনি চুক্তি ভাঙবেন?

গান্ধিজি নিজের পথে নিজের মত দেশকে এগিয়ে নিয়ে চলুন, বিপ্লবীরাও তাদের ধর্মে অবিচলিত থেকে তাদের বিপুল লক্ষ্যে ধাবিত

হোক। অন্তত তারা শেখাক কী করে সাহসে দুর্জয় থাকা যায়, কী করে ক্ষীণ হস্তে তুলে ধরা যায় ভৈরবের রুদ্র পিনাক, কী করে কোনো মীমাংসার মধ্যে না গিয়েই জীবনকে পূজাঞ্জলি করে উৎসর্গ করে দেওয়া যায়। দেখাক তাদের বিপদে দ্বিধা নেই, শাস্তিতে দণ্ড নেই, মৃত্যুতে বিভীষিকা নেই। তারা কোনো লাভের আশা করে না, কোনো স্বার্থচিন্তায় তারা সংকুচিত নয়, অর্থ নয় আরাম নয় খ্যাতি নয় নিরাপত্তা নয়, কোনো প্রতাপ-প্রতিপত্তি নয়—শুধু একমাত্র স্বাধীনতার টানে তারা ঘরছাড়া দিকহারা—অত্যাচারীকে ক্ষমা না করার বীর্যেই তারা উর্জস্বান। তারা ভীরু নয়, কপট নয়, তারা নিষ্ক্রিয় শান্তির ললিতবাণী মুখে নিয়ে ছদ্মবেশ ধরে ঘোরে না।

এলাহাবাদে অ্যালফ্রেড পার্কে চুপচাপ বসে ছিল চন্দ্রশেখর আজাদ—পাশে তার এক সঙ্গী। সেই চন্দ্রশেখর—দিল্লি কাকোরি লাহোর সব মামলাতেই যে নায়ক পলাতক, হয় নৌকোর মাঝি হচ্ছে, নয় কারু মোটর-ড্রাইভার—কিন্তু পুলিশ তাকে কিছুতেই বাগাতে পারছে না। যেখানে পালাবার ক্ষুদ্রতম ছিদ্রটুকু পর্যন্ত নেই সেখান থেকে সে অনায়াসে উবে যেতে পারে—তার সম্বন্ধে পুলিশের এই হুঁশিয়ারি। পুলিশ পর্যন্ত তার পলায়নের চাতুরীতে সপ্রশংস। কিন্তু সেই চন্দ্রশেখর, সকাল নটায়, পার্কের বেঞ্চিতে বসে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল।

প্রকাণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে, যদি কেউ ধরে দিতে পারো চন্দ্রশেখরকে, ওরফে সীতারামকে, ওরফে পণ্ডিতজিকে, বাড়ি ভেলুপুরা, বেনারস। যে অসহযোগ আন্দোলনে স্কুল ছেড়েছে, আইন-অমান্য আন্দোলনে জেলে গিয়ে যে বেত খেয়েছে; তারই অভ্যুত্থানের স্বপ্নচ্ছবি কাকোরিতে, লাহোরে, দিল্লির এসেমব্লিতে। ঐ যে গাছের নিচে বন্ধুর সঙ্গে বসে আছে চুপচাপ।

ভদ্রবেশী গুপ্তচরেরা দেখতে পেয়ে কোতোয়ালিতে খবর পাঠাল।

একটু কি অন্যমনস্ক ছিল আজাদ? চোখ চেয়ে দেখল হাত চল্লিশ দূরে ছজন পুলিশ কর্মচারী এগিয়ে আসছে।

নিশ্চয়ই তার দিকে। পিস্তল তুলে নিল আজাদ।

কিন্তু পুলিশের গুলিই বুঝি মুহূর্তের এক ভগ্নাংশ আগে ছোঁড়া হল। আজাদ জখম হতেই গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল।

আর সেই অন্তরাল থেকেই সে একা শত্রুর সঙ্গে প্রায় পনেরো মিনিট লড়লে।

প্রথম গুলি লেগেছিল পায়ে, দ্বিতীয় গুলি বাম বাহুতে। তবু আজাদের যুদ্ধে নিবৃত্তি নেই। সে তিন-তিনটি পুলিশ কর্মচারীকে ঘায়েল করলে পর পর।

তার সঙ্গী বুঝি একটু দূরে আরেকটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল, তাকে লক্ষ্য করে আজাদ বললে, 'তোমাকে আমার সাহায্যে আসতে হবে না, তুমি পালাও। আমি আমার শেষ গুলি দিয়ে নিজেকে শেষ করব।'

নিজের মাথায় গুলি চালিয়ে আজাদ আত্মহত্যা করলে।

তেমনি যুদ্ধ চলল রাইটার্স বিল্ডিংএর বারান্দায়। একেবারে ইংরেজ রাজত্বের অহঙ্কারের দুর্গে। যোদ্ধা তিন সমদুঃখসুখ বন্ধু, বিনয় বসু, সুধীর বা বাদল গুপ্ত আর দীনেশ গুপ্ত। তিনজনের পরনেই সাহেবি পোশাক, গলায় মাফলার জড়ানো। ধার্য কার্য সম্পন্ন করবার দ্রুততায় দীপ্যমান। পশ্চিমের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে এসেছে তিনজন। পুব দিকে খানিকটা এগোতেই বাঁয়ে পাওয়া গেল ইনস্পেক্টর জেনারেল অব প্রিজনস-এর ঘর। ডাইনে সুন্দর ড্যালহৌসি স্কোয়ার—শীতের রোদে ঠাণ্ডা জল টলটল করছে। জনে-যানে নিনাদিত।

'সাহেব ভিতরে আছেন?' আর্দালিকে জিজ্ঞেস করল দীনেশ।

'আছেন। কী দরকার স্লিপে লিখে দিন আমি নিয়ে যাচ্ছি সাহেবের কাছে।' আর্দালি দরজায় ঝোলানো স্লিপ দেখাল।

তোমাকে নিয়ে যাবার কষ্ট করতে হবে না—তিন বন্ধু আর্দালির পাশ কাটিয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে আর কর্নেল সিম্পসনকে মুহূর্তমাত্র সতর্ক হবার সুযোগ না দিয়েই রিভলভার থেকে গুলি ছুঁড়ল। ব্যাপারটা কী বোঝবার আগেই সিম্পসন ঢলে পড়ল।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই তিন যোদ্ধা চলল পুবের দিকে। কোন ঘরে—কে সাহেব আছে কালসর্প, এস অস্ত্রের যথার্থ প্রয়োগ করি।

'সাহেব ভিতরে আছেন?' ফিন্যান্স মেম্বরের কামরার সামনে দাঁড়াল যোদ্ধারা।

শব্দ শুনে আগেই আন্দাজ করেছে আর্দালি। বললে, 'না, কোথায় বেরিয়েছেন। ঘর খালি।'

বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে এলোপাতাড়ি কটা গুলি ছুঁড়ল যোদ্ধারা। এখন আর ঘরে ঢোকা নয়, বাইরে দিয়েই পালাবার পথ খুঁজে নিতে হবে।

ততক্ষণে সারা রাইটার্স বিল্ডিংএ ত্রাহি-ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে। দুপুর একটায় এ কী উপদ্রব! পড়ে গেছে ছুটোছুটি ডাকাডাকি গেলাম-মলাম! এগ্রিকালচারের সেক্রেটারি বিপ্লবীদের লক্ষ্য করে চেয়ার ছুঁড়ে মেরেছে—চেয়ার আর কদ্দুর যাবে—ওদের স্পর্শও করল না। পুলিশের আই-জি বেরিয়ে এসে পিছন থেকে গুলি ছুঁড়ল, গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। আর ছুঁড়বে কী, তার হাত-পা কাঁপছে, পাশে দাঁড়ানো রক্ষী পুলিশকে বললে, তুমি ছোঁড়ো। আই-জির রিভলভার নিয়ে সার্জেণ্ট ছুঁড়ল, গুলি বিপ্লবীদের স্পর্শও করল না।

কে আর সাহেব আছ পাপকর্মা শঠশিরোমণি ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি, বেরিয়ে এস।

জুডিসিয়ল সেক্রেটারি নেলসন বুঝি দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরেছিল, বিপ্লবীদের গুলি তার জানু বিদ্ধ করল।

আর কে আছ মুখ দেখাও।

পুব দিকের সিঁড়ির মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, যোদ্ধারা 'শেষ ঘরে ঢুকল।

কাছেই লালবাজার, ঊর্ধ্বতন কর্মচারীরা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে পড়েছে। যোদ্ধারা ঐ ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে সদলে ঢুকে পড়ে এমন কারো দক্ষতা ও সাহস নেই। বাইরে থেকেই ঘরের মধ্যে গুলি ছোঁড়ো। ঘরও পালটা জবাব দিচ্ছে। এই ভাবে ওদেরকে নিঃশব্দ করতে পারলেই ঢোকা সহজ হবে।

ঘর নিঃশব্দ হলে ঊর্ধ্বতন কর্মচারী কনস্টেবলকে বললে, 'ভিতরে উঁকি মেরে দেখ তো কী অবস্থা।'

ভয়ে-ভয়ে উঁকি মারল কনস্টেবল।

'কী দেখছ?'

'দুজন মাটিতে শুয়ে আছে, আরেকজন টেবিলে মাথা রেখে চেয়ারে বসে আছে।'

'তা হলে, কী বলো, এখন বোধহয় ঢোকা যায়?'

পুলিশের দল পা টিপে-টিপে অনেক সাহস করে ঢুকল। দেখল মাটিতে শয়ান দুটি যুবক এখনো নিশ্বাস ফেলছে। দুজনেই গুলিবিদ্ধ কিন্তু সে-গুলি আত্মহননের গুলি। বাঁচানো যাবে কিনা, বাঁচিয়ে ফাঁসিকাঠে তোলা যাবে কিনা সন্দেহ। আর তৃতীয়জন, যে চেয়ারে বসা? সে মৃত। সে গুলির সাহায্য নেয়নি, সে সায়ানাইড খেয়েছে।

পুলিশ বিনয়কে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কী?'

'বিনয় বোস। আমিই লোম্যানকে মেরেছি।'

'ওর নাম কী?' দীনেশের দিকে পুলিশ ইঙ্গিত করল।

'বীরেন ঘোষ।'

'আর যে ঐ চেয়ারে বসে আছে?'

'সুপতি রায়।'

বিনয় আর দীনেশকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। বিনয়কে

বাঁচানো গেল না, দুদিন পরে সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে। কিন্তু দীনেশ বাঁচল। পুলিশের ভাবখানা এই, তারাই বাঁচালে, এবার এক মহা-অপরাধীকে দিতে পারবে চরমতম শাস্তি। কিন্তু আসলে ঈশ্বরই বাঁচালেন—বাঁচালেন যাতে দীনেশ দেখাতে পারে আরো বীরত্ব, রেখে যেতে পারে মৃত্যু-তুচ্ছ-করা প্রাণের অদ্বৈত আনন্দ। ঈশ্বরের যদি সমাপ্তি না থাকে তবে আমার এই খণ্ডকালের কর্মটুকুও সমাপ্ত নয়। আমিও অদ্বৈতরসসমুদ্রের একটি অখণ্ড তরঙ্গ।

স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল যথারীতি ফাঁসির হুকুম দিল, হাইকোর্ট যথারীতি সে রায় বহাল রাখলে। কিন্তু ডকে বা সেলে দেখ এসে দীনেশকে। স্তব্ধ যোগারূঢ় ঈশ্বরবেষ্টিত। ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—যেন এই মন্ত্রেরই এক শরীরী উচ্চারণ।

বাড়িতে চিঠি লিখেছে দীনেশ—মাকে, দাদাকে, বউদিদিকে। মৃত্যু সে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা—নিদারুণ নতুন। মা গো, অমি এক নতুন দেশভ্রমণে যাচ্ছি, কী ভীষণ আনন্দের কথা! তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো। তোমার আশীর্বাদেই ভগবানের আশীর্বাদ। আর ভগবানের আশীর্বাদ কি শুধু সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চেহারা নিয়েই দেখা দেয়? কখনো কখনো দেখা দেয় সংহারের বিভীষিকা নিয়ে। কে জানে সেই বিভীষিকাই ঈশ্বরের সৌন্দর্যমূর্তি!

আবার লিখছে দীনেশ: মরতে আমার বিন্দুমাত্র ভয় নেই। আমি জানি এ জীবন মধুর কিন্তু মৃত্যু মধুরতর। মৃত্যুই আমার বন্ধু আমার সুহৃৎ আমার মুক্তিদাতা। মৃত্যুই শাশ্বত জীবন। আমি কে? আমিই তো সেই অবিনাশী অপ্রমেয় আত্মা, আমার আবার মৃত্যু কী! আমার জন্যে কেউ চোখের জল ফেলো না। কোনো লবণাক্ত আবিল জলে আমার আত্মার তর্পণ হবে না। আমাকে আনন্দ দাও, ভালোবাসা দাও, আমাকে শুধু তোমরা মনে রেখো।

জেল-ডাক্তার দীনেশের ওজন নিতে এসেছে। এ কী অসম্ভব

কথা। ফাঁসির হুকুম হবার পর ওজন কখনো বারো পাউণ্ড বাড়তে পারে? নিশ্চয়ই আপনাদের যন্ত্রের কোনো ভুল আছে।

জেল-ডাক্তার হাসল। বললে, 'যন্ত্রের ভুল থাকলে তো আমার চাকরি যাবে।'

'তা হলে আমার বারো পাউণ্ড ওজন বেড়েছে বলে আপনার চাকরি যাবে।' দীনেশও স্বচ্ছ মনে হাসল: 'গভর্নমেণ্ট বলবে ফাঁসির কয়েদিকে বেশি-বেশি খাওয়াচ্ছেন।'

'বেশি-বেশি খাওয়াতে পারি তার এমন সঙ্গতি কই, সৌভাগ্যই বা হবে কবে?' দীনেশের প্রতি জেল-ডাক্তারও আকৃষ্ট: 'বেশি বেশি খেতে দিলেই তো হলনা, হজম করে আত্মসাৎ করার শক্তি কয়জনের?'

ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিল দীনেশ, ওয়ার্ডার তাকে জাগিয়ে দিল।

ও, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমাকে এখুনি আরেক জায়গায় যেতে হবে। ধড়মড় করে উঠে পড়ল দীনেশ। যথারীতি প্রাতঃকৃত্য করল, স্নান করল, চুল আঁচড়াল, চশমার কাঁচ মুছল, হাসিমুখে গার্ডকে জিজ্ঞেস করল, ট্রেন কটার সময় ছাড়বে?

গার্ড চোখ নামাল।

ও, হ্যাঁ, আমি প্ল্যাটফর্মে পৌঁছুলেই তবে ছাড়বে। আমাকে না নিয়ে ট্রেন যাবেনা।

দৃঢ় পদক্ষেপে মঞ্চের উপর গিয়ে দাঁড়াল দীনেশ, চোখমুখঢাকা ক্লোক চাপানো হল, এবার গলায় জড়ানো হবে ফাঁস—দীনেশ হাত তুলে হ্যাংম্যানকে বারণ করল।

কী ব্যাপার? কর্তৃপক্ষ ছুটে এল। মুখোস খুলে ফেলল। কয়েদি কী বলতে চাইছে?

মুখ-চোখের বাঁধন আলগা হবার পর দীনেশ বললে, 'চশমার ব্রিজটা সরে গিয়েছে, ঠিক করে নি।'

মুখোসটা আঁট করে বাঁধবার সময় চশমার নাকিটা ঠিক জায়গায় থাকেনি, বেঁকে বসেছে, কিন্তু পরমুহূর্তে যে মরে যাবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তার ঐটুকু অসুবিধে সম্পর্কেও তীব্রতম চেতনা! ছেলেটার বুঝি ইস্পাতের স্নায়ু, বজ্রভীষণ মনোবল—সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল—জেল-সুপার, জেলা-হাকিম, সিভিলসার্জন। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও এর কী সহজ শান্তি কী সতেজ উপেক্ষা! তার মানে কী? তার মানে মৃত্যু নেই। শুধু একটা দেশভ্রমণ। একটা নতুন দেশ বেড়াতে যাব, চশমাটা ঠিক করে না বসিয়ে নিলে যে সব ভালো দেখতে পাব না।

চট্টগ্রামের ছ টি পলাতক ছেলে ঠিক করল পাহাড়তলির ফিরিঙ্গি-পাড়া আক্রমণ করবে। রজত সেন, স্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, ফণীন্দ্র নন্দী, সুবোধ চৌধুরি আর দেবপ্রসাদ গুপ্ত। ফিরিঙ্গিরাই যত অত্যাচারের কলকাঠি, রোদের চেয়ে বালির তাতেই বেশি ফোস্কা, আগে ওদের শেষ করো।

রজত বাড়িতে এসেছে মাকে একটু দেখে যেতে। যদি সম্ভব হয় দুটি ভাত খেয়ে নিতে।

'মা গো!'

'কে, রজত?' বিনোদিনী দেবী আকুল হয়ে উঠলেন কিন্তু স্বর অত্যন্ত ক্ষীণ।

'আমরা ছ জন। ভাত রান্না করে দিতে পারবে?'

বরদাত্রী জননী কোমরে আঁচল জড়ালেন। বললেন, 'এখুনি দিচ্ছি, একটু বোস।'

ঘরের মধ্যে মার স্নেহচ্ছায়ায় ছটি বন্ধু নিরাপদ উত্তাপ অনুভব করল। থালায় করে গরস পাকিয়ে ভাত খায়নি কত দিন।

দুরন্ত জ্বাল দিয়ে তাড়াতাড়ি ভাত নামালেন বিনোদিনী। থালায় করে বেড়ে দিলেন ছেলেদের। আর ছেলেরা যেই বসতে যাচ্ছে রব উঠে গেল পুলিশ আসছে।

আসছে, এখনো এসে পড়েনি, ঘিরতে পারেনি বাড়িটাকে। ছেলেরা ভাতের থালা ফেলে খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। রজত বললে, 'মা গো, দুঃখ কোরো না, আর কোনো ঘরে মা পেয়ে যাব, আমাদের ঠিক সে খেতে দেবে।'

সবাই নদীর পারে ছুটে এল। উত্তাল কর্ণফুলি। একটা শাম্পান নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, হ্যাঁ, পাড়ি দাও, ওপারে যাব।

এদিকে পুলিশও পিছু নিয়েছে তিন দলে বিভক্ত হয়ে। নদীর মধ্যে ধরা গেল না। বিপ্লবীরা নদী পার হয়ে ঢুকে পড়েছে কালারপোলে।

এস, কতদূর আসবে। অমনি-অমনি ধরা দেব না। মরব এবং যুদ্ধ করে মরব।

ডাকাত! ডাকাত! পিছু-নেওয়া পুলিশের লোক প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে যদি গ্রামবাসীরা এগিয়ে এসে সাহায্য করে।

কালারপোলের ইউনিয়ন বোর্ডের মুসলমান প্রেসিডেন্ট তার দলবল নিয়ে বেরিয়ে এল ডাকাত ধরতে।

কেন মিছিমিছি ধাওয়া করছেন আমাদের? আমাদের ধরিয়ে দিয়ে আপনাদের লাভ কী? আমরা কি আপনাদের শত্রু?

জনতা শুনল না, সমানে চলল তাড়া করে। বিপ্লবীরা তাই গুলি ছুঁড়লে। দুজন গ্রামবাসী মারা পড়ল, মারা পড়ল কনস্টেবল প্রসন্ন বড়ুয়া।

ফণী নন্দী আর সুবোধ চৌধুরি জনতার হাতে ধরা পড়ল। বাকি চারজন 'জুলদা' গ্রামের দিকে এগিয়ে গেল, ঢুকল এক মুসলমান গৃহস্থের ঘরে। ডাকল: 'মা, মা আছ?'

মুসলমান-ঘরণী বেরিয়ে এল। কে রে মা বলে ডাকে?

'হাঁড়িতে পান্তা ভাত আছে মা? আমাদের তাই চাট্টি খেতে দেবে?'

'বোসো বাবারা, গরম ভাত রেঁধে দিচ্ছি—'

কিন্তু ভাগ্যে আর ভাত খাওয়া নেই, পুলিশবাহিনীর সঙ্গে সৈন্যবাহিনী এসে জুটেছে। বিপ্লবীরা ভাতের মায়া ত্যাগ করে ছুটতে ছুটতে একটা বাঁশবনের মধ্যে ঢুকল। আয় এখান থেকেই যুদ্ধ করি।

পুলিশ-সৈন্য ঘিরে ফেলেছে বাঁশ-বন। হাঁক দিল: 'সারেণ্ডার!'

বিপ্লবীদের প্রত্যুত্তর বন্দুকের শব্দে ধ্বনিত হল: 'কখনো না।'

বেশ খানিকক্ষণ ধরে চলল এই যুদ্ধ। এরই নাম কালারপোলের যুদ্ধ। যখন আর আওয়াজ নেই, সৈন্যবাহিনী নিশ্চিন্ত হয়ে ঢুকল জঙ্গলে। দেখল অনিন্দ্যসুন্দর চারটি কিশোর মাটিতে বুক দিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। বুঝল আহত হয়ে পড়ে যাবার পরেও তারা মাটিতে পড়ে গুলি ছুঁড়েছে। দেখল রজত, মনোরঞ্জন, দেবপ্রসাদ—কারুরই প্রাণ নেই, শুধু স্বদেশই তার নিশ্বাস এখনো নিঃশেষ করেনি। মহানন্দে স্বদেশকে তারা গ্রেপ্তার করল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাকে তাদের হেপাজতে রাখতে পারল না। কয়েক ঘণ্টা পরেই তাদের পূর্বগামী বন্ধুরা তাকে ডেকে নিলে।

ফণী নন্দী আর সুবোধ চৌধুরির ফাঁসি হল।

চট্টগ্রামে পুলিশ অকথ্য অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে, জনসাধারণের উপর তো বটেই বিশেষ করে ছাত্রদের উপরে। সমস্ত অত্যাচারের মূল কর্তা ক্রেগ—পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল। এসেছে চট্টগ্রামে, পয়লা ডিসেম্বর ঢাকায় রওনা হবে। মূল নেতা সূর্য সেন খবর পাঠিয়েছেন চাঁদপুরে ক্রেগকে হত্যা করতে হবে। বরাত পড়েছে ছাত্র রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আর কালীপদ চক্রবর্তীর উপর। রামকৃষ্ণ বৃত্তি-পাওয়া মেধাবী ছেলে। সে ঠিক কার্যোদ্ধার করতে পারবে।

চিটাগং মেল লাকশাম হয়ে চাঁদপুরে পৌঁছুবে। লাকশামে রেলোয়ে পুলিশের ইনস্পেক্টর তারিণী মুখার্জি সে-ট্রেনে উঠল। ক্রেগ যে ফার্স্ট ক্লাশ কামরায় উঠেছিল তার সংলগ্ন 'কুপে'তে তারিণীর জায়গা হল। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় পুরুষ এই তারিণী। সে চলেছে

চাঁদপুরে নেমে ক্রেগের স্টিমারে ওঠার ব্যবস্থার তদারকি করতে। তার মানে তার চাকরিতে একটু পালিশ লাগাতে।

রাত চারটার সময় চাঁদপুরে ট্রেন এসে দাঁড়াল।

দাঁড়াতেই নেমে পড়ল তারিণী। গার্ডের গাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রেলোয়ে পুলিশের সাব-ইনস্পেক্টরের সঙ্গে কথা বলতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে এঞ্জিনের দিকের একটা থার্ড ক্লাশ থেকে নামল রামকৃষ্ণ আর কালীপদ। শীত, তাই দুজনেরই গায়ে-মাথায় র‍্যাপার জড়ানো। একজনের সবুজ আরেকজনের লাল। তারিণীকেই ক্রেগ বলে ভুল করল। প্রথমত দেখল ফার্স্ট ক্লাশ থেকে নামল, দ্বিতীয়ত সাব-ইনস্পেক্টর স্যালিউট করল, তৃতীয়ত, দেখতে ঠিক সাহেবের মত, তাই আর দ্বিধা না করে পিছন থেকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে বসল। প্ল্যাটফর্মের উপর পড়ে গেল তারিণী। আর উঠল না।

ধর—ধর—কে কাকে ধরে। জানলা তুলে ক্রেগ গুলি ছুঁড়ল বটে, বিপ্লবীদের নাগাল পেল না। সাব-ইনস্পেক্টর তো স্টেশন-মাস্টারের ঘরে গিয়ে লুকোল। কে পলাতকদের পিছু নেয়? তারা লাইনে-দাঁড়ানো মালগাড়িগুলির আড়াল দিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে।

ধীরস্থির সংযত পায়ে গাঁয়ের পথ ধরে চলেছে দুই কিশোর —কালীপদ আর রামকৃষ্ণ। সহসা দেখতে পেল পিছন দিক থেকে মোটর ছুটে আসছে, হেড-লাইট ফেলে। চাঁদপুরের এ-এস-পির মোটর, সঙ্গে প্রচুর অস্ত্রসম্ভার। পালাবার আর পথ নেই, সামনে শুধু মাঠ, তবু রাস্তা ছেড়ে পাশে একটা ঝোপের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল দুজন, গাড়িটা যদি বেরিয়ে যায়।

সবুজ আর লাল আলোয়ান—সহজেই ধরা পড়ল। গাড়ি বেরিয়ে গেল না, তাদের উপরই পড়ল প্রায় হুমড়ি খেয়ে।

বিচারে রামকৃষ্ণের ফাঁসির হুকুম হল, কালীপদর বয়েস কম বলে তাকে আন্দামানে পাঠালে।

কনডেমড সেলের পাশাপাশি দুই অন্ধকূপে মৃত্যুপ্রতীক্ষায় দুই বিপ্লবী—দীনেশ গুপ্ত আর রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। আগে কেউ কাউকে চিনত না, এখন পাশাপাশি বাস করে মনে হল আদর্শে মহত্ত্বে প্রাণের প্রাচুর্যে এরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু, অনন্তকাল চলেছে পাশাপাশি। আর অনন্ত পথের অদ্বিতীয় যে বন্ধু, মৃত্যু বুঝি তাঁরই আহ্বান।

ক্রেগের গায়ে আঁচড় লাগল না বটে কিন্তু ডুর্নো আহত হল। ঢাকার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নো, মদের দোকানে ঢুকেছে বোতল কিনতে, দুটি যুবক তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ে বসল। দিনে-দুপুরে প্রকাশ্য রাজপথের উপর এমন কাণ্ড কেউ ভাবতেও পারত না। কিন্তু বিপ্লবীরা পারে, তাদের স্বপ্ন আরো অভাবনীয়। ডুর্নো আহত হল মাত্র—তাতেই প্রাণ নিয়ে দেশে পালাল। ঘটনার নায়ক সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিককে কেউ ধরতে পারল না।

কিন্তু কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার এলিসনকে ছাড়া হল না। রাস্তা দিয়ে সাইকেল করে যাচ্ছিল, কী একটা ফাটল চাকার কাছে। পিছন ফিরে তাকাতে গেল এলিসন। সঙ্গে সঙ্গে গুলি। সাইকেল থেকে নেমে এলিসন আততায়ীকে গুলি করতে গেল, গুলি বেরুল না, নিজেই পড়ে গেল মাটিতে। শত চেষ্টা করেও এলিসনকে বাঁচানো গেল না। আর এই মৃত্যুদণ্ডের বিধাতা তরুণ শৈলেশ রায় নিরাপদে পালিয়ে গেল।

কেউ পালিয়ে যেতে পারে, কেউ পারে না। কিন্তু সাফল্য আর বৈফল্য যাই হোক, বিপ্লবীরা স্বাধীনতাকে ঠিক এগিয়ে আনছে।

গান্ধি-আরউইন চুক্তিও সেই পথেই।

সুভাষ সরাসরি মহাত্মাকে বললে, যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি স্বাধীনতার দাবিতে অচল থাকবেন ততক্ষণ আপনার সমস্ত চুক্তি সমর্থন করব কিন্তু যেই মুহূর্তে আপনি স্বাধীনতার চেয়ে অল্পতর দাবিতে নেমে আসবেন সেই মুহূর্তেই আপনার বিরোধিতা করব।

মহাত্মা বললেন, তথাস্তু।

অল্প কদিন পরেই করাচিতে কংগ্রেস হচ্ছে। মহাত্মা বললেন, কংগ্রেসকে বলা হবে সে যদি গোলটেবিল বৈঠকে যায়, তার চুক্তির হাত বেঁধে দিতে হবে অর্থাৎ এমন কিছুতে সে সই করবে না যা লাহোর কংগ্রেসের স্বাধীনতা-প্রস্তাবের অসদৃশ। আর তিনি নিজে প্রাণপণ চেষ্টা করবেন যাতে সহিংস বন্দীরাও ছাড়া পায়।

বাংলার বিপ্লবী মুক্তিব্রতীরা বুঝি আশার আলো দেখল।

কিন্তু ইংরেজকে গান্ধি চিনেও চিনলেন না। সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল অথচ ভগৎ সিং ও তার সঙ্গীদের ফাঁসিটা মকুব করল না আরউইন। আরউইন পাদ্রী হতে পারে কিন্তু সে জানে আগে সাম্রাজ্য পরে পাদ্রীগিরি। সাম্রাজ্যই যদি যায় তবে পাদ্রী-গিরি চালাবে কোথায়?

আঠারোই মার্চ ভগৎ সিংএর বাবা জেল-দপ্তর থেকে চিঠি পেল, তোমার সঙ্গে তোমার ছেলের শেষ সাক্ষাৎকারের তারিখ ২৩শে মার্চ ও সময় বেলা এগারোটা। ঐ দিন ঐ সময় লাহোর সেণ্ট্রাল জেলে তোমার রক্তসম্পর্কিত সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে এস।

অনুরূপ চিঠি গেল রাজগুরু আর শুকদেবের বাড়িতে।

তেইশে মার্চ সন্ধেয় পর-পর তিনজনের ফাঁসি হয়ে গেল।

সুভাষ তখন করাচির পথে, শুনতে পেল, গতকাল, তেইশে, ভগৎসিংদের ফাঁসি হয়ে গেছে। আরও খবর রটল তাদের মৃতদেহের প্রতি সম্মান দেখানো দূরের কথা, ব্রিটিশ সরকার একটু করুণা দেখাতেও রাজি হয় নি।

সমস্ত দেশ শোকে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল। ভগৎসিংদের পথ ঠিক পথ না ভুল পথ এ প্রশ্ন আর থাকল না, এ কি রেভলিউশান না টেররিজম, বিপ্লববাদ না সন্ত্রাসবাদ, গোঁড়া মহলের এ তর্কও সিকেয় তোলা থাকল—ভগৎসিংদের মত ছেলে যে-কোনো দেশের পক্ষেই গৌরব সকলে তা নতমস্তকে মেনে নিল, আর ভগৎসিংদেরই

তো একজন যতীন দাস। আর যতীন দাসেরই তো কত শত সহচর বাংলা দেশে।

বিপ্লববাদ চিরজীবী হোক।

মহাত্মা যখন করাচিতে নামলেন তখন তাঁকে কালো পতাকা দেখানো হল, যুবকেরা তাঁকে কালো ফুলের মালা উপহার দিলে। তাদের আপশোস, মহাত্মাই ভগৎসিংদের ফাঁসিকাঠে লটকে দিলেন। চুক্তিতে কেন তাদের মুক্তির সর্ত অন্তর্ভুক্ত করলেন না। আর আরউইন যদি এত আবেদন-নিবেদন উপেক্ষা করতে পারল, মহাত্মাই বা কেন ভেঙে দিলেন না চুক্তি?

মহাত্মা হাসিমুখে কালো ফুলের মালা নিলেন মাথা পেতে।

গভর্নমেণ্ট আনন্দিত হল, আশা করল যদি এই নিয়ে কংগ্রেসে একটা ভাঙন হয়।

কিন্তু সুভাষ ভাঙন ধরাতে দিল না। যদিও সে চুক্তির বিরোধী, যদিও সে বিশ্বাস করে গান্ধিজি ভুল করছেন, তবু পাছে কংগ্রেস হীনবল হয় ও ইংরেজ সরকার সেই হীনবলতার সুবিধে নেয়, সুভাষ গান্ধির নেতৃত্ব মেনে নিল, তাকে খণ্ডিত হতে দিল না। কথা হল কংগ্রেসে দাঁড়িয়ে সে গান্ধির বিরোধিতা করবে না কিন্তু অন্যত্র তার স্বাধীন মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে।

ভুল করছেন জেনেও জাতির নেতার প্রতি এই বাধ্যতা ছিল বলেই তো ভবিষ্যতে সুভাষ নেতাজি হতে পেরেছে।

সময়ের মেজাজ কী রকম বদলে গিয়েছে তা লক্ষ্য করবার মত। ভগৎসিং ও সহচরদের সাহস ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করে কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করল। অথচ এই কংগ্রেসই গোপীনাথের বেলায় কী চিত্তদারিদ্র্য প্রকাশ করেছিল। কংগ্রেস তখনো অহিংস, এখনো অহিংস। তবে এ তারতম্য কেন? কে জানে কংগ্রেস হয়তো মনে মনে বুঝতে পারছে চুক্তিতে কিছু হবে না, যুক্তিতে কিছু হবে না— যদি হয়তো হবে একমাত্র গণ-অভ্যুত্থানে।

এইখানেই গান্ধিবাদের উত্তরে সুভাববাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল।

করাচিতে নিখিল ভারত যুবকংগ্রেসের সভাপতি হয়ে উদ্দীপ্ত বক্তৃতা দিল সুভাষ। দিল্লিচুক্তি শুধু অপদার্থ নয়, দিল্লিচুক্তি সর্বনাশা। শুধু তৃষ্ণার্তকে মরীচিকা দেখিয়েই তা ক্ষান্ত হচ্ছে না, একেবারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে অকর্মণ্যতার রসাতলে। চুক্তি বা আপোস অত্যাচারিতের সমস্ত সংগ্রামস্পৃহাকে খর্ব করে আর শত্রুকে সময় দেয় তার ছিদ্রগুলিকে ভরাট করে নেবার জন্যে।

তাই প্রমাণিত হল।

গোলটেবিল বৈঠক থেকে গান্ধি শূন্য হাতে ফিরে এলেন।

সতেরো

দিল্লিচুক্তিতে কথা ছিল পুলিশি অত্যাচার ক্ষান্ত হবে।

হিমালয় বিচলিত হবে কিন্তু ইংরেজের পুলিশ বিচলিত হবে না। উনত্রিশে অগাস্ট কংগ্রেসের একক প্রতিনিধি হয়ে মহাত্মা চললেন বিলেতে গোলটেবিলের গোলমালে, তার ক'দিন পরেই হিজলি বন্দী-শিবিরে পুলিশ গুলি চালিয়ে সন্তোষ মিত্র আর তারকেশ্বর সেনকে খুন করলে।

কী একটা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে একজন বন্দী ও সান্ত্রির সঙ্গে খিটি-মিটি বেধেছিল, তাই নিয়ে হাতাহাতি। অভিযোগ উঠল একজন বন্দী নাকি সান্ত্রির হাত থেকে বেয়নেট কেড়ে নিতে চেয়েছিল। ব্যস, আর কথা নেই। রাত নটায়, বন্দীরা কেউ যখন ঘরে, কেউ যখন বা খেতে বসেছে, পুলিশ দুর্মদ উল্লাসে গুলি চালাল। সে তাদের কী জয়হুঙ্কার—'রামজি কি জয়। হুকুম মিল গিয়া, হুকুম মিল গিয়া।'

সেপাই-সান্ত্রিরা দলে-দলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল উপরে। শালা লোককো মারো। মার ডালো শালা লোককো।

চলল বেটন চলল বেয়নেট চলল বুলেট।

সন্তোষের তলপেটে গুলি বিঁধল আর তারকেশ্বরের কপালে। তাছাড়া কুড়িজন আহত হল, তাদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

খবর পৌঁছুল কলকাতায়। খবর পৌঁছুল সুভাষের কক্ষে।

সতীন সেন উত্তেজিত হয়ে বললে, 'পাশবিকতার কি সীমা নেই?'

সুভাষ গম্ভীর হয়ে উত্তর দিল, 'শুধু পাশবিকতা হলে সীমা থাকত। এ তার চেয়েও বেশি।'

কিন্তু খবর শুনে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। সন্তোষ আর তারকেশ্বরকে নিয়ে আসতে হবে কলকাতায়। না, ওদের মৃতদেহদুটোকে নয়, জলজ্যান্ত ওদেরকেই নিয়ে আসতে হবে। ওদের এই আত্মাহুতিই তো বাস্তব সত্যাগ্রহ। বহুশতলক্ষ সত্যাগ্রহীর দীক্ষা হবে ওদের রক্তে।

সুভাষই নিজে গিয়ে নিয়ে এল ওদের, ওদের শবাধারে কাঁধ দিয়ে নিজেই নিয়ে গেল শ্মশানে। তারপর সভা ডাকল মনুমেণ্টের নিচে।

প্রাদেশিক কংগ্রেসের কর্তৃত্ব নিয়ে তখন সুভাষে সেনগুপ্তে অনেক বিরোধ, অনেক মন-কষাকষি। কিন্তু আজকের ব্যাপারে আবার বিরোধ কী! সুভাষ সেনগুপ্তকে ফোন করল: 'আজকের সভায় আসুন।'

'হ্যাঁ, যাব। আমাদের সভা আলাদা হবে।'

'মানে, মনুমেণ্টেরই নিচে?'

'হ্যাঁ, একই জায়গায়।'

'তার মানে কংগ্রেসের তরফ থেকে দুটো সভা হবে?'

'হ্যাঁ, তাই।'

'না, না, একটা সভা হবে।' সুভাষ প্রশান্ত স্বরে বললে, 'আর সেটা আপনারই সভা। আপনার সভাতেই আমরা উপস্থিত হব। আপনিই সেই সভার সভাপতি।'

দেশের ডাকে, অত্যাচারের প্রতিরোধের ডাকে, সমস্ত দ্বন্দ্ব-কলহের ঊর্ধ্বে উঠে গেল সুভাষ। উদারপুরুষ বীরভদ্র সুভাষ। মঞ্চে যতীন্দ্রমোহনের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট জনতাকে সম্বোধন করে বললে, 'দলের স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়। দুঃখের মধ্যে দিয়ে সেই দেশ আমাদের ডাকছে এই দুঃখ নিবারণ করো।'

টাউনহলেও সভা হল। ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়েও এলেন রবীন্দ্রনাথ।

বললেন, 'ডাক যখন পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে, রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতী নিষ্ঠুরতার দ্বারা চিরদিনের মত নীরব করে দিয়েছে।' ইংরেজ-সরকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক করতে চাই যে বিদেশীরাজ যত পরাক্রমশালী হোক না কেন, আত্মসম্মান হারানো তার পক্ষে সকলের চেয়ে দুর্বলতা কারণ এই আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা ন্যায়পরতায়, ক্ষোভের কারণ সত্ত্বেও অবিচলিত সত্যনিষ্ঠায়।'

বক্সা জেলের রাজবন্দীদের উদ্দেশ করেও রবীন্দ্রনাথ লিখলেন :

'নিশীথেরে লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন,
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সঙ্গীত না মানিল বন্ধন।
'অমৃতের পুত্র মোরা'—কাহারা শুনাল বিশ্বময়
আত্মবিসর্জন করি আত্মারে কে জানিল অক্ষয়।
ভৈরবের আনন্দেরে
দুঃখেতে জিনিল কে রে,
বন্দীর শৃঙ্খলচ্ছন্দে মুক্তের কে দিল পরিচয়॥'

হিজলির ঘটনা নিয়ে তদন্ত বসল। সেই তদন্ত উপলক্ষে সুভাষ আর সেনগুপ্ত দুজনেই চলে গেল হিজলি, একসঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে লাগল।

তদন্ত কমিশন রায় দিল গুলি চালানো অন্যায় হয়েছে।

কমিশনের রায়ে কী এসে যায়? অন্যায় হলে অন্যায় থেকে নিবৃত্ত হবে ইংরেজ? কখনো না। আবার যখন বাগে পাবে ফের গুলি ছোটাবে। লোকদেখানো তদন্তের অভিনয় করে জগৎকে বোঝাবে, ইংরেজ কী ন্যায়নিষ্ঠ! আর যে ইংরেজকে জানে সে ঠিক বুঝবে ইংরেজ কী ধাপ্পাবাজ!

চট্টগ্রামে পুলিশ ইনস্পেক্টর আশানুল্লাও নির্যাতনের সাইক্লোন চালিয়েছে। হয়েছে খান-বাহাদুর। সূর্য সেন ঠিক করল

আশানুল্লার আসান করে দিতে হবে। হরিপদ ভট্টাচার্যকে ভার দিল। কি রে, পারবি তো?

পারব। পনেরো-ষোল বছরের ছেলে হরিপদ বুক ফুলিয়ে বললে, পারব।

যদি ধরা পড়িস, তারপরের সেই ভয়াবহ অত্যাচারের কথা মনে করিস। নখে ছুঁচ ফোটাবে, ব্যাটারি চার্জ করবে, বরফের উপর শুইয়ে রেখে বরফ দিয়ে চাপা দেবে।

কিছু কেয়ার করিনা।

মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে—রেলোয়ে কাপ-এর চূড়ান্ত খেলা। আশানুল্লার টিম টাউন ক্লাব জিতেছে কোহিনুর ক্লাবকে হারিয়ে। আশানুল্লার ভীষণ আনন্দ। পারলে সে নিজেই হয়তো কাপটার জন্যে হাত বাড়ায়। অন্তত ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে একটা হ্যাণ্ডসেক আদায় করে।

সহসা পিছন থেকে আশানুল্লার পিঠে গুলি ছুঁড়ল হরিপদ।

আশানুল্লা পড়ে গেল। হরিপদ নড়ল না। ধরতে বেগ পেতে হল না পুলিশের।

তারপর শুরু হল মারের হরিরলুট। যেমন বস্তার পর বস্তা ফেলে গুদাম বোঝাই করে তেমনি লোক ধরে ধরে একটার উপর আরেকটাকে ফেলে লক-আপ বোঝাই করে ফেলল—আর প্রত্যেকটা লোকই মার-খাওয়া মাথা-ফাটানো। একা হরিপদকে ধরে একা হরিপদকে মেরে একা হরিপদর মাথা ফাটিয়ে ইংরেজের রক্তস্পৃহা নিবৃত্ত হবার নয়।

হরিপদর বেলায় ছুঁচ ব্যাটারির অতিরিক্ত আরেক ব্যবস্থা চালু করল ইংরেজ।

গ্রামে গ্রামে ঢ্যাটরা পিটিয়ে দিয়ে লোক জড়ো করো। বলো আশানুল্লাকে যে মেরেছে সেই দুর্দান্ত আসামীকে দেখবে এস। তাকে শিকলে বেঁধে আনা হয়েছে তোমাদের সামনে। তোমাদের

সামনেই তাকে শাস্তি দেওয়া হবে। চাবকানো হবে। দেখবে এস।

সকলে এসে দেখল কচি কৃশ কোমল একটি ছেলে।

সকলের সামনে হরিপদকে পুলিশ বেত মারে, সঙিনের খোঁচা মারে আর বলে, 'বল ইংরেজের জয় হোক, সূর্য সেনের ক্ষয় হোক।'

হরিপদ চেঁচিয়ে বলে, 'ইংরেজের ক্ষয় হোক, মাস্টারদার জয় হোক।'

বিচারে হাজির হল হরিপদ। এ যে একেবারে একটি বালক। হাকিম ফাঁসির হুকুম দিতে পারল না। যাও কালাপানি পেরোও।

ডুর্নোকে গুলি করার পর ঢাকায় পুলিশি তাণ্ডব প্রচণ্ড হয়ে উঠল। মনে হল কারু শরীর যেন শরীর নয়, সম্পত্তি সম্পত্তি নয়।

সুভাষ বললে, আমি ঢাকায় যাব।

যেমন বলা, রওনা হয়ে গেল। সঙ্গে জে সি. গুপ্ত, হেমেন দাসগুপ্ত, নরেন চক্রবর্তী। আর ছাত্রনেতা অবিনাশ। নারায়ণগঞ্জে নামতেই ঢাকার পুলিশ-সুপার এলিসন স্থানীয় এস-ডি-ওকে নিয়ে উপস্থিত। বললে, 'আপনাকে ঢুকতে দেওয়া হবেনা।'

'আমাকে কি আপনি গ্রেপ্তার করছেন?'

'না, তবে আপনার চলা-বলা আবদ্ধ।'

'আমাকে তবে কী করতে হবে?'

'আপনার জন্যে স্টিমার তৈরি, আপনাকে ফিরে যেতে হবে।'

'আপনিও চলুন আমাদের সঙ্গে।'

'চলুন।'

আর সকলে থাকল, সুভাষ আর নরেন ফিরে চলল স্টিমারে।

কমলাঘাটে স্টিমার এসে লাগতেই একটা এক ফালি সিঁড়ি ফেলে তাড়াতাড়ি নেমে গেল এলিসন। তাড়াতাড়ি সিঁড়িটা টেনে নিল, যাতে দেখাদেখি সুভাষ না নেমে পড়ে।

'ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেল।' যাত্রীদের মধ্যে থেকে কে বলে উঠল।

'কোথায় পালাবে? ওর সিঁড়িও তুলে নিয়েছে।' আরেকজন কে বললে।

এর কমাস পরেই কুমিল্লায় গুলি খেল এলিসন।

স্টিমার এসে দাঁড়াল চাঁদপুর। সুভাষ বললে, কলকাতায় ফিরব না, যেমন করে হোক, আবার ঢাকায়ই ফিরে যাব।

চাঁদপুর থেকে কুমিল্লা। কুমিল্লায় কামিনী দত্ত, বসন্ত মজুমদার, হেমপ্রভা। অভয় আশ্রম, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশ-প্রাঙ্গণ, হরদয়াল নাগ। সেখান থেকে ব্রাহ্মণবেড়িয়া। সেখান থেকে আসাম-বেঙ্গল রেলওয়েতে তেজগাঁ। তেজগাঁয় পুলিশ এসে সুভাষকে গ্রেপ্তার করলে।

অপরাধ?

ঢাকার সদর এস-ডি-ও সশরীরে উপস্থিত। আপনি আমার ১৪৪ ধারার নোটিশ অমান্য করে ঢাকায় ঢুকেছেন।

'তা, গ্রেপ্তার করেছেন, ভালো কথা। কিন্তু জামিন দেবেন তো?' সুভাষ তাকাল।

'দিতে পারি যদি কথা দেন আপনি ঢাকায় ঢুকবেন না।'

'কথা-টথা আমি দিতে পারব না।'

'তা হলে চলুন, আমাদের সঙ্গে।'

সুভাষকে জেল-হাজতে নিয়ে গেল। হাজতে কারা দেখা করতে এসেছিল, সুভাষ পুলিশকে বললে, সামনে থেকে লোহার জালটা সরিয়ে নিন।

তা কী করে নেওয়া যায়। পুলিশ অসম্মত হল।

সুভাষ দেখা করল না।

তিনদিন পরে জামিন মঞ্জুর হল। মোকদ্দমার দিন পড়ল তেইশে নভেম্বর। বিশেই তার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তুলে নিল সরকার।

ক দিন পরেই ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস খুন হল।

সম্ভ্রান্ত ঘরের দুটি মেয়ে, ফৈজুন্নেসা গভর্নমেণ্ট হাই স্কুলের ক্লাশ এইটের ছাত্রী, শান্তি ঘোষ আর সুনীতি চৌধুরি, একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে এল। আর্দালির হাত দিয়ে কার্ড পাঠাল ভিতরে, কার্ডে ইংরিজিতে নাম লেখা মীরা দেবী আর ইলা সেন। এস-ডি-ও নেপাল সেনের সঙ্গে কথা কইছিল স্টিভেনস, কথা কইতে-কইতে বাইরে এল। বাইরে আসতেই শান্তি স্টিভেনসকে একটা দরখাস্ত দিলে। নিরীহ দরখাস্ত—স্কুলের ছাত্রীদের জন্যে যদি একটা সুইমিং পুল তৈরি করে দেন।

স্টিভেনস বললে, 'হেডমিসট্রেসের থ্রু দিয়ে এস।' সেই মর্মে স্বহস্তে নোট লিখে দিলে দরখাস্তে।

নোট লিখে দরখাস্ত শান্তির হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছে, সুনীতি আঁচলের তলা থেকে রিভলভার বের করে স্টিভেনেসের বুকের উপর গুলি চালিয়ে দিল।

'পাকড়ো! পাকড়ো!' চেঁচিয়ে উঠল নেপাল সেন।

শান্তি-সুনীতি পালাবার চেষ্টা করল না, আর গুলিও ছুঁড়ল না, দিব্যি ধরা দিল। তাদের নির্ধারিত কাজ একগুলিতেই সমাধা হয়েছে।

হ্যাঁ, রক্তাক্ত দেহে মরে পড়ে আছে স্টিভেনস।

চোদ্দ-পনেরো বছরের দুটি মেয়ে। বিশুদ্ধসিদ্ধাসনা বীরাঙ্গনা। কে ওদের ফাঁসি দেবে? বিচারে শুধু যাবজ্জীবন কারাবাস হল।

এ আবার নতুন কী শাস্তি! যতক্ষণ স্বাধীনতা না আসে ততক্ষণ প্রাণধারণই তো যাবজ্জীবন কারাবাস।

কিন্তু প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ধরা দিল না। বি-এ পাশ, চাটগাঁয় নন্দনকানন স্কুলের শিক্ষিকা, পাহাড়তলি ইউরোপিয়ান ক্লাবে বোমা ছুঁড়ল। বোমার বিদারণের শব্দ শেষ হতেই শোনা গেল সাহেব-মেমদের চিৎকার। দশ-বারোজন ঘায়েল।

বিপ্লবীদের সবাই পালাল কিন্তু প্রীতিলতা পালাল না। তার হাতের রিভলভারটা একটি তরুণ বন্ধুর হাতে তুলে দিয়ে প্রীতিলতা বললে, 'এটা যেন ওরা না পায়।'

'আপনিও চলে আসুন।'

'না, আমাকে ওরা ডাকছে—' প্রীতিলতা আকাশের দিকে ইশারা করল।

সব শান্ত হলে পুলিশ যখন কাছে এল তখন দেখল পুরুষের বেশে কে একটি সুন্দরী মেয়ে শুয়ে আছে। কিন্তু, না, উৎসাহিত হবার কারণ নেই, সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেছে প্রীতিলতা।

অথচ কিছুদিন আগে ধলঘাটের যুদ্ধে তাকে বাঁচিয়েছিল সূর্য সেন। গ্রামের একটি বিধবা মহিলা, সাবিত্রী দেবী, বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন। দোতালা মাটির ঘর, নিচে থাকেন মহিলা, তাঁর একটি ছেলে আর মেয়ে আর উপরে বিপ্লবীরা, সূর্য সেন, নির্মল সেন, অপূর্ব সেন আর প্রীতিলতা।

রাত নটা। উপরের ঘরে বসে খাচ্ছে বিপ্লবীরা, সাবিত্রী দেবীর ছেলে হঠাৎ বলে উঠল : পুলিশ!

শুধু পুলিশ নয়, পল্টনে বাড়ি ঘিরেছে। পল্টনের অধিকর্তা স্বয়ং ক্যাপটেন ক্যামেরন।

আর কিছু হোক না হোক প্রীতিলতাকে বাঁচাতে হবে।

বাড়ির মধ্যে, ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। সূর্য সেন প্রীতিলতাকে নিয়ে রান্নাঘরের ছাদের উপর লাফিয়ে পড়ল, ছাদ থেকে পিছনের দিকে নেমে জলা-জংলার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

হাবিলদারকে এগিয়ে দিয়ে ক্যামেরন উঠছে সিঁড়ি দিয়ে। পিছনে আরো অনেকে। হাবিলদারকে সবলে ধাক্কা মেরে অপূর্ব ফেলে দিল নিচে। ক্যামেরন খোলসা হয়ে গেল আর সঙ্গে-সঙ্গেই নির্মল তাকে গুলি করলে।

তারপর সুরু হল ধলঘাটের যুদ্ধ। অপূর্ব-নির্মল প্রাণ দিলে।

পুলিশ আর কাকে ধরবে, ধরল সাবিত্রী দেবীকে আর তাঁর ছেলে রামকৃষ্ণকে। পলাতক বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিল বলে বিচারে মাতা-পুত্রের চার বছর করে সশ্রম জেল হল।

রামকৃষ্ণ মেদিনীপুর জেলে যক্ষ্মায় মারা গেল আর যদিও সাবিত্রী দেবী সেই একই জেলে ছিলেন, ছেলের শেষ সময়েও তাঁকে কাছে গিয়ে একটু সেবা করতে দেওয়া হল না। রামকৃষ্ণ যখন শেষ যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে মারা গেল, তখন দয়ালু সরকার মাকে বললে, ইচ্ছে করলে দূরে দাঁড়িয়ে একটু শেষ দেখা দেখতে পারেন ছেলেকে।

একটু কাছে যেতে পাই না? ওর কপালে একটু হাত রাখতে পারি না?

না। হুকুম নেই।

দূরে দাঁড়িয়েই সাবিত্রী দেবী দেখলেন ছেলেকে। অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ইংরেজ সরকার সদাশয়, অন্তত এ কথাটা বললে না যে চোখের জল ফেলারও হুকুম নেই।

'বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।
স্বর্গ কি হবেনা কেনা
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন?'

ইউরোপিয়ান এসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্স গুলি খেল। গুলি খেল ওয়াটসন, স্টেটসম্যানের সম্পাদক। অতুল সেনের প্রথম গুলি ওয়াটসনকে স্পর্শ করল না। স্টেটসম্যান অফিসের গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিল অতুল। লাঞ্চ খেয়ে ওয়াটসন ফিরছে অফিসে, গেটের কাছে তার গাড়ি কিঞ্চিৎ মন্থর হল। অতুল তাক করে গাড়ির মধ্যে গুলি ছুঁড়ল। ভাবল কাজ বুঝি হাসিল হয়েছে। না

কি বুঝল হয়নি। কাগজের পুরিয়ায় কী ছিল, নিজের মুখে ঢেলে দিল। নিজের প্রাণ নিজে নিলে।

আবার কদিন পর ময়দানের রাস্তায় চলন্ত মোটরের মধ্যে ওয়াটসনকে গুলি করা হল। অফিসের পর লেডি সেক্রেটারিকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে ওয়াটসন, হঠাৎ একটা খোলা 'টুরার' —তাতে তিনজন যাত্রী—তার পিছু নিয়েছে। ওয়াটসন তার ড্রাইভারকে বললে, জোরে চালাও। কত জোরে চালাবে—টুরার একেবারে পাশে এসে পড়েছে। পাশে এসেই গুলি ছুঁড়েছে ওয়াটসনকে। গুলি লাগল বটে কিন্তু মারাত্মক হল না। ওয়াটসন এবারও বেঁচে গেল। তার সেক্রেটারিও অস্পৃষ্ট।

টুরারটা পাওয়া গেল বেহালায়। দুজন বিপ্লবী পড়ে মরে আছে—মণি লাহিড়ি আর অনিল ভাদুড়ি। তৃতীয় ব্যক্তি পলাতক।

কিন্তু ইংরেজ বিচারক গার্লিক বাঁচল না। আলিপুরের জেলা-জজ গার্লিক। যে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যালের বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়েছিল তারই প্রেসিডেণ্ট ছিল সে।

একটি নিরীহবেশী ছেলে সামনের দরজা দিয়ে কোর্টে ঢুকল। কোর্টে তো যে কেউ যে কোনো সময়ে ঢুকতে পারে। ঘরভরতি লোক, উকিল ব্যারিস্টার সাক্ষী পেশকার—সম্ভ্রান্ত কক্ষ গমগম করছে—ছেলেটি সটান সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কিছু বলবে, না, দরখাস্ত পেশ করবে, পিছনে কোনো উকিল আছে হয়তো —এক মুহূর্ত সবাই কেমন বিমূঢ় হয়ে রইল।

এক মুহূর্তই। কাঠগড়ায় উঠেই বিপ্লবী গার্লিককে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। প্রথম গুলি ভ্রষ্ট হল। দ্বিতীয় গুলি গার্লিকের কপাল বিদ্ধ করল।

'ও গড!' বলেই গার্লিক টেবিলের উপর ঢলে পড়ল।

রক্ষী সার্জেণ্টও বিপ্লবীকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। সেও পড়ে গেল মাটিতে। তার পকেটে পাওয়া গেল একটুকরো কাগজ :

'ধ্বংস হও। দীনেশ গুপ্তকে অবিচারে ফাঁসি দেওয়ার পুরস্কার নাও। ইতি বিমল গুপ্ত।'

পুলিশ অনেক খোঁজখবর করে জানতে পারল বিমল গুপ্ত ছদ্মনাম। বিপ্লবীর আসল নাম কানাইলাল ভট্টাচার্য, বাড়ি জয়নগর মজিলপুর।

গান্ধিজির বিলেত যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স পাশ হয়ে গেল। সরাসরি বিচার, পিটুনি ট্যাক্স, অন্তরীণ বন্দীকরণ—যাবতীয় কদর্যতা আবার আমদানি হল। 'ল-লেস-ল,' সুভাষ বললে, 'আইনছাড়া আইন—এ আমরা সহ্য করব না কিছুতেই।'

গান্ধিজির রওনা হবার আগে সুভাষ তাঁকে বলেছিল, 'গোলটেবিল বৈঠকে দেখবেন কতগুলো খুঁটিনাটি ব্যাপারেই ইংরেজ সরকার আপনাকে আবদ্ধ রাখতে চাইবে। দেখবেন সেখানে একটা গোলমাল বাধিয়ে দিয়ে ওরা আসল বিষয় অর্থাৎ স্বাধীনতার ব্যাপারটাই চাপা দিয়ে দেবে।'

গান্ধিজি বললেন, 'না, না, আমি আগেই প্রধান ব্যাপারগুলি সম্পর্কে বোঝাপড়া করে নেব। তোমরা কিছু ভেবো না।'

স্বাধীনতাই কি প্রধানতম ব্যাপার নয়?

আঠারো

মহাত্মা গান্ধি একাই কংগ্রেস, একাই ভারতবর্ষ। সঙ্গে কোনো পরামর্শদাতা নেই, কোনো রাজনৈতিক সহকর্মী নেই—তিনি একাই সমস্ত।

তবু এ বুঝি একমাত্র গান্ধির পক্ষেই সম্ভব। পরনে খাটো খদ্দরের ধুতি, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা, হাঁটু থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত খালি, পদতলে আঙুল-বের-করা স্যাণ্ডেল। গায়ে কোনো শার্ট-কোট নেই, না, একটা ফতুয়া পর্যন্ত নেই, শুধু মোটা একটা খদ্দরের চাদর, কোমরে ঝোলানো একটা ঘড়ি—এই পোশাকেই তিনি পৌঁছুলেন লণ্ডন। এই পোশাকেই তিনি গোলটেবিল বৈঠকে হাজির হলেন, বাকিংহাম প্যালেসে রাজার নিমন্ত্রণ রাখলেন।

কিন্তু আসল কাজ কদ্দুর এগোল?

জহরলালকে চিঠি লিখছে সুভাষ: 'গোলটেবল ব্যর্থ হবেই, এ আমার বদ্ধমূল ধারণা। অবশ্যি গান্ধিজি যদি আরো আপোশের জন্যে রাজি থাকেন সে আলাদা কথা। আমার মনে হয় স্বাধীনতা নয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকুই ভারতের ভাগ্যে জুটবে। কিন্তু এত অল্পে আমাদের তুষ্টি হবে কী করে?'

সুভাষ যা ভেবেছিল তাই হল, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন উঠে গেল। মুসলমান আর শিখ দু দলই সব ব্যাপারে আলাদা অস্তিত্বের দাবিদার হয়ে দাঁড়াল। গান্ধিজি মুসলমানদের শাদা চেক দিতে চাইলেন, দেশে গিয়ে যে অঙ্ক বলবে সেই অঙ্ক তিনি বসিয়ে দেবেন, শুধু এখানে এই বৈঠকে এস আমরা সম্মিলিত হই। সংখ্যালঘুরা রাজি হল না। মূল বিষয় স্বাধীনতা সিকেয় তোলা রইল, সাম্প্রদায়িকতার গাঁজলা নিয়েই মেতে রইল ব্রিটিশ ক্যাবিনেট।

তবু ইংরেজের প্রতি অগাধ বিশ্বাস মহাত্মার। যেহেতু তিনি ইংরেজদের ভালোবাসেন সেই হেতু তারাও ভারতবাসীকে ভালোবাসবে। যেহেতু তিনি সৎ সরল ও সাধু ইংরেজও সেই কারণে সৎ সরল ও সাধু হবে। তাঁর যেমন কারু প্রতি বিদ্বেষ নেই ইংরেজও তেমনি বিদ্বেষমুক্ত হবে।

এ কখনো হয়? ব্যক্তির কথা নয় দেশের কথা শুনতে চাই—ভারতবর্ষের কথা, তার সামগ্রিক স্বার্থের কথা। আর, সুভাষ বলছে, ভারতবর্ষের একটা মাত্র স্বার্থ, আর সে স্বার্থের নাম স্বাধীনতা।

'তোমরা সন্ত্রাসবাদের কথা তুলেছ?' মহাত্মা বললেন শেষ পর্যন্ত, 'সেই সন্ত্রাসবাদকে দমন করতে তোমরা কতদূর সন্ত্রাসবাদী হয়েছ তা দেখছ না? দেয়ালের লিখন পড়ো যা সন্ত্রাসবাদীরা নিজের বুকের রক্ত দিয়ে লিখেছে। কী লিখেছে তোমরা পড়তে পারছ না, বুঝতে পারছ না? লিখেছে আমরা গমের রুটি চাই না, স্বাধীনতার রুটি চাই। যতক্ষণ সে রুটি না পাই ততক্ষণ আমাদের শান্তি নেই, অন্যদেরও শান্তি নেই।'

গান্ধিজি আবার নরম হচ্ছেন: 'আর কিছু না দাও, তোমাদের বন্ধুতা দাও, হৃদ্যতা দাও, দাও তোমাদের অংশীদার হতে। পরস্পরের লাভের জন্যে অংশভোগ। শুধু ছুরি আর বর্শা আর গুলি আর বিষের কৌটো দেখিয়ো না আমাদের। না, দেখিয়ো না। আমরা অন্তত এতদিনে 'না' বলতে শিখেছি।'

তারপরে করুণ আবেদন করলেন, 'ঈশ্বরের নাম করে বলেছি, এই বাষট্টি বছরের কৃশ বৃদ্ধকে ক্ষুদ্র একটি সুযোগ দাও। তাকে ও তার প্রতিষ্ঠানকে এককোণে একটু স্থান দাও, এবং একবারের মত বিশ্বাস করে দেখ। আর যদি একান্তই না দাও ভেবো না আমরা বিধ্বস্ত হয়ে যাব। আমরা বহু সমস্যা কাটিয়ে উঠেছি, প্লেগ আর ম্যালেরিয়া, সাপ আর বিছে আর বাঘ—এও আমরা কাটিয়ে উঠব।'

শেষকালে বললেন, 'আমি এখন কোন পথে যাব জানিনা, কিন্তু

যে পথেই যাই তোমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিয়ে যাব।'

কিন্তু ভবী কিছুতেই ভোলবার নয়।

এদিকে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট পালটে গেল। স্যামুয়েল হোর নতুন ভারত-সচিব হল। বলে দিল, আর বৈঠক-ফৈঠক হবে না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও সকলে।

সর্বসাকুল্যে কী লাভ হল?

শুধু সময়নাশ। শুধু দেশের সংগ্রাম-উদ্যতিকে স্তব্ধ করে দেওয়া।

গান্ধিজি শূন্য হাতে ফিরে এলেন। ফিরে এলেন আটাশে ডিসেম্বর।

এখন আর আরউইন নেই, এখন উইলিংডন। গান্ধি ফেরবার পাঁচ দিন আগে জহরলাল গ্রেপ্তার হল। গ্রেপ্তার হল সীমান্ত প্রদেশের খান সাহেব। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বেআইনি ঘোষিত হল। সেই কংগ্রেস কমিটির আমন্ত্রণে সুভাষ যাচ্ছিল বোম্বাই, কল্যাণ স্টেশনে তাকে গ্রেপ্তার করা হল। নিয়ে গেল মধ্যপ্রদেশের শিওনি জেলে।

স্বয়ং গান্ধি গ্রেপ্তার হলেন। আটক হলেন আবার সেই পুনায় এরবাদা জেলে।

গ্রেপ্তার হল প্যাটেল—একে একে সমস্ত নেতা। উনিশশো বত্রিশের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি দু মাসের মধ্যেই বত্রিশ হাজারেরও উপর লোককে ইংরেজ জেলে পুরলে।

কংগ্রেসের পালে আর হাওয়া নেই, হালে আর মাঝি নেই, কোথায় সোনার বন্দরে গিয়ে পৌঁছুবে, না, পৌঁছুল গিয়ে এক নিষ্ফলা মরুভূমিতে।

শিওনি জেল থেকে সুভাষকে নিয়ে গেল জব্বলপুর সেণ্ট্রাল জেলে। শরীর ভেঙে পড়ল। নিয়ে গেল ভাওয়ালি স্যানাটোরিয়ামে।

সেখান থেকে লখনৌ, বলরামপুর হাসপাতালে। অনেক ধরা-পড়ার পর ইংরেজ ডাক্তার বাকলি তাকে ইউরোপ যাবার সুপারিশ করল। গভর্নমেন্ট বললে, যেতে পারো কিন্তু নিজের খরচে। সঙ্গে জুড়ে দিল আবার সেই ক্ষুদ্র সর্ত, কলকাতা হয়ে যেতে পারবে না।

উনিশশো তেত্রিশের তেইশে ফেব্রুয়ারি সুভাষ ইটালিয়ান জাহাজে ভিয়েনার উদ্দেশে রওনা হল। জাহাজ থেকে দেশবাসীর উদ্দেশে একটি বাণী পাঠাল সুভাষ : 'যদি বাংলা মরে যায়, তবে বাঁচবে কে ? আর যদি বাংলা বেঁচে থাকে, তবে কে মরবে ?'

আটুই মার্চ সুভাষ পৌঁছুল ভিয়েনায়। উঠল ডাক্তার ফুর্থের স্বাস্থ্যনিবাসে।

এখানেই সর্দার বিঠলভাই প্যাটেলের সঙ্গে সুভাষের অন্তরঙ্গতা ঘটল।

'শুনেছ টাটকা সংবাদ ? গান্ধিকে ছেড়ে দিয়েছে।'

'শুনেছি।'

'আরো শুনেছ ভয়ানক কথা ?' জিজ্ঞেস করল প্যাটেল।

'কী ?' সুভাষ তাকাল উৎসুক হয়ে।

'গান্ধি আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পূর্ণ তুলে নিয়েছে।'

সুভাষ স্তব্ধ হয়ে রইল।

'আন্দোলন তুলে নিয়ে যথারীতি সরকারের কাছে আবেদন পাঠিয়েছে, অর্ডিন্যান্সগুলো তুলে নাও, ছেড়ে দাও সত্যাগ্রহীদের।'

'সরকার নিশ্চয়ই সে আবেদনে কান দেয় নি।'

'নিশ্চয়ই না।' প্যাটেল বললে সবলকণ্ঠে, 'যে শক্তিহীন সংগ্রাম ত্যাগ করে বসে থাকে তার শত্রু তার আবেদন শোনে না। শরণাগতির আবার শর্ত কী !'

গান্ধির এই আত্মসমর্পণের ভাব দেখে দুই নেতা, প্যাটেল আর সুভাষ, মর্মাহত হল। তারা যুক্ত বিবৃতি প্রচার করল।

'আইন-অমান্য আন্দোলনের প্রত্যাহার গান্ধিজির পরাজয়

স্বীকারের নিদর্শন। আমাদের পরিষ্কার অভিমত এই রাজনৈতিক নেতা হিসাবে গান্ধিজি ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং নতুন নীতিতে কংগ্রেসের নতুন রূপায়ণ ঘটাবার সময় এসেছে। যা গান্ধিজির আজন্মপালিত নীতির অনুবর্তী হবে না সেই ভাবে তিনি পরিচালনা করবেন এ আশা করা অন্যায়।'

নীতি বদলের দিন এসেছে, হয়তো বা নেতা বদলের।

গান্ধি শুধু আন্দোলনই তুলে নিলেন না, কংগ্রেসই ভেঙে দিলেন। কারু আর এখন সংগ্রামে মন নেই, সবাই এখন কাউন্সিলে ঢুকতেই উসখুস করছে।

বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নরিম্যান জেল থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'গান্ধিজির এই রাজনীতির সঙ্গে ধর্ম মেশানোর অভ্যাস কবে সংশোধিত হবে? কবে এই ভ্রান্তির থেকে দেশ পরিত্রাণ পাবে? সরল ও সবল ব্যক্তিত্বের নেতা আমরা কবে পাব, যে সোজা কথা সোজা করে বলতে পারে, এক কথায়, যার আছে রাজনৈতিক মস্তিষ্ক!'

জেনেভাতে রোমা রলাঁর সঙ্গেও সুভাষের সেই মর্মে কথা হল।

'যদি স্বাধীনতার জন্যে এমন কোনো নতুন আন্দোলন শুরু করা যায় যা গান্ধিবাদী সত্যাগ্রহের অনুরূপ নয়, তা হলে আপনার কী প্রতিক্রিয়া হবে?' সুভাষ রলাঁকে জিজ্ঞেস করলে।

'আমি দুঃখিত হব।' বললেন রলাঁ, 'আমার বিশ্বাস গান্ধির সত্যাগ্রহই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আনতে পারবে। যদি না পারে আমি হতাশ হব। বলো তো সমস্ত পৃথিবীতে গান্ধি কী মহৎ আশার সঞ্চার করেছে!'

'কিন্তু মহাত্মার যে ভাব তা পার্থিব জগতে অচল, অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে।' সুভাষ বললে শান্ত কণ্ঠে, 'তাঁর শত্রুর সঙ্গে ব্যবহার একেবারে অকপট। ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে কেউ চায় না, তবু দেখুন গায়ের জোরে ওরা আমাদের বুকের উপরে চেপে

বসে আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের অসুবিধে ও বিরক্তিসত্ত্বেও শুধু গায়ের জোরেই ওরা ওদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। যদি সত্যাগ্রহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়, আপনি কি চাইবেন না যে জাতীয় আন্দোলন এবার অন্য পথে চালিত হোক? না কি আপনি তখন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আগ্রহ রাখা ছেড়ে দেবেন?'

রলাঁ গম্ভীরস্বরে বললেন, 'না, যে কোনো ভাবে যে কোনো পথে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

পরে তিনি তাঁর শেষ কথা বললেন, 'বিশ্বের শোষিত শ্রমজীবীর জন্যে ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা করতে হবে। যে পার্টি এই উদ্দেশে লড়বে আমি তাকেই বরেণ্য বলে স্বীকার করব। আমার সহানুভূতি চিরকালই নির্যাতিত শ্রমজীবীর উপর। গান্ধি বা আর যেই হোক যে দল শ্রমজীবীর স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে তার প্রতি আমাব কোনো অভ্যর্থনা নেই।'

এ যেন সুভাষেরই অন্তরের কথা।

'আমার শেষ কথা, এক কথায়,' রলাঁ আবার বললেন, 'আন্তর্জাতীয়তা। সমস্ত জাতির জন্যে সমানাধিকার। আমরা এমন সমাজ চাই যেখানে শোষণ থাকবে না, পরাধীনতা থাকবে না, নরনারীর মধ্যে অধিকারের তারতম্য থাকবে না আর সকলেই সেই সমাজের জন্যে শ্রম দান করবে।'

সুভাষের সমস্ত চেতনা নবীন উদ্দীপনায় ঝংকৃত হয়ে উঠল।

জহরলালকে চিঠি লিখছে সুভাষ: 'আজকে যাঁরা নেতৃত্বের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র তোমার উপরেই আমি ভরসা রাখি। তুমিই পারবে কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। আমি একান্তভাবে এই আশাই করব যে তুমি তোমার আদর্শে পৌঁছুতে বিনাদ্বিধায় তোমার ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করতে পারবে।'

কিন্তু জহরলাল বুঝি শেষপর্যন্ত গান্ধিবাদেই অভিভূত হয়ে রইল।

আর মহাত্মাকে বলতে হল, সুভাষের জয়ের অর্থ আমারই পরাজয়।

উনিশশো সাঁইত্রিশের মার্চে সুভাষকে ইংরেজ ছেড়ে দিল আর আটত্রিশের হরিপুরার কংগ্রেসে সুভাষ সভাপতি হল।

উনিশশো পঁয়ত্রিশে গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া য়্যাক্ট চালু হবার পর কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব নেবার দিকে ঝুঁকেছে। কংগ্রেস আর বেআইনি নয়। এখন কংগ্রেসে ঢুকলে বেশ কিছু গুছিয়ে নেওয়া যায়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়েছে। এখন ইংরেজের সঙ্গে আপোস করে কেন্দ্রে ও প্রদেশে যা পারো যতটা পারো কর্তৃত্বের আসরে এসে বোসো। কর্তৃত্বের মত মদ নেই। প্রভুত্বলিপ্সাই সর্বনাশা মদিরা।

কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে সুভাষ এই আভাসই দিয়ে বসল।

ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স বা ব্যবসাবাণিজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলিকে বেশি সুখসুবিধে দিতে হবে—এ পক্ষপাতিত্ব চলবে না। ফেডারেশান ছাড়তে হবে। শিল্পোন্নয়নের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার দিকে কংগ্রেসের দৃষ্টি দিতে হবে। বুনিয়াদি শিক্ষার খসড়া তৈরি করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে সোস্যালিজম বা সমাজতন্ত্রের দিকে।

এ যে সব নতুন কথা কইতে সুরু করেছে। এ যে আপোসের কথা নয়, সংগ্রামের কথা। এ যে থেমে থাকার কথা নয়, এ যে এগিয়ে যাবার কথা। স্থগিত করবার কথা নয়, সক্রিয় হবার কথা। এ যে পুনরাবৃত্তি নয়, এ যে অভূতপূর্বতা।

যাক, এক বছরের তো মামলা। সুভাষকে তো আর উনিশশো উনচল্লিশে মোড়লি করতে ডাকা হবে না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ লিখলেন জহরলালকে : 'কাজ করবার যন্ত্র যদি বিকল হয়ে যায় তবে তাকে সেই চালাতে পারে যার চালাবার শক্তি আছে বুদ্ধি আছে। যদি চালকের পথে বাধা এসে দাঁড়ায়, সেই

বাধা সরিয়ে দেওয়াও সেই চালকেরই কাজ। যন্ত্রের চালক মানুষ হিসেবে বড় নাও হতে পারে কিন্তু সন্দেহ কী সে যে যন্ত্রবিদ।'

সুভাষ হরিপুরার পরেই সরে দাঁড়াল না। উনিশশো উনচল্লিশেও সে কংগ্রেসের সভাপতি-পদের প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল।

কংগ্রেসের গান্ধিচক্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করাল পট্টভি সীতারামায়াকে। গান্ধিচক্র যুক্ত বিবৃতি দিল: 'আমাদের মতে পট্টভিই কংগ্রেসের সভাপতি হবার যোগ্যতম ব্যক্তি।' অবশ্য সে বিবৃতিতে দুজন অনুপস্থিত—গান্ধি আর জহরলাল।

সকলেরই তখন এই জিজ্ঞাসা: আমরা কি গণতন্ত্রের সাধক, না কি হিটলারি একনায়কত্বের?

সুভাষ সরে দাঁড়াল না। উঠে দাঁড়াল। নিজের বিবেক বুদ্ধি নিজের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত শুধু স্তবমন্ত্রের মোহমুগ্ধতায় হারিয়ে ফেলব না। দেশ বেছে নিক কাকে চায়।

দেশ সুভাষকে বেছে নিল।

মহাত্মা লিখলেন: 'আসলে এ আমারই পরাজয়। কেননা পট্টভিকে আমিই যোগ্যতর মনে করে নির্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলাম। আমার পরাজয়ে আমি আনন্দিত। কেননা আজ স্পষ্ট হল অধিকাংশ কংগ্রেস-প্রতিনিধি আমার নীতি ও পদ্ধতি পছন্দ করে না।'

তারপরে করলেন সেই স্বগতোক্তি: 'সুভাষ বোস, আর যাই হোক, দেশের শত্রু নয়।'

এ কি সান্ত্বনা, না, যন্ত্রণা?

রাজনীতি বুঝি এমনি নির্মম—সে বুঝি মহত্তম সাধুকেও বৈদান্তিকতায় অটল রাখতে পারে না। রাখতে পারলে সে হয়তো বলাত: সুভাষ বোসের জয় আমারই জয়।

অথচ মহাত্মা গান্ধির প্রতি সুভাষের কী প্রাণপাত শ্রদ্ধা! কলকাতায় তার জয়োপলক্ষে আহূত এক সভায় সুভাষ বলছে

যুবকদের : 'বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের চেয়ে তোমরা অগ্রগামী এ কথা তোমরা কেমন করে প্রমাণ করবে? শুধু তাঁদের সমালোচনায় তোমাদের যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত হবে না। দেশের ও জাতির জন্যে তাঁরা যা করেছেন তার চেয়ে বৃহত্তর ও মহত্তর কিছু করতে পারো তবেই তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হবে। আজকে এই উল্লাসের মুহূর্তে এমনি একটি কথাও উচ্চারণ কোরো না যার ফলে কেউ আহত হয় বা কেউ ব্যথা পায়।'

কিন্তু গান্ধিচক্র সুভাষের উপর প্রতিশোধ নিল। তোমারই মতের লোকদের নিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করো বলে গান্ধিপন্থী সদস্যেরা—সংখ্যায় বারোজন—কমিটি থেকে সরে পড়ল।

কিন্তু গোবিন্দবল্লভ পন্থ এক প্রস্তাব আনল যে কংগ্রেসের এই অভিমত যে-কমিটিই কংগ্রেস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করুন না কেন, তার সদস্যদের গান্ধির মনোনয়ন পেতে হবে। অর্থাৎ গান্ধির ইচ্ছানুসারেই সুভাষকে কমিটির সদস্য নির্বাচন করতে হবে।

সুভাষ উনিশশো উনচল্লিশের কংগ্রেসে ত্রিপুরিতে এল, নিদারুণ অসুস্থতা নিয়ে, এম্বুলেন্সে। ডাক্তাররা তাকে বারণ করতে চেয়েছিল কিন্তু সে বারণ গ্রাহ্য করেনি সুভাষ। জীবনের ডাকে মৃত্যুকে তুচ্ছ করার যার আমরণ প্রতিজ্ঞা, যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে শ্বাস বইছে সে বিরত হয় না।

কিন্তু সেই কংগ্রেসেই গান্ধিপন্থীরা পন্থ-প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিল। এমন প্রস্তাব কংগ্রেসের মূল সংবিধানের পরিপন্থী কিনা তারও বিচার কেউ করল না।

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন : 'অবশেষে আজ এমন কি কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারনীতির নিঃসংকোচ জয়ঘোষণা শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্র উচ্চারণ করবার জন্যে যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টের সাপ ফোঁস করে উঠেছে।'

সুভাষ প্রেসিডেন্টের পদ পরিত্যাগ করল।

আরো পদ আছে, আছে আরো পদক্ষেপ। আরো জয়ধ্বনি। চলো দিল্লি চলো।

সুভাষ সরে যেতেই আবার ওয়ার্কিং কমিটি জেঁকে বসল। তারা পাঁতি দিল সুভাষকে কংগ্রেস থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোক।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গেলেন মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে মোকাবিলা করতে।

গান্ধি বললেন, আমি কী জানি। এ হচ্ছে কমিটির হাইকমাণ্ডের সিদ্ধান্ত। সুভাষ যদি এই হাইকমাণ্ডের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে তবেই তার শাস্তি প্রত্যাহৃত হতে পারে।

কিন্তু সুভাষ কি বশ্যতার জন্যে জন্মগ্রহণ করেছে? না কি বিপ্লবের জন্যে?

রবীন্দ্রনাথ লিখলেন: 'কংগ্রেসের অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি। মুক্তির সাধনা তপস্যার সাধনা। সেই তপস্যা সাত্ত্বিক—এই জানি মহাত্মার উপদেশ। কিন্তু এই তপঃক্ষেত্রে যাঁরা রক্ষকরূপে একত্র হয়েছেন তাঁদের মন কি উদারভাবে নিরাসক্ত? তাঁরা পরস্পরকে আঘাত করে যে বিচ্ছেদ ঘটান সে কি বিশুদ্ধ সত্যেরই জন্যে, তার মধ্যে কি সেই উত্তাপ একেবারেই নেই যে উত্তাপ শক্তিগর্ব ও শক্তিলোভ থেকে উদ্ভূত?'

সুভাষ ফরোয়ার্ড ব্লক স্থাপন করলে। ঘোষণা করলে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা-অর্জন এবং যে কোনো বৈধ উপায়ে স্বাধীনতা-অর্জন।

এবং বিপ্লব বৈধ উপায়। যুদ্ধবিগ্রহও বৈধ উপায়।

রবীন্দ্রনাথ সুভাষের এই কংগ্রেস-বিদ্রোহ সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলেন। লিখলেন: 'আজ আমি জানি বাংলাদেশের জননায়কের প্রধানপদ সুভাষচন্দ্রের। সমস্ত ভারতবর্ষে তিনি যে আসন গ্রহণের সাধনা করে আসছেন সে পলিটিক্সের আসরে। আজকেকার এই গোলমালের মধ্যে আমার মন আঁকড়ে ধরে আছে বাংলাকে। যে

বাংলাকে আমরা বড়ো করব সেই বাংলাকেই বড়ো করে লাভ করবে সমস্ত ভারতবর্ষ। তার অন্তরের ও বাহিরের সমস্ত দীনতা দূর করবার সাধনা গ্রহণ করবেন এই আশা করে আমি সুদৃঢ়সঙ্কল্প সুভাষকে অভ্যর্থনা করি এবং এই অধ্যবসায়ে তিনি সহায়তা প্রত্যাশা করতে পারবেন আমার কাছ থেকে, আমার যে বিশেষ শক্তি তাই দিয়ে। বাংলা দেশের সার্থকতা বহন করে বাঙালি প্রবেশ করতে পারবে সসম্মানে ভারতবর্ষের মহাজাতীয় রাষ্ট্রসভায়। সেই সার্থকতা সম্পুর্ণ হোক সুভাষচন্দ্রের তপস্যায়।'

যদি বাঙলা মরে তো কে বাঁচবে? আর যদি বাঙলা বাঁচে তো কে মরবে?

তাই জয় বাংলাদেশ, জয় ভারতবর্ষ।

জয় হিন্দুস্থান!

জয় হিন্দ!

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

এই গ্রন্থ প্রণয়নে নিম্নলিখিত বইগুলির থেকে সাহায্য নিয়েছি

The Indian Struggle by Subhas Chandra Bose

History of the Indian National Congress by B. Pattabhi Sitaramayya

Subhas Chandra by Dr. Hemendra Nath Dass Gupta

The Roll of Honour by Kalicharan Ghosh

সুভাষচন্দ্রের পত্রাবলী

শ্রীমতী অর্পণা দেবীরচিত মানুষ চিত্তরঞ্জন

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকৃত দেশবন্ধুস্মৃতি

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীলিখিত নেতাজী সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

শ্রীভূপেন্দ্র রক্ষিত রায়প্রণীত সবার অলক্ষ্যে

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়বর্ণিত ভারতে জাতীয় আন্দোলন

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ চক্রবর্তীলিখিত জেলে ত্রিশ বছর